সাংবাদিকের স্মৃতিকথা

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত

প্রভা ও প্রতিভাকে
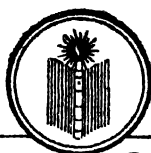
॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

Mahatma Gandhi and India's Struggle for Swaraj

Journalism as a career

কথারম্ভ···

শ্রীমান কিরণকুমার রায় ও আমার কন্যা শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্ত'র যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ছোটগল্প' মাসিক পত্রিকার এক শারদীয় সংখ্যার জন্য আমি কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হই। আমি সাংবাদিক, লেখক নই। তাই কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিলাম সেই অনুরোধে, এ কথা আজ গোপন করবো না।

কিন্তু তাঁদের দাবীর কাছে আমার হার মানতে বাধ্য করেছিল। আমি লিখেছিলাম আমার সাংবাদিক জীবনের অজস্র স্মৃতিকথার এক অধ্যায়। এবং আশ্চর্য এই, সে লেখা পড়ে অনেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, দীর্ঘতর রচনায় আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য।

এই লেখার শুরু সেই অনুরোধ থেকে। জানি না গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর এ লেখা তাদের কেমন লাগবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বাহুল্য হবে না, আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী কোনদিন লিখতে হবে তা' ভাবি নি। তাই কোনরকম রোজনামচা রাখার অভ্যাস আমার ছিল না। সবটা লেখাই স্মৃতি-নির্ভর। হয়তো তাই কিছু ত্রুটি কোথায়ও থেকে যেতে পারে, যদিও আমি যথাসাধ্য যত্ন নিয়েছি ত্রুটি-মুক্ত থাকার জন্য। 'দেশ' পত্রিকায় এ লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অনেকে অনুরোধ করেছিলেন আরো সবিস্তারে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য। সময়াভাবে তা এবার সম্ভব হলো না। পরবর্তী রচনা যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে, আমার

অভিজ্ঞতার আরেক দিক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার ইচ্ছা রইলো।

আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমান অশোককুমার সরকার, সহৃদয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার এবং 'দেশ' পত্রিকার শ্রীমান সাগরময় ঘোষ এই রচনা সম্পর্কে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীমান কিরণকুমার রায় আমাকে অপরিমেয় সহায়তা করেছেন। প্রতি অক্ষরের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি বর্তমান। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করবো না।

ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া
৩৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু
কলিকাতা ১৩

মহালয়া, ১৩৭২ ॥

॥ ১ ॥

আমার হাত দেখে বলেছিল গনৎকার আমার বাবাকে, ছেলে আপনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে যায় না। ভবিষ্যদ্বাণীর একটা স্থবিধে এই তা অবিশ্বাস করতে মন চায় না, কিন্তু বিশ্বাস যে করবো সে সাহসও বা কই। তবু বাবা খুশি হয়েছিলেন। জ্যোতিষ মহারাজের শিরোপা মিলেছিল পাঁচ টাকা।

সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। মাঝখানে অতিবাহিত হয়ে গেছে একটা দীর্ঘ সময়, দীর্ঘতর ঘটনাপ্রবাহ। দেশ বদলে গিয়েছে, ইতিহাসের ধারায় নতুন যুগ এসেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে হলাম সাংবাদিক, জ্যোতিষ মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণীটা বিফলে গেল। ক্ষুদ্র স্বচ্ছলতার আশ্বাস দূরে সরিয়ে রেখে সাংবাদিকতার দারিদ্র্য বরণ করে দেশপূজা করার ব্রত নিলাম। ডেপুটিগিরির জন্য দুঃখ হয় নি সেদিনও, বাবাও আর দুঃখ করেন নি। এ জীবনে দেখলাম আমার মাতৃভূমির আশ্চর্য জাগরণ ও বিকাশ, সাংবাদিকতার সেবায় এই গণজাগরণে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নৈবেদ্যও আমি দিতে পেরেছি, জীবনসন্ধ্যায় তার জন্যে আমি গৌরববোধ করি।

কিন্তু সাংবাদিক হতে পারাটাও কি সহজে হয়েছে? তার জন্যেও অনেক সাধনা করতে হয়েছিল আমাকে। এম এ পাশ করেছি ১৯১৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রীটা নামের পেছনে লাগিয়ে বাঙালী দোকানে তৈরী সাহেবী পোশাক গায়ে চড়িয়ে দিকপাল মুরুব্বিদের বাড়িতে ঘোরাফেরা করেছি। মাঝে মাঝে গণৎকারের কথাটা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। প্রতিদিন সকালবেলা উঠেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। 'সিচুয়েশন-ভেকেন্ট'গুলো তন্ন তন্ন করে চোখ বুলিয়েছি। পাছে তাড়াতাড়িতে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, সেজন্যে বার কয়েক করে পড়তাম কর্মখালির বিজ্ঞাপন। যদি যুৎসই একটা কাজের হদিশ মিলে

যায়। চিঠি লিখেছি তাড়া তাড়া, দিনের পর দিন। কর্মখালির ঠিকানায় হিল্লী-দিল্লী-কলকাতা সর্বত্র। তারপর বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। উদয়াস্ত সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথায়ও চাকরি মেলে নি।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেদিনের হতাশম্লান দিনগুলোর ঘর্মাক্ত মুহূর্তে একটা সত্য উপলব্ধি করেছিলাম, পরাধীন দেশে জন্মানো কত বড় অভিশাপ। যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এত ফাঁকি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীও যে দেশে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সহায়তা করতে পারে না, সে দেশের রাষ্ট্রশাসকরা দেশের শত্রু।

কৈশোরে মোটা কাপড় পরে নগ্নপদে বিলিতী দোকানে পিকেটিং করতাম। দলবেঁধে যেতাম নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনতে। সে সময় একটা উচ্চাশা মনকে উদ্দীপ্ত করে তুলত, দেশের জন্যে এ জীবনটা এ জন্মের মত উৎসর্গ করে যাব। বড়ো হয়ে যখন বুঝতে শিখেছি তখন মনে হলো, শুধু পিকেটিং শোভাযাত্রা নয়, দেশসেবার অনেক সার্থক পথ আছে। চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল একজনের আদর্শ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বজ্রনির্ঘোষকারী সংবাদপত্র 'বেঙ্গলী'। এ পথেই আমাকে যেতে হবে। কথাকে দিতে হবে ক্ষুরের ধার। তাকে করে তুলতে হবে তরবারি, তবেই না সে লড়াই করতে যাবে জঙ্গী-সঙ্গীনের বিরুদ্ধে। মন ঠিক করে ফেললাম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা মাথায় থাকুন, আমাকে হতে হবে জর্নালিস্ট। সাংবাদিক।

তখনকার দিনে নামকরা সংবাদপত্র বলতে পাচটি, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান। প্রথমোক্ত ত্রয়ীর আক্রমণে জবরদস্ত গবর্নমেণ্ট কম্পমান। তাঁর মধ্যে আবার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের লেখা ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে বেঙ্গলী জনপ্রিয়তার মধ্যাহ্নগগনে সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। বেঙ্গলীতেই আমাকে কাজ শিখতে হবে। মনে তখন এ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল।

কিন্তু এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হতে বিলম্ব ঘটেছে অনেক। জীবিকার

দায়ে ঘুরেছি নানা দায়িত্বে। গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন করতে বাধ্য হয়েছি নানা কাজ নিতে। ট্যুইশনি থেকে পাবলিকেশন ব্যবসায়ের ম্যানেজারি, নানান জীবিকার চক্রে ঘুরেছি কয়েক বছর। অবশেষে একদা পূর্ণ বেকারত্বের কালে এসেছি সাংবাদিক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার আত্মীয় গোবিন্দ রায়ের কাছে।

গোবিন্দ রায় ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। আমার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। আমার ইচ্ছের কথা শুনে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তিনি ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড' মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' দৈনিকপত্রিকার সহকারী।

পৃথ্বীশবাবুর কাছে যাওয়া-আসা করি। 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড'-এর জন্য তাঁর প্রবন্ধাদি তিনি আমাকে পড়ে শোনাতেন, মাঝে মাঝে প্রুফও দেখে দিয়েছি সে সবের। তার মধ্য দিয়ে সংবাদসাহিত্য রচনা করার কৌশল আয়ত্ত করতে লাগলাম। আমার সাংবাদিক জীবনে শিক্ষানবিশী তাঁর কাছেই। পৃথ্বীশবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম, 'বেঙ্গলী'তে এপ্রেন্টিসরূপে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, সুযোগমত তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

এ সময় মণ্টেগু চেমসফোর্ড স্কীমের পার্লামেণ্টারি কমিটিতে যোগ দেবার জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পৃথ্বীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাত্রা করেন। যাবার আগে পৃথ্বীশবাবু আমাকে বেঙ্গলীর সাব-এডিটর নিযুক্ত করে যান। আমি ও আমার বন্ধু নলিনী বসু (সত্যানন্দবাবুর ছেলে) একসঙ্গেই বেঙ্গলীতে ঢুকি। মাইনে ষাট টাকা। বিলেতে যাবার আগের দিন পৃথ্বীশবাবু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন 'বেঙ্গলীর' নৈশ-সম্পাদক বসন্ত দাশগুপ্ত মশায়ের সঙ্গে। বসন্তবাবু ছিলেন চতুর সাংবাদিক। অর্থাৎ ইংলিশম্যান ও বেঙ্গলী দু'টো পরস্পরবিরোধী কাগজের অন্যতম সম্পাদক। দিনের বেলায় 'ইংলিসম্যানের' প্রধান সহযোগী সম্পাদক এবং রাত্রিতে 'বেঙ্গলীর' নৈশ-সম্পাদক। সে সময় এরকম অসম

দায়িত্ব ছিল আরো অনেকের জীবনে। তাই খুব বিচিত্র লাগতো না আমাদের কাছে।

বসন্তবাবু ছিলেন স্বভাব সাংবাদিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলীন্য বা ডিগ্রীবিরহিত এই ব্যক্তি ছিলেন সে যুগের সংবাদপত্রজগতে দক্ষতায় অদ্বিতীয়। প্রুফ-রিডার হিসেবে জীবন আরম্ভ করে সহযোগী সম্পাদকের সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন। অতি তুচ্ছ ঘটনারও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট লিখে তিনি সকলকে বিস্মিত করে দিতেন। সাংবাদিকের এমন অনায়াস দক্ষতা আমার আর চোখে পড়ে নি।

বসন্তবাবু আমাকে ও নলিনীকে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে। সুরেন্দ্রনাথ তখন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। তাঁর বক্তৃতা শুনেছি বাল্যকাল থেকে। দূর থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ—'বেঙ্গলী' ছিল সেই সংগ্রামেরই একটি ক্ষুরধার অস্ত্র। তিনি যেন প্রহরণধারী সব্যসাচী, আমরা তাঁর সহকারী। একথা ভাবতেই উচ্চ কম্পন জাগলো মনে। সেই স্পন্দিত বুকেই ঘরে ঢুকলাম। তিনি একবারমাত্র চোখ তুলে তাকালেন। পরদিনের 'লীডার' সংশোধন করছিলেন তিনি। বসন্তবাবু তাঁকে জানালেন আমরা বেঙ্গলীর নবনিযুক্ত সব-এডিটর। এবার মুখ তুলে তাকালেন সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের ভালো করে দেখলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের যে রূপ দেখেছি পার্কে ময়দানে শোভাযাত্রায়, এ চোখের দৃষ্টি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সস্নেহ, মমতাময় সে দৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য দেখে নিলেন আমাদের। তারপর বসন্তবাবুকে বললেন, 'বেশ, বেশ। এঁদের ভাল করে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিন।'

স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎকার। অল্প কথা। কিন্তু এর মধ্যেই অনুভব করতে পেরেছিলাম একজন মহীরুহের আশ্রয়ে এসেছি। এখানে শুধু উচ্চতা নয়, আছে সুগভীর আর সুশীতল ক্লান্তিহরা ছায়া। আমি সে স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তারপর কতকাল কেটেছে। কত পত্রিকায় কাজ করলাম, সাংবাদিক-তার কতদিকে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়েছে। সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের কঠোর সংগ্রাম নিয়েছি জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হিসেবে। দেখেছি কত মানুষ, কত ঘটনার পেছনের কত কীর্তি চোখে পড়েছে। কত সংবাদ রিপোর্ট করেছি, এডিট করেছি, পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছি। তবু এখনও যৌবনের সেই বেদনারূঢ় জীবনে সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে মমতা ও আশ্রয় পেয়েছিলাম, তা অক্ষয় অনির্বাণ হয়ে আছে স্মৃতিকোঠায়। আমার সাংবাদিকতার গুরু, আমার জীবনস্বপ্নের সার্থকতা রাষ্ট্রগুরুর মমতাময় দাক্ষিণ্যে।

॥ ২ ॥

পূর্ব বাংলার নালানদী, ঢেউ খেলানো ধানের মাঠ আর অপার আকাশের দেশে জন্মেছিলাম। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হবার আগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। বাবা প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন 'রাইটার কনস্টেবল', মা তারাসুন্দরী ছিলেন শিল্পী। ছবি আঁকতেন, গান গাইতেন, সুরে বেঁধে রামায়ণ-মহাভারত পড়তেন মা। বাবা থাকতেন থানা-আদালতে। আর ছিল সংসারের মধ্যে মুখ থুবড়ে দারিদ্র্য। আমি তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এণ্ট্রান্স পাশ করে বাবা আর পড়বার সুযোগ পান নি। এণ্ট্রান্স পাশ করাটাই তখন একটা মস্ত কীর্তি। আশে পাশের কয়েকটা গ্রাম থেকে বাবাকে দেখতে ভিড় করে এসেছিল লোকে। পাশ করার পরে। বাবার আরো পড়বার আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। দুঃসহ দারিদ্র্যের চাপে তাঁকে চাকরি নিতে হয়। রাইটার কনস্টেবল হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু, অবসর নেন পুলিস বিভাগের উন্নত দায়িত্বের পদ থেকে। শেষ জীবনে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল জুড়ে ছিল দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই আমাদের জন্ম ও শৈশব।

মা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে এখনও আমার অবাক লাগে। তিনি ছিলেন শিল্পীজাতের মহিলা, সুকুমারবৃত্তি ছিল তাঁর মনের অণুতে অণুতে। তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম স্মৃতি হলো তাঁর ছবি আঁকা। কুমিল্লা শহরের একটা বড় রাস্তার পাশে একটা বাড়ির বারান্দায় বসে তিনি ছবি আঁকছেন। রাস্তায় দু'টো লালমুখো সাহেব ঘোড়া চড়ে যাচ্ছে; বারান্দা থেকে তাদের

দেখা যায়। ঘোড়া শুদ্ধ তাদের চেহারার নকশা মা তাড়াতাড়ি এঁকে নিচ্ছেন, এ ছবি আজো আমার মনে জ্বল-জ্বল করে।

বিয়ের পর পনেরো-বিশ বছর তাঁকে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংসারের সব কাজ তাঁকে একাই করতে হ'তো। নানানতর সমস্যায় আর কাজে-কর্মে সবসময়ই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তবু মুখের হাসিটুকু তাঁর কখনো মিলাতো না। আশ্চর্য সেই হাসির প্রসন্নতা দিয়ে তিনি একটি শান্তি ও আনন্দের নীড় তৈরি করে রাখতেন সবার জন্য। এই আনন্দ ছিল তাঁর মনের গভীরে, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন শিল্পী।

নানা কজের মধ্যেও তিনি যখন নতুন সুরের কোন গান শুনতেন, অথবা নতুন পদের কোন কলি-- তিনি মনে করে রাখতেন। পরে অবিকল সেই সুরে গাইতে পারতেন। যদিও নিয়মিত সংগীত চর্চার তাঁর সুযোগ ঘটে নি, তবু তিনি ছিলেন সুগায়িকা। তাঁর গলায় এমন পরমাশ্চর্য দরদ ছিল যে তাঁর গান মনের খুব গভীরে নাড়া দিতো। তাঁর গান যে শুনেছে, সে-ই খুব প্রশংসা না করে থাকতে পারে নি। ছবি আঁকাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। মানুষের চেহারা, লতাপাতা ও আলপনার কারুকার্য তাঁর তুলিতে খুব চমৎকার হয়ে ফুটতো।

একটু অবসর পেলেই রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে পড়তে বসতেন। আর অপূর্ব দরদ ও ছন্দ মিশিয়ে তাঁর পাঠ আমাদের মুগ্ধ করতো, আমরা খুব সহজেই উপাখ্যানের রসানুভূতির নিবিড়তায় ডুবে যেতে পারতাম।

তাঁর আরেক দক্ষতা ছিল রন্ধনবিদ্যায়। সেকালে রান্নাকে অপাংক্তেয় করে রাখেন নি কুলবধূরা, রান্না মেয়েদের জীবনে একটি সহজ আনন্দময় প্রকাশ ছিল। কিন্তু আমার মায়ের রান্না সুগৃহিণীদেরও ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল।

নরুন দিয়ে পাতাকাটা ছিল আগে বাংলা দেশের এক উৎকৃষ্ট কারুশিল্প। এখন তা লোপ পেয়েছে। মা এই শিল্পেও সুচারু সূক্ষ্মতা অর্জন করেছিলেন।

আমার মা ত্রিপুরা জেলার এক সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র ঘরে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কালী-সিদ্ধ পুরুষ। কথা বলতে বলতে দাদামশাই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, - কোন এক অদৃশ্য মায়ের সঙ্গে মান-অভিমান, আদর-সোহাগ করতেন, আবার মাঝে মাঝে কটুকণ্ঠে গালিগালাজও দিতেন। কালী-সিদ্ধ দাদামশাই আমার মায়ের নাম রেখেছিলেন 'তারা'।

দারিদ্র্যের সংসারে বধূ হয়ে এসেছিলেন আমার মা। চাকুরিজীবী স্বামীর সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। সংসারের সব কাজই একা তাঁকে করতে হতো, তার ওপর ছিল অর্থাভাবের অন্ধকার। দেশের বাড়ীতে যখন থাকতেন—আমার ছ'বছর থেকে এগারো বছর পর্যন্ত গ্রামে কেটেছে—তখন দেখেছি কখনো কখনো চুলের তেল কেনার সামর্থ্য থাকতো না, কখনো উনুন ধরাবার কয়লা-কাঠ কিনবার মতো অর্থও থাকত না তাঁর সংসারে ; বাঁশ ঝাড়ের শুকনো পাতা সংগ্রহ করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হতো। তবু আশ্চর্য, এতো দারিদ্র্যেও তাঁর মনের সুকুমার-বৃত্তি পঙ্গু হয়ে যায় নি, যায় নি পক্ষাঘাতের মতো অসাড় হয়ে।

তাঁর ছবি আঁকা ছিল নেশা। গান করাতেও তাঁর আনন্দ ছিল। গুন গুন স্বরে গান গাইতেন তিনি সংসারের তুচ্ছ কাজকর্মের মধ্যেও, অবসর সময়ে রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করতেন। তাঁর গলায় এমন পরমাশ্চর্য দরদ ছিল, যার ফলে তাঁর গান মনের খুব গভীরে গিয়ে স্পর্শ করতো। সবচেয়ে মধুর ছিল তাঁর হাসি। এমন সুন্দর, এমন সরল, এমন মনোরম হাসি, যা দেখলে ভালোবাসতে ইচ্ছে করতো পৃথিবীর সব-কিছু।

আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রামে। তখনকার দিনে গ্রামগুলির চেহারা আজকালের মতো হীনপ্রভ ছিল না। শহরগুলিতে এতো ভিড় বাড়ে নি। গ্রামে গ্রামে তখনও লক্ষ্মীর শান্ত রূপ ছিল, প্রাণ ছিল, সৌন্দর্য ছিল। তবু তখনকার দিনেও চুন্টা গ্রামে যে প্রাণপ্রাচুর্য দেখেছি, অন্যত্র তা দুর্লভ ছিল সেদিনেও। পরবর্তী কালে

আমার বাল্যবন্ধু বিপ্লবী ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় চুণ্টার আরো অনেক উন্নতি ঘটেছিল। অবিনাশ গ্রামের একটি অসাধারণ সন্তান। বাল্যকাল থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, পরে তা বিপ্লবী সাধনায় আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। গ্রামের 'সন্তান সমিতি' ও জাতীয় বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। তার কিছুকাল পরে উচ্চতর বিদ্যার্জনের জন্য তিনি জার্মানী গমন করেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিদ্যায় 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেন। য়ুরোপেই তিনি ভারতীয় বিপ্লব সাধনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন, দেশদেশান্তরের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধের ভেরী যখন বেজে ওঠে, তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রকাশ্য কোন আন্দোলনে যোগ না দিলেও তখন গুপ্ত বিপ্লব-সাধনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে আমি, কনিষ্ঠভাই শশীভূষণ ও অবিনাশ একসঙ্গে মিলে গ্রামের নানা উন্নয়ন কাজের আলোচনা করতাম ও ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখতাম। হরিশ্চন্দ্র সেন মশায়ের চেষ্টায় গ্রামে এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়। মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নন্দকুমার ভট্টাচার্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আরম্ভ করেন, অবিনাশচন্দ্র সেন মশায়ের আনুকূল্যে বিদ্যালয়টি নতুন জীবন লাভ করে। সেন মশায়ের পত্নী গিরিবালা দেবীর সাহায্যে 'গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। শশীভূষণের চেষ্টায় একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটা নতুন জীবন, নতুন আলো, নতুন প্রাণস্পন্দন।

পূজার ছুটিতে গ্রামে যেতাম। আনন্দোৎসবে অপূর্ব একটা প্রাণের ইশারা স্পন্দিত হয়ে যেত মনের মধ্যে। গ্রামের সব হিতকর প্রচেষ্টার পেছনে ছিল আমাদের প্রেরণা ও সহযোগিতা। সেদিনের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে অপরূপ আনন্দ ও সৌন্দর্যের মুগ্ধতায় ভরে আছে। সে গ্রাম আর ফিরে পাবো কি ?

গ্রামের পাঠশালায় আমার বিদ্যার্জনের আরম্ভ। অনেকটা সংস্কৃত

টোলের মতো ছিল এই পাঠশালা। বই শ্লেট ও বসবার আসন নিয়ে আসতো ছেলেরা। সুর বেঁধে উচ্চরোলে চলতো বিদ্যাচর্চা। বিদ্যাদানের প্রাত্যহিক দক্ষিণা নিতেন গুরুমশাই, কেউ দিত চাল-ডাল, কেউ বা অন্য কোন নিত্য ব্যবহারের দ্রব্য।

দ্বারিকচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের পণ্ডিতমশাই। তিনি ছিলেন তোতলা, একটা চোখ ছিল ট্যারা, আর ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী মানুষ। সামান্য অমনোযোগিতায় তিনি ক্ষিপ্ত হতেন, ছাত্রদের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখলে তাঁর প্রচণ্ড রাগ হতো। তাঁর রাগের চেহারা আজও মনে আছে আমার। ক্রুদ্ধ গর্জন উঠছে তোতলা কথার মেঘে মেঘে, চোখ রক্তবর্ণ, তেলমার্জিত মসৃণ বেত্রদণ্ড অপরাধীর পিঠের ওপর সাপের মতো নাচছে। করুণ চিৎকারেও তাঁর মমতা হতো না, যতোক্ষণ রাগ না পড়তো ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তির ভয়াবহতা ঘুচতো না। এমনি দোর্দণ্ড প্রতাপে তিনি আমাদের বিদ্যাদান করতেন। উগ্র ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে ক্ষীণ ব্রাহ্মণ্যব্রতের রেশ মিশেছিল তাঁর চরিত্রে।

যে কোন প্রশ্ন শুনলেই তিনি দাঁত খিঁচিয়ে উঠতেন। প্রশ্নটা যদি পড়ার বাইরে হতো তাহলে আর রক্ষে ছিল না। গর্জন করতেন, 'পড়্ পড়্, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর কিসের জন্য রে?' তারপরই সপাং সপাং বেতটা এসে আছড়ে পড়তো প্রশ্নকারীর পিঠে। ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে চীৎকার করতেন, 'এঁড়ে গরু থেকে শূন্য গোয়ালও ভাল।'

বেশিদিন সে পাঠশালায় পড়তে হয় নি। নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে সেখান থেকে আমরা চলে আসি মায়ের সঙ্গে। নানা জায়গায় ঘুরি বাবার কর্মস্থলে: চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জের কথা মনে পড়ে। শীতলক্ষা নদীর তীরে সুন্দর সাজানো শহর। পাটের ব্যবসায়ে একটা বর্ধিষ্ণু বন্দর পূর্ববাংলার। সেখানে যখন এসেছি তখন কৈশোরের সীমায় পা দিয়েছে আমার বয়স। চারদিকে যা দেখতাম, যা পেতাম অযাচিতভাবে জীবনে, সবকিছু সুন্দর, আশ্চর্য

সুন্দর মনে হতো আমার কাছে। নদী, লাল রাস্তা, গাছ-লতা-ফুল, আকাশ, মানুষ—সবকিছু সুন্দর। চারদিকের এই সৌন্দর্য অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে এক বিচিত্র অনুরণন তুলতো আমার মনে। যা স্পর্শ করতাম তাতেই আনন্দশিহরণ, যে দিকে তাকাতাম সর্বত্র রূপের ঝিলমিল। বিচিত্র কৈশোর কাল। সকলের জীবনেই। মনে হতো আমার, শীতলক্ষার কলকাকলীমুখর তরঙ্গস্রোতের মতো আমিও অনির্দেশ গতিবেগে ছুটে ছুটে যাই।

ইস্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসেবে একটু খ্যাতি ছিল আমার। তাই শিক্ষকদের সহানুভূতি ও সহপাঠীদের প্রীতি পেয়েছিলাম। কিন্তু যার সঙ্গে আমার সবথেকে বেশী হৃদ্যতা জমে উঠেছিল তার নাম যামিনীমোহন পাল। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় না, তবু কৈশোরের সেই আশ্চর্য বন্ধুত্বের কথা এখনও মুগ্ধমনে স্মরণ করি। বঙ্কিম ও রমেশ গ্রন্থাবলী পাঠ করে যামিনী তখন রবিবাবুর কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছে। কবিপ্রাণ স্নিগ্ধহৃদয় ছিল তার। উদার আকাশের গায়ের নীলিমা ছিল তার বন্ধুত্বে। গেরুয়া সন্ধ্যার মত উদাস বৈরাগ্য ছিল তার ব্যবহারে। ‘প্রভাতসঙ্গীত’ ও ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ যামিনী আমাকে পড়তে দিয়েছিল। অভিভাবকদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। সব কথার মানে তখনও বুঝতে পারতাম না, সব ভাব ঠিকমত অনুভব করারও তখন বয়স হয় নি। কিন্তু সেই ছন্দোময় ধ্বনিময় কবিতাগুলি আমার কাছে এক নূতন জগতের বার্তা নিয়ে এসেছিল। যেন এই রূঢ় বাস্তব জগতের অন্তর্দেশে একটা কল্পলোকের স্বপ্নরাজ্য আছে। সেই অন্তর্মুখী জগতের আড়ালটুকু ছিন্নভিন্ন করে হৃদয়ের সুগভীর ভাবরাজ্যে অনুভূতির পাখা উড়িয়ে উড়িয়ে চলবার একটা বেদনার বাসনা জেগে উঠতো। শ্রাবণের অজস্র ঝরঝর বাদলে ঘরের মধ্যে আবিষ্টের মতো বসে থাকতাম। কোথায় যেন মন হারিয়ে যেত, একটা অর্থহীন অনির্বচনীয়তায় সারা মনে কবিতার একটি কলি গুনগুন করে উঠতো :

‘কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন।
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌;
মাতিয়া যখন উঠিছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।’

মনের মধ্যে যখন কাব্যময় অনুভূতি ছুটে ছুটে বেড়াতো, সে সময় শুধু যামিনীমোহনের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেই আমার প্রাণপিপাসা মিটতো। ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা দীর্ঘ চিঠি সে লিখতো আমাকে, আমিও তেমনিভাবে জবাব দিতাম।

॥ ৩ ॥

সেই বাল্যবন্ধু যামিনীমোহন আজ জীবনের কর্মপথ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন—সম্প্রতি তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু বালক বয়সে সেই ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার সাহচর্য আমার ভাবপ্রবণ মনে সহজেই সাহিত্যরসে ভরপুর করে দিয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জে রেললাইনের ধারে একটা দোতলা বাড়িতে বাস করতাম আমরা। আমরা ছিলাম উপরে, নীচের তলায় ছিল এক ভদ্রলোকের চালের দোকান। সময় পেলেই নীচের দোকানে গিয়ে বসতাম, দেখতাম কেনাবেচা, বুঝতে চাইতাম ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন। দোকানের মালিক আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর কাছেই বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রথম দেখতে পাই। লুকিয়ে লুকিয়ে সে বইগুলি পড়তাম। প্রথমদিকে সে ভদ্রলোক বই দিতে আপত্তি কবতেন কিন্তু আমার আগ্রহের কাছে তাঁর হার হয়েছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' 'মৃণালিনী' পড়ে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র আনন্দ পেয়েছিলাম তা দুর্লভ। 'বঙ্গবিজেতা,' 'মাধবীকঙ্কন' 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' পড়ে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলাম। ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বেদনা ও আশাআকাঙ্ক্ষার জীবন্ত নিঃশ্বাস রয়েছে কয়েক শতাব্দীর যবনিকা সরিয়ে তার কাছে চলে যেতাম আমি। পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে আরো বহুবার সে-বইগুলি পড়েছি, কিন্তু ছেলেবয়সের আধফোটা মনের কল্পনায় যেসব উপন্যাস পড়ার পর যে বিচিত্র আনন্দ, বিচিত্র শিহরণ অনুভব করেছিলাম, তা আর ফিরে পাই নি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে কিশোরগঞ্জে বদলী হয়ে আসেন বাবা। পুরনো বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিবেশ ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হয়। কিশোরগঞ্জে স্বদেশী আন্দোলন আরো গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে।

বাবা ছিলেন পুলিস বিভাগীয় কর্মচারী, তবু আমাদের তিনি বন্দী করে রাখেন নি তাঁর শাসনের খরতাপে। যেমন দেশটাকে বন্দী করে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসকরা বুটের দাপটে। কিন্তু চিরকাল কি বন্দী হয়ে থাকে কেউ, শৃঙ্খল মোচনের মৃত্যুপণ চেষ্টা একদিন আরম্ভ হয়ই। আরম্ভ হয়েছিল আমাদের দেশেও। কার্জনী দম্ভের প্রতিরোধে দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন।

আমরা তখন ছোট, বালক বয়েসী। কিন্তু আমাদেরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' পরে, মোটা চাদর গায়ে দিয়ে নগ্নপদে বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে আমরা যেতাম বিলেতী কাপড় আর লবণের দোকানে পিকেটিং করতে। স্বদেশী ব্যাজ লাগানো থাকতো আমাদের জামায়, দেশপ্রেমের বহ্নিটীকার মতো।

সে কী উত্তেজনা, কী উন্মাদনা। দেড়শ' বছরের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ফেলার জন্য কী প্রলয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস। আজ সেদিনের স্মৃতি সব ভাসছে মনের চিত্রপটে। আমাদের কৈশোর জীবনের সেই দেশব্যাপী গণজাগরণের প্রথম ঢেউ। তারপর আরো কতো বন্ধনমোচনের সংগ্রাম দেখলাম। তবু দেশের সেই প্রথম গণতরঙ্গের উচ্ছ্বাস মনে যেমন গাঢ় রেখায় দাগ কেটে বসে আছে, তেমন যেন আর কিছুই নেই। মনে হয়, সারা দেশের ঘুমভাঙা সেই প্রথম আলোড়নের বিপুল প্রাণচাঞ্চল্যের যেন আর তুলনা হয় না। সে সময়কার একটি কাহিনী মনে আছে।

তখন আমরা নারায়ণগঞ্জে। সংবাদ ছড়িয়ে গেল বিপিনচন্দ্র পাল আসবেন ঢাকায়, বুড়িগঙ্গার তীরে বড়ো পার্কে তাঁর সভার আয়োজন হচ্ছে।

আমাদের তো প্রচণ্ড উৎসাহ, স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ পোশাকে লাগিয়ে আমরা সদলবলে চলেছি ঢাকায়। রেলের কামরা আমাদের নিয়েই ভরে গেল। টিকিট নেই আমাদের। স্বরাজের উত্তেজনামুখর গল্প করতে করতে, গান গাইতে গাইতে আমরা দলে দলে চলেছি ঢাকায়।

কার্জনী ষড়যন্ত্রে তখন নতুন পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার সেখানকার নয়া-গভর্নর। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা, পুলিসের ত্রাস, ব্যাপক ধরপাকড়। আশঙ্কা করা হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র কড়া বক্তৃতা করবেন এবং তৎক্ষণাৎ পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন একটু ঘুরিয়ে। ইংরেজশাসনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন কেমন ভয়াবহ হয়ে উঠছে আর তারফলে জনসাধারণের কী দুঃসহ দুর্গতি—তিনি সে সম্পর্কে মর্মন্তুদ ভাষায় বাস্তবচিত্র তুলে ধরলেন। অবশেষে শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকিয়ে তীব্রতর ভাষায় আবেদন জানালেন, দেশের শাসনব্যবস্থার আশু পরিবর্তন না ঘটলে দেশের কোন উন্নতি হওয়াই সম্ভব হবে না।

সভার শেষে আমরা আবার দলবেঁধে উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জ ফিরে এলাম।

কিশোরগঞ্জ থাকাকালেই রাজনৈতিক আন্দোলনের গভীরতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ স্বদেশীর বাণী নিয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় দেশপ্রেমের দুর্বার উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে,' 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু' প্রভৃতি গানে ও কবিতায় সারা দেশের মন আশার বন্যাস্রোতে ছুটে চলেছে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে দিতে বিপিনচন্দ্র যখন এইসব গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন, শ্রোতৃমহলে তখন দুর্বার উন্মাদনা জেগে উঠতো। মনে হতো, বাঁধ ভেঙে গেছে, বান ডেকেছে। এ বান কে রুধবে, কে রুধবে, কে ?

সে-সময়ই আমি বাই-উইকলী অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম। 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা পড়তাম বন্ধুরা মিলে একত্রে। কিশোরগঞ্জে বিখ্যাত একটা ঝিল ছিল। ইস্কুলের পরে বাড়ি ফেরার পথে দশ-বারোজন বন্ধু মিলে ঝিলের একটা নিভৃত কোণে গিয়ে বসতাম, এক-

জন চেঁচিয়ে পড়তো 'বন্দেমাতরম্' বা 'যুগান্তর', আমরা সকলে সাগ্রহে শুনতাম। সরকারী টিকটিকিদের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার জন্যই ছিল আমাদের এই গোপনীয়তা। ঝিলের নয়নাভিরাম দৃশ্যের মধ্যে আমরা একটা রোমাণ্টিক আবেশে পড়তাম আর শুনতাম। দেশনেতাদের বিদ্রোহী বাণী এইসব পত্রিকায় পড়ে পড়ে দেশপ্রেমকেও রোমাণ্টিকভাবে গ্রহণ করেছিলাম।

কিশোরগঞ্জে সহপাঠী কিরণচন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। ঝিলে সংবাদপত্র পড়ার আড্ডায় তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আমরা এণ্ট্রান্স পাস করে ১৯০৮ সালে কিশোরগঞ্জ থেকে কলকাতায় আসি। সিটি কলেজে আই এস-সি ক্লাশে ভর্তি হই ও তখনকার ৬৬নং হ্যারিসন রোডে সিটি কলেজের বিখ্যাত মেসে বাস করি। কিরণই আমাকে নিয়ে কলকাতা শহর ও উপকণ্ঠ আবিষ্কারে বের হোত, ছুটির দিনে কলেজ পালিয়ে। ১৯০৮ সালের মহামারীর সময়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মেস থেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ভয়ে সকলে পরামর্শ দিল বাড়ি চলে যেতে। কিশোরগঞ্জে যাওয়া দুঃসাধ্য। দুইদিনের পথ। কিরণ তখন ছুটিতে জলপাইগুড়িতে। মাত্র এক রাত্রির রাস্তা জলপাই-গুড়িতে কিরণের কাছে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে যে সাদর অভ্যর্থনা সেবা যত্ন পেয়েছি কখনও তা' ভুলবার নয়। কিরণের বৌদি সুরমা দেবীর সঙ্গে কিশোরগঞ্জেই পরিচয় হয়। কোন পরীক্ষা পাস না করলেও সাহিত্যের স্পর্শ তাঁর মনে স্পন্দন জাগাতো। তাঁর চিঠির মধ্যে সে আভাষ পেতাম, কলকাতা থেকে তাঁকে অনেক চিঠি লিখেছি কৈশোরের নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তা প্রবাসের জীবনকে মধুময় করে রেখেছিল। সেই স্মৃতির সৌরভ এখনও ম্লান হয় নি। কিরণ ছিল করিতকর্মা ছেলে—আমি ছিলাম ভাবপ্রবণ। তাঁর কাছে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

সিটি কলেজে প্রবেশ করে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত হেরম্ব মৈত্র ছিলেন তখনকার প্রিন্সিপ্যাল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি ছিলেন একজন নামী অধ্যাপক। তাঁর পড়াবার ভঙ্গী ছিল মনোরম। ইংরেজী ভাষার আশ্চর্য মাধুর্য ছিল বক্তৃতায়। কিশোরগঞ্জে ইংরেজী ভাষায় যে আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম, এখানে এসে তা বিকশিত হলো। সাহিত্যানুরাগী সহপাঠী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের সহযোগিতায় একটি পত্রিকা বার করি। পত্রিকার নামকরণ হয় 'প্রীতি'। দু'তিন সংখ্যা পরেই পত্রিকার আয়ু ফুরিয়ে যায় কিন্তু তার মধ্য দিয়ে আমাদের যে সাহিত্য-প্রচেষ্টা, প্রকাশের ব্যাকুলতায় গুমড়ে ম'রে, তা তারপরও চলতে থাকে।

একদিন কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গেছি বিকেলের দিকে, হঠাৎ খবর শুনলাম বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো সংবাদটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যুবকবৃদ্ধ সকলে উত্তেজনায় আনন্দে উল্লাসে চারদিকে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করলো। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের অসমসাহসী পুরোধা, তিনিও ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন আন্দোলনের অগ্রণী নেতা। অল্পক্ষণের মধ্যেই কলেজ স্কোয়ারে 'সঞ্জিবনী' পত্রিকার বাড়ির চারদিকে কাতারে কাতারে লোক এসে জমে গেল। প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের মধ্যে আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, গজনভী, এ চৌধুরী, জে চৌধুরী, পৃথ্বীশ রায় প্রভৃতি নেতারা সেখানে উপস্থিত হলেন। আনন্দমুখর জনতার কলরব আর থামে না, দেশপ্রেমের প্রথম জয়লাভের আনন্দ আর বুকের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। শ্যামসুন্দর বাবু ও আরো দু'একজন নেতা বঙ্গভঙ্গ রদের পুরো খবর জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন, অভিনন্দন জানালেন দেশবাসীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য। বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে দেবার ঐতিহাসিক ঘটনা ও তারিখ: দিল্লী দরবার, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সাল।

কলেজ জীবনেই আমার বাল্যবন্ধু ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহচর্যে

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভায়' যোগদান করি। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্প নিয়ে এই সভার সূত্রপাত হয়েছিল, কালক্রমে ত্রিপুরাবাসীদের সকল প্রকার কল্যাণ-কর্মে সভা আপন চেষ্টা নিয়োগ করে। দুঃস্থ ছাত্রের সাহায্য, পীড়িতের শুশ্রূষা, বন্যার্তের সেবা—সভার কর্মকল্যাণের বিস্তার ঘটেছিল নানাভাবে। ১৯১৫ সালে সমগ্র ত্রিপুরা জেলায় ভয়াবহ বন্যার প্লাবন হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে আর্ত মানুষের করুণ হাহাকার ওঠে। সে সময় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা খুব প্রশংসনীয় কাজ করতে পেরেছিল। আমি বন্যাত্রাণ কমিটির সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম। চাঁদা তোলা, বস্ত্র সংগ্রহ করা, ও বন্যার্ত অঞ্চলে সেবাব্রত অক্ষুণ্ন রাখার দিকে আমাদের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। সরকারী সাহায্য, রামকৃষ্ণ মিশন ও মাড়োয়ারী রিলিফের সহায়তালাভের জন্যও আলাপ-আলোচনা চালাতে হতো। সে সময় এই দুর্যোগ আমাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার স্তূপে দাঁড়িয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের এই গভীর বিপদের মধ্যে আমি অনুভব করেছিলাম, মানুষে মানুষে যথার্থ কোন বিরোধ নাই। সব পার্থক্য, সব বিভেদ, সব বিরোধিতা কৃত্রিম, মানুষের হাতে তৈরী। এই কৃত্রিমতা যখন সত্যিকারের বিপদের সময় ভেঙে পড়ে, তখন দুঃস্থজনের মধ্যে মানুষের যথার্থ চেহারাটা স্পষ্ট হয়।

আমার বাবা যখন মুন্সীগঞ্জে ছিলেন তখন একটা নতুন জীবনের স্পর্শ লাগে প্রাণে। মধুময় সেই অনুভূতি। আমি তখন কলকাতায় পড়ি। ছুটির সময়টা মুন্সীগঞ্জে এসে বড়ো ভাল লেগেছে। শয়ন ঘরের কাছ দিয়ে শীতলক্ষার খাল জোয়ারে ভরে উঠতো। কত লোক মিঠে ভাটিয়াল রাগিণীতে আকাশে বাতাসে মধু ঢেলে দিতো। সেই সুরের স্পর্শ এক অজানা রাজ্যে মনটাকে টেনে নিতো।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণ অসুস্থ ছিল বলে তখনও বি এ পড়তে যায় নি। স্কুলে সাময়িক ভাবে মাস্টারী করতো। পরিচয় ঘটে যোগেন্দ্র রায়

মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। শিক্ষকতা করতেন স্কুলে। অশ্বিনী দত্ত ও বিবেকানন্দের আদর্শ সম্মুখে রেখে ছেলেদের সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তার সংস্পর্শে এসে আমিও 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত', 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' পাঠ করতাম। সেবাব্রতে মেতে উঠেছিলাম। তারপর শান্তি ও আনন্দে ভরে উঠতো মন। যখন বি এ পড়ি তখন ত্রিপুরা মেসে অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে একঘরে থাকতাম। অশ্বিনী বাবু বেলুড়মঠে যাতায়াত করতেন—সংসার ত্যাগ করবার সঙ্কল্প নিয়ে। আমিও মাঝে মাঝে মঠে গিয়েছি। বাবুরাম মহারাজের সংস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। সেই পরশ, সেই রামকৃষ্ণ স্তোত্র এখনও প্রাণের গভীরে সাড়া দেয়।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার এই সেবাকার্যের মধ্যেই অলক্ষিতে আমার সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ শুধু হয়। দুর্ভিক্ষের খবর ও নানান সভার প্রস্তাবাবলী সংবাদপত্রের জন্য আমাকে প্রত্যহ লিখতে হতো। 'ত্রিপুরা গাইড' নামে ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় জেলার বিভিন্ন খবর, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব থাকতো। পরবর্তী জীবনের ভিত্তি এই জনসেবার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছিল আমার জীবনে।

সে বছরই, এম এ পাশ করার পর আমার বিবাহ হয়। কালিকচ্ছ নিবাসী কুঞ্জবিহারী দত্তগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে আগেই আমার বিবাহ স্থির হয়েছিল। পরীক্ষার পর বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটে। কিন্তু তিক্ত ঘটনায় আমার বিবাহবাসরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়, সেকথা উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্য হবে না।

ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য জার্মানী থেকে প্রত্যাগমনের পর প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সামাজিক দায় সেরেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম উৎসাহী কর্মসচীব। তাই সমাজের বৃদ্ধ রক্ষণশীল দলপতিবৃন্দ আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমার বিবাহ বয়কট করেন। আরো নানা পীড়নের চেষ্টা ছিল। আমি তা'তে নিরুৎসাহ হইনি, একদিকে বন্ধুকৃত্য এবং অন্যদিকে সমাজের

অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা উজ্জ্বল আনন্দ ছড়িয়ে ছিল আমার মনে।

কিন্তু বিবাহবাসরে হঠাৎ একটা গোলমাল বিপর্যয়ের ঢেউ তুলে দিয়েছিল। আমার এক আত্মীয় বরযাত্রী এমন অসৌজন্যময় ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে কন্যাপক্ষের বেদনা ও অপমানের অন্ত ছিল না। আমি লজ্জায় মাথা নত করলাম, তবু নিজেই গিয়ে সেই অসৌজন্যময় ব্যবহারের যবনিকা তুলে দিলাম। সেই বিবাহানুষ্ঠানে এমন তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার পরিবারে পণপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটাবো এবং যেখানে পণপ্রথা থাকবে সেখানে বরযাত্রীরূপে কখনই যাবো না। পরবর্তী জীবনে সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে হয়নি।

যিনি স্ত্রী হয়ে আমার জীবনে এসেছেন, তাঁর ব্যবহার ও জীবনযাত্রা আমাকে অভীষ্ট যাত্রাপথে অপরিমেয় সহায়তা দিয়েছে। সারাটা জীবন আর্থিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কেটেছে, বৃহৎ সংসারের সকল দায়িত্ব তিনি শান্ত হাসিমুখে বহন করেছেন। বারবার আমি বেকার হয়েছি, তারপরও দীর্ঘকাল কেটেছে স্বল্প আয়ের সরু আলপথে। তবু আমি এগিয়ে গিয়েছি আমার আদর্শ লক্ষ্য করে, ব্যর্থতায় নিরাশ হইনি, পরাজয়ে পথচ্যুত হইনি। এই দীর্ঘ অর্থাভাবের দিনগুলিতে সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। জীবনসংগ্রামে যখন আপ্রাণ চেষ্টায় এগোচ্ছি, সংসারের দায়িত্ব ও আঘাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হয়তো তাঁর এই সহযোগিতা না পেলে মধ্যপথেই আমাকে থেমে যেতে হতো; অথবা গৃহের তুচ্ছতায় শক্তিক্ষয় করে বাইরে আমি পরাজিত বিপর্যস্ত হয়ে যেতাম।

আমার সাত কন্যা, এক পুত্র। সন্তানদের পালন ও সংসারের দীর্ঘকালীন অক্লান্ত শ্রমে আজ তিনি পঙ্গু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রবীণ বয়সে যখন কিছুটা স্বচ্ছলতার স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছি, তিনি তা উপভোগ

করতে পারলেন না। আমার সংগ্রামমুখর জীবনে অপর্যাপ্ত সাহায্য দিয়ে এসে জীবনের গোধূলিতে দেহভঙ্গের ক্লান্তিতে তাঁর দিনগুলি ধূসর হয়ে গেছে।

আমার জীবনে আর একজন মহিলা সেবা আনন্দ ও অনুপ্রেরণায় সহযোগিতা দিয়েছিলেন। তিনি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী স্বর্গীয়া প্রতিভা। নিজের মনোমত ক'রে গড়ে তুলেছিলাম তাঁকে, উচ্চশিক্ষায় ভূষিত করেছিলাম। দুঃস্থা নারীদের উন্নতিকল্পে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সংসারী হওয়ার সাধ তাঁর ছিল না। বিপ্লবী সাধনার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, মহিলা-বিপ্লবীকর্মীদের সঙ্গে ছিল প্রাণের আন্তরিক সংযোগ। দেশের স্বাধীনতা প্রয়াস আর উন্নয়ন-উদ্যোগে ছিল সোৎসাহ মমতা। যে কোন মহৎ কাজে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না; শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ছিল সানুরাগ প্রীতি। আমার কন্যাদের তিনি মায়ের মতো শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে মাতার স্নেহে, বন্ধুর সহমর্মিতায় ও ভগ্নীর সেবায় সারাজীবন ঘিরেছিলেন। আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৫৩ সালে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত আমাদের পরিবারের আনন্দের উৎস স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি পরলোকগমন করেছেন। যে শোক আমি আশঙ্কা করিনি, আমাকে তাই বহন করতে হচ্ছে।

॥ ৪ ॥

ইতিহাস ও কমপেয়ারেটিভ পলিটিকসে এম এ পাশ করি ১৯১৫ সালে।

পড়াশোনার ভার নিয়ে যতদিন কাটছিল, সংসারের রূঢ়তা অনুভব করার মতো সুযোগ আসেনি। পড়াশোনা শেষ করে জীবিকার দায়ে যখন সংসারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, তখন নির্মম রূঢ়তা অসহ্য বেদনার মতো কাঁটার ঘায়ে ফুটতে লাগলো পায়ে।

চাকরি একটা চাই, চাই অর্থার্জনের একটা মাসিক নিশ্চিতি। যে কোন চাকরি, স্বল্প আয়ের, সামান্য মাহিনার। গলদঘর্ম হয়ে ছোটাছুটি করি, চেনাশোনা মুরুব্বীদের বাড়িতে যাতায়াত করি, খবরের কাগজ দেখে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে নিয়মিত দরখাস্ত পাঠাই। দিনের পর দিন। চেষ্টার অন্ত নেই, উদ্বেগের বিরাম নেই। কিন্তু কোথায়ও মেলে না চাকরি। সর্বত্র শুধু নৈরাশ্যের কালো ছায়া।

মনে পড়তো দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী। দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম।

স্যর আশুতোষের জামাতা প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল অনেক দিন আগে থেকে। আমরা যখন মুন্সীগঞ্জে, তাঁর বাবা সেখানে মুন্সেফ ছিলেন। একই বছর আমরা বি এ ও এম এ পাশ করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। প্রমথ আমাকে সহানুভূতি জানাতো, চেষ্টা করতো স্যর আশুতোষের সাহায্যে আমার একটা চাকরির।

কিন্তু আলোর ইশারা নেই কোথায়ও। কোথায়ও নেই আশার সামান্যমাত্র ইঙ্গিত।

সে সময় 'সেন এণ্ড রায়ের' স্বত্বাধিকারী অধ্যাপক মণিমোহন সেন

আমাকে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারূপে 'সেন এণ্ড রায়ের' তখনই বিস্তর খ্যাতি ছিল।

কলেজে আমি অধ্যাপক সেনের প্রিয় ছাত্র ছিলাম। জীবিকা অন্বেষণে যখন গলদঘর্ম তখন তাঁর সহৃদয় সহানুভূতিতে মন ভরে গেল। তিনি বললেন, শিক্ষিত যুবকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ দিতে হবে দেশকে বড় করতে হলে। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাঁর ব্যবসায়ে নানা গোলযোগ দেখা দিয়েছে, আমি যদি রাজী থাকি তাহলে তাঁর প্রতিষ্ঠানে 'ম্যানেজার' হিসেবে নিযুক্ত হবো। কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলে, মালিকানার অংশীদার করে আমাকে ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার করে দেওয়া হবে।

অনতিবিলম্বে আমি রাজী হয়ে গেলাম। অধ্যাপক সেনের সহৃদয়তা মনের মধ্যে একটা নতুন পথের সন্ধান দিল। পাবলিশার। বিলেতে বড়ো বড়ো পাবলিশারদের কর্মময় জীবনে যে বৃহত্তর স্বাদ ছিল, মনে মনে তা আস্বাদ করতাম। কামনা করলাম, বৃহৎ একটা পাবলিশিং প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে জীবনের সাধনা রূপায়িত করবো।

সকালে যেতাম দোকানে। অবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে দিনগুলি ভরে যেত। দোকানে গিয়ে বইপত্তর মুছতাম, নতুন বই গুছিয়ে তাকে তুলতাম, স্টক মেলাতাম, টাকার হিসেব রাখতাম, বিক্রি ও প্রকাশনার দায়িত্ব পরিচালনা করতাম। ম্যানেজারির কোন মোহ ছিল না, মোহ ছিল কাজের। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা বাজতো কাজের চক্রতালে। বার ঘণ্টা কাজের মধ্যে একটুও বিশ্রাম ছিল না, ক্লান্তি ছিল না। অধ্যাপক সেনের প্রশংসাবাক্য মনের মধ্যে আরো অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দিত।

আমাকে আর একটা কাজের দিকে নজর রাখতে হতো। আমাদের প্রকাশিত বইগুলিকে ইস্কুলের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা। সাহেবী পোশাক তোরঙ্গে তোলা ছিল, সেটা গায়ে চড়িয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে ইস্কুলে ইস্কুলে হেডমাস্টারদের সঙ্গে দেখা করতাম। কথার

পর কথা জমতো, উঠতো নানান আলোচনা। প্রতিযোগী বইগুলির প্রতিরোধ পেরিয়ে অবশেষে অনেক চেষ্টার কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে বইগুলির নির্বাচন জুটতো।

পাবলিশার হবার ভাগ্যটা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলো না। তবু 'সেন এণ্ড রায়ে' কাজ করার সময় আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট গুণী, সুধী ও শিল্পীর সঙ্গে ক্রমে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মজুমদার, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি অন্যতম।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার একটি প্রখ্যাত নাম। আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, দেশ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের যশস্বী পরিচালক ছিলেন। অসামান্য সাফল্যে তাঁর জীবন উজ্জ্বল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের মালিক। কলেজ স্কোয়ারের ছোট একটা বাড়িতে তাঁর প্রেস। সেখানে আমাদের অনেক বই ছাপা হতো, ছাপার নানাকাজে আমি যেতাম তাঁর প্রেসে, তিনি আসতেন আমাদের দোকানে।

সুরেশবাবু ছিলেন বিপ্লবী। বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রশিষ্য। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বিপ্লবের অভিযোগে। দেশপ্রেম ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে। এই দেশপ্রেম বহন করে গেছেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগোষ্ঠী সংগঠন করেছেন।

অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন সুরেশচন্দ্র, মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই জীবনই যাপন করে গেছেন। কাজের চাপে সারাদিন ভারাক্রান্ত, তারই মধ্যে দেশের কথা আলোচনা করতেন বন্ধুদের সঙ্গে। তাঁকে দেখে মনে হ'তো যেন স্বেচ্ছাসেবকের জীবন তাঁর। প্রেসের কাজ, বিপ্লবী ও দেশকর্মী বন্ধুদের সাহচর্য, সরল অনাড়ম্বর জীবন। কখনও তাঁর প্রেসে গিয়ে দেখেছি

চারটি চেয়ার একসঙ্গে করে বইপত্র মাথার নীচে রেখে অজস্র কাজের মাঝখানে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা ও শ্রমমুখিতা নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন।

'সেন এণ্ড রায়ে' কাজ করার সময়ই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী জীবনে সাংবাদিকতার সহযাত্রীরূপে এই বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছিল। একটা ঘটনা আজও মনে করে আমি আনন্দিত হই, আমাদের সেই প্রথম বন্ধুত্বের দিনে, যখন আমি সেন এণ্ড রায়ের কর্মচারী আর তিনি মাত্র একটা প্রেসের স্বত্বাধিকারী, সে সময় আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন।

ফাউন্টেন পেন তখন বিলাসী সামগ্রীর মতো। আমি তা ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি তখনও।

একদিন দোকানে বসে আছি, দোয়াত কলম দিয়ে হিসেব লিখছি। বারে বারে কালি শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু বিরক্ত এই কালির অসৌজন্য ব্যবহারে।

সুরেশবাবু সামনের চেয়ারে বসে। হঠাৎ তিনি বল্লেন, 'একটা ফাউন্টেন পেন দেবো আপনাকে, কালি শুকোবে না।' তার কয়দিন পর উপহার দিলেন একটা ফাউন্টেন পেন। সেই আমার প্রথম ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করা।

সুরেশবাবুর সঙ্গে পরিচিতির সূত্র ধরে পরবর্তী জীবনে, প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রথম দেখাতেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সুমধুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর চরিত্রে অনমনীয় একটা দৃঢ়তা ছিল। বিষম দুঃখেও তিনি বিচলিত হতেন না, বিশাল সুখেও চাঞ্চল্য জাগতো না। মনের মধ্যে আশ্চর্য প্রশান্তি ছিল তাঁর। এমন বিশাল হৃদয়, স্নিগ্ধভাষী, অমায়িক ভদ্রলোক সবদেশেই বিরল।

তাঁর কাছে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করেছি আমি। যখনই সময় পেতাম, যেতাম আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর কাছে। আলোচনা হতো

সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি নিয়ে। সব সময়েই উজ্জ্বল প্রীতি-মাখানো হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বে এই স্নিগ্ধ হাসি ছিল চিরজ্যোতির্ময়। আনন্দবাজার পত্রিকার ওপর কতো ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, কতো ক্ষতি ও সংকটের আবর্ত এসেছে, কিন্তু তাঁর হাসি কখনো ম্লান হয় নি মুহূর্তের জন্যও।

আনন্দবাজার পত্রিকার তদানীন্তন প্রধান কর্মকর্তা শ্রীমাখনলাল সেনের সঙ্গেও তখনই পরিচয়। ক্রমশ এই পরিচয় আত্মীয়তার মতো অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে পরিণত হয়েছে। তীব্র জাতীয়তাবাদী ধরনের লোক তিনি, দেশব্রতের সাধনায় বিপ্লবী পুরুষ। জাতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতেন তখন থেকেই।

আমার পরবর্তী জীবনে সুরেশচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার ও মাখনলাল পরম সহায় হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান ফ্রী প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেসের সংগঠনে তাঁদের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করবো।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী তখনও নটগুরু হন নি, বিদ্যাসাগর কলেজের তখন তিনি খ্যাতনামা ইংরেজীর অধ্যাপক। জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধ্যাপক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁরা দু'জনেই 'সেন এণ্ড রায়ের' নোটবই লিখতেন। পাণ্ডুলিপি দেওয়া, প্রুফ পড়া ও অর্থ গ্রহণের প্রয়োজনে প্রায়ই তাঁরা আসতেন। পুরো মানুষ হিসেবে তাঁদের দেখতে পেয়েছি আমি। মানুষ হিসেবেও তাঁরা যে কতোখানি গর্বের, তা আমি অনুভব করতাম। প্রসিদ্ধ মুদ্রাকর ও মডার্ন বুক এজেন্সির মালিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমার আলাপের সূত্রপাত তখনই। পরে তা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে।

'সেন এণ্ড রায়' যখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পৌঁছেছি, তখন সব কল্পনা ভেঙে দুমড়ে গেল। আবার আমি বেকার হয়ে পথে নেমে এলাম।

অধ্যাপক সেনের এক খুড়তুতো ভাই ওকালতি করতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করে ভাই-এর ব্যবসায়ে এসে বসলেন। তাঁর ইচ্ছা, ব্যবসায়ে অংশীদাররূপে প্রবেশ করা।

অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ নিয়ে আমার কাজ আমি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে গেছি। সমস্ত বিশৃঙ্খলতা দূর করে প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির সোপানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এ সময় অধ্যাপক সেনকে অনুরোধ জানালাম ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটাররূপে আমাকে লিখিতভাবে নিয়োগ করতে।

অধ্যাপক সেন বিষম সমস্যায় পড়লেন। আমার কাজে তাঁর দৃঢ়মূল আস্থা ছিল, আবার ভাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার মতো মনোবলও ছিল না। অবশেষে তিনি জানালেন, আমাকে লভ্যাংশ দিয়ে জয়েণ্ট ম্যানেজাররূপে নিয়োগ করা হবে।

আমি রাজী হলাম না। দু'জন কর্মাধ্যক্ষ হয়ে কাজ করা মস্ত হাঙ্গাম। লভ্যাংশ বহু অংশে বিভক্ত হয়ে গেলে ভাগ্যে যত অংশ আসবে তা লোভজনক নয়। মনের মধ্যে নৈরাশ্যের মেঘ। ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। তবু অবশেষে সমস্ত উদ্বেগ নির্মূল করে দিয়ে 'সেন এণ্ড রায়ে' পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

নিঃসহায় নিঃসম্বলরূপে আবার ভাগ্যনির্ধারণ করতে বেরোলাম। স্যর বি এল মিটারের ছেলেকে প্রাইভেট পড়িয়ে আগে পঞ্চাশ টাকা আয়ের একটা পথ ছিল। 'সেন এণ্ড রায়ে'র নিরন্ধ্র কাজের চাপে তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আবার সেই পূর্বেকার অন্ধকার দিন আর রাত্রি। আশাহীন, ভরসাহীন, উদ্বেগসংকুল। তবু গভীরতর অভিমান মনের মধ্যে ভরে গেল, এই অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ মনে হলো। তাই পদত্যাগ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

॥ ৫ ॥

বেকার হয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। সে পথ বড় নির্মম, বড় উত্তপ্ত।

কখনো প্রখর রোদে, কখনো বৃষ্টিতে ভিজে চীনাম্যানদের তৈরী পাঁচ-সিকে দামের ক্যানভাসের জুতো পরে, সস্তা টেনিস শার্ট গায়ে, বাঁশের ভাটের ছাতা হাতে, সারা শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়াতাম। ইস্কুলের সচিব বা প্রধান শিক্ষকের কাছে শিক্ষকের চাকরির আবেদন জানাতাম। কোথায়ও জুটতো সহানুভূতির সহৃদয়তা, কখনো বা অবজ্ঞার হাসি ছুঁড়ে মারতেন কেউ কেউ। দিনশেষে শ্রান্তদেহে একরাশ গ্লানির বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। সংসার প্রায় অচল অবস্থার সীমায় পৌঁছেছে, বাবার পাঠানো পঞ্চাশ টাকাই মাত্র সম্বল।

পাবলিশারী কাজে অভিজ্ঞতা ছিল বলে ছোটবড় বইয়ের দোকানেও দরখাস্ত পাঠিয়েছি। লংম্যানস্‌গ্রীন, ম্যাক্‌মিলান, নিউম্যান ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করেছি। তিন মাসে বোধহয় হাজারখানেক দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দুঃখ প্রকাশ করে সৌজন্যমূলক জবাব দিয়েছেন কেউ কেউ, অধিকাংশ জায়গা থেকে কোন উত্তর পাওয়াই সম্ভব হয় নি।

ডক্টর অবিনাশ আমার বাল্যবন্ধু! জার্মানী থেকে ফিরে এসে নারকেলডাঙ্গায় একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর টেকনো-কেমিক্যাল লেবরেটরির ডিরেক্টরবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বরেন্দ্র রিচার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়। অবিনাশ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। শরৎচন্দ্রের দাদা দীঘাপতিয়ার রাজাবাহাদুরের ছেলেদের জন্য মোটা মাহিনায় গৃহশিক্ষক ছিল। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের সুপারিশক্রমে রাজাবাহাদুরের দ্বিতীয় ছেলের জন্য আমি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলাম। ইংরেজী ও ইতিহাস পড়াবার

দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। অন্যান্য শিক্ষকরা প্রত্যেক বিষয় পড়াবার জন্য পেতেন ১৫০৲ টাকা তবুও একেবারে আই এ পাশ করাতে পারেন নি। কিন্তু আমার বেলায় দু'টি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল ৭৫৲ টাকা। বহু ব্যর্থ পরিশ্রম ও উদ্বেগের পর এই টাকাই তখন আমার কাছে স্বপ্নের মতো।

আমার ছাত্র বিজনেন্দ্রনাথ একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও বিশেষ মেধাবী ও বুদ্ধিমান। খুব যত্ন ও আন্তরিকতা নিয়ে আমি পড়াতে শুরু করি। ক্রমশ ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে, রোজ খুব বেশি পড়বে না, সহজ করে দিতে হবে পাঠের পরিশ্রম। প্রতিদিনের পড়া বুঝিয়ে পরীক্ষোপযোগী প্রশ্নোত্তর তৈরি করে দিতাম। আমার কাজ করে যেতাম আমি, কিন্তু সে তার সংসার ও আশাআকাঙ্ক্ষার গল্প করতো। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে গাড়ি করে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোত। নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে বাড়ি পৌঁছে দিত।

আমার সাহচর্যে সেবারই সে আই এ পাশ করলো। পাশ করেই বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। যে কোন বিরুদ্ধ পরামর্শ ও উপদেশ বিতৃষ্ণার সঙ্গে উপেক্ষা করতে লাগলো। যাবেই সে বিলেত। অনতিবিলম্বে!

আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লাম। বি এ পাশ করে বিলেত যাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছিল। গ্রাজুয়েট হয়ে বিলেত গেলে ব্যারিস্টারী পাশ করা সহজ হবে। আমার পরামর্শ শুনে শরৎচন্দ্র রায় খুশী হলেন, বিজনেন্দ্রও উপদেশটি গ্রহণ করলো। অনেক বুঝিয়ে বলার পর আই এ পাশ করে বিলেত যাওয়াটা অনুচিত মনে হলো তার। তখন খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটা রিস্টওয়াচ ও ফাউণ্টেন পেন উপহার দিল।

ঠিক হলো বি এ পাশ করে সে বিলেত যাবে। বিজনেন্দ্রের ভগ্নীপতি

কাশীমবাজারের মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক কয়াজীর কাছে পাঁচ শ' টাকা মাহিনায় প্রাইভেট পড়ে বি এ পাশ করেছিলেন। বিজনেন্দ্রকে পড়াবার জন্য কয়াজীর নাম প্রস্তাবিত হলো। আমি পড়াতে পারবো কিনা সে সম্বন্ধে অভিভাবক ও গার্জেন টিউটরের সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার ওপর বিজনেন্দ্রের অগাধ আস্থা। সে দাবী করে বসলো আমাকে ছাড়া আর কারো কাছে পড়বে না। তখন বি এ ক্লাসের তিনটি সবজেক্টের, ইংরেজী, ইতিহাস ও অর্থবিজ্ঞানের জন্য আমিই রয়ে গেলাম। বেতন স্থির হলো একশ' পচিশ টাকা। অন্যান্য টিউটরদের তুলনায় সে মাহিনা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু তখন টাকার এই অঙ্কটাই আমার কাছে খুব লোভনীয়।

দীঘাপতিয়ার রাজবাড়িতে টিউটর হিসেবে আমার সুনাম হয়েছিল। সেই বাড়ির কাছেই আমার আত্মীয় ও গ্রামবাসী এ সি সেন মহাশয় বাড়ি করেছিলেন। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ-এর কাজে ও বহু চা-বাগানের মালিক হয়ে তিনি খুব ঐশ্বর্যবান হয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র অমিয় নানা কারণে আই এ পাশ করতে পারে নি। সে অবস্থায়ই বিলেত গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এ সি সেন মশায় তাকে পড়াবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন।

একদিন বিকেলে অমিয় আমার বাড়ি এসে হাজির। একটা পার্কে গিয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। তাকেও বিজনেন্দ্রের মতো উপদেশ দিলাম গ্রাজুয়েট হয়ে বিলেত যেতে। নানা অসুবিধার কথা তুলে ধরলাম, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধও করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার সীমান্তে এসে লাগলো পৃথিবী। চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলো অমিয়। অবশেষে সে এখানে থেকেই পড়তে রাজী হলো। আমিই তার পড়াবার ভার নিলাম। অবলীলাক্রমে সে বি এ পাশ হয়ে গেল। এখন সে ব্যবসা ও ক্রীড়াজগতে স্বনামখ্যাত। এ সি সেন মশায়ের মৃত্যুর পর ইউ পি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর।

আর একজন খ্যাতনামা পুরুষের প্রাইভেট টিউশনী আমি করেছিলাম। আমার বন্ধু অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী পরবর্তী জীবনে যিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল হয়েছিলেন, তখন সদ্য তিনি হাইলাকান্দির জমিদারকন্যাকে বিবাহ করেছেন। তাঁর শ্যালক হীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রায় কোন পড়াশোনা না করেই নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। অশ্বিনীবাবু শ্যালকের বিদ্যার বহর একদিনেই ধরে ফেল্লেন, কিন্তু ধরে ফেলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। অনেক ভাবনার পর হীরেন্দ্রের পড়াশোনার ভার আমার হাতে দেন। আমিও হীরেন্দ্রের বিদ্যে দেখে কিছুটা চিন্তিত হই।

নতুন করে একেবারে প্রারম্ভ থেকে হীরেন্দ্রের পড়াশোনা আরম্ভ করি। মুখে মুখে ভাষা ও ব্যাকরণ শেখাই। অল্পকালের মধ্যে সে খুব উন্নতি করে, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে মাট্রিক উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে বিনা সহায়তায় আই এ ও বি এ পাশ করে। খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছেলে হীরেন্দ্র। পরবর্তী জীবনে সে আসাম আইনসভার ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছিল।

প্রাইভেট টিউশনী করে দিন গুজরান করতে হয়েছে আমাকে। ছাত্রদের পড়িয়ে আমার আনন্দ ছিল। কিন্তু এভাবে যে জীবন চলে না প্রতিক্ষণে তা অনুভব করতাম। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও কর্মের আনন্দে আলোকিত করার জন্যে মনের মধ্যে তীব্র আকুতি জেগে থাকতো প্রতি মুহূর্তে। কৈশোরে অমৃতবাজার পত্রিকার মহাত্মা শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের প্রবন্ধ পড়ে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আলোড়নে মনের মধ্যে দেশপ্রেমের যে গভীর অনুভব ছড়িয়ে গিয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্যে আশ্চর্য ব্যাকুলতা জাগতো মনে।

অনেক ভেবে স্থির করেছিলাম সাংবাদিক হবো। গণৎকারের ভবিষ্যবাণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা মাথায় থাকুন, সঙ্কল্প নিয়েছিলাম আমি হব সাংবাদিক। জার্নালিস্ট।

পৃথ্বীশ রায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন আমার আত্মীয় গোবিন্দ রায়।

পৃথ্বীশবাবু 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ডের' সম্পাদক এবং 'বেঙ্গলী' দৈনিকপত্রের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর কাছে যাতায়াত শুরু করলাম। তাঁর প্রবন্ধ শুনতাম, প্রুফ দেখতাম, লেখা পড়তাম। দিনের পর দিন তাঁর কাছে গিয়ে সাংবাদিকতার নানা বিভাগ একান্ত মনোযোগ ও একাগ্রতা নিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। মাসের পর মাস।

প্রায় বছরখানেক পর একদিন শুভ-লগ্ন এলো আমার জীবনে। 'বেঙ্গলীর' সহ-সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হলাম। রাষ্ট্রগুরুর স্নেহচ্ছায়ায় আমার সাংবাদিকতা শুরু হলো।

মনে হলো, আমার থেকে সুখী আর কেউ নেই বুঝি। যা চেয়েছি পেলাম তা। যার জন্যে মনের মধ্যে তীব্র কামনা, তা নেমে এলো আমার এই উদ্বেগব্যাকুল বেদনাঘন জীবনে।

বেঙ্গলীতে কাজ করতে আরম্ভ করলাম আন্তরিক মমতা নিয়ে। এ কাহিনী আগেই বলেছি।

'বেঙ্গলী'তে আমাকে কাজ শেখাবার ভার নিয়েছিলেন হেমচন্দ্র নাগ ও উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। হেমচন্দ্র পরবর্তী কালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' সুযোগ্য সম্পাদকরূপে সারা ভারতে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। উপেন্দ্রনারায়ণ বাবুও ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ সাংবাদিক।

হেমবাবু 'রয়টার' ও 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' টেলিগ্রাম সম্পাদনা করে হেডিং দিয়ে ছাপতে পাঠাতেন। উপেনবাবু রিপোর্টার-দত্ত স্থানীয় সংবাদাদির সম্পাদনা করতেন। তাঁদের দুজনের কাছেই আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজ করেছি।

আজকাল সংবাদপত্রগুলিতে যেমন 'বার্তা-সম্পাদক', 'নৈশ-সম্পাদক', 'বাণিজ্য-সম্পাদক,' 'সাহিত্য সম্পাদক' প্রভৃতি বহুবিধ বিভাগের জন্য বহুতর ব্যক্তি থাকেন, তখনকার দিনে তেমন ছিল না। দু'চারজন সাংবাদিক নিয়েই পত্রিকা চলতো এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে পত্রিকার সম্পূর্ণ মেজাজ বেশ ভালোভাবেই ফুটে বেরোত।

বর্তমানকালে সব পত্রিকায়ই নিউজ এজেন্সি থেকে সুসম্পাদিত সংবাদ পরিবেশিত হয়। তখনকার দিনে তেমন ছিল না; অনেকটা টেলিগ্রামের তারের মতো সংবাদ আসতো। সহ-সম্পাদকের এই সমস্ত সংবাদ সম্পাদিত করে প্রেসে পাঠাতে হতো। মনে হতে পারে কাজটি খুবই সহজ এবং সোজা। কিন্তু আসলে একাজে যথেষ্ট নিষ্ঠা, ধৈর্য, জ্ঞান ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হতো। কাজটি দুরূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টারদের দেওয়া সংবাদগুলিকেও সংবাদপত্রের ভাষায় ঢেলে সাজাতে হতো। শিক্ষানবিশী কালে সব কাজই হেমবাবুকে দেখাতাম। তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যথাযোগ্য অদলবদল করে দিয়ে আমাকে সম্পাদনা করার কায়দা শেখাতেন। কিছুকাল এমনি চলার পর তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন যে, আমার সম্পাদিত কপি আর তাঁকে দেখাতে হবে না। সেগুলি সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তখন মাঝে মাঝে পুস্তক সমালোচনা লিখতাম এবং সময় সময় সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় লিখেও তাঁকে দেখিয়েছি। এসব ক্ষেত্রেও যথাযথ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে আমাকে উৎসাহ দিতেন। কি করে আরো ভালো লেখা যায়, কি ভাবে আরো সুন্দর শোভনতর ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা চলে তিনি তা শিখিয়ে দিতেন।

আমার সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভে হেমচন্দ্রের কাছে যে প্রেরণা পেয়েছি, তা আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে পাথের হয়ে ছিল।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনসেবা ও দেশসেবাই ছিল হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। সেই আদর্শে আমাকেও তিনি অনুপ্রাণিত করে-ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে আজও তাঁর সেই আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছি।

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হেমচন্দ্রকে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাজ করতে হয়েছে। কোন কিছুতেই তিনি আদর্শচ্যুত হন নি। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল, তাঁদের সঙ্গেও তাঁর

মনবিরোধ ছিল না। মধুর সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল তাঁর, কারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষা তাঁর মনকে তিলমাত্র বিষাক্ত করিতে পারে নি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অজাতশত্রু।

কিছুকাল আগে পরিণত বয়সে তিনি পরলোকগমণ করেছেন। তাঁর চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠা চিরকালই সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

সে সময় ইংরেজি 'বেঙ্গলী'র সঙ্গে আর একটি বাংলা দৈনিক বেরোত, আর নাম ছিল 'বাঙ্গালী'। সুপণ্ডিত, সুলেখক ও হাস্যকৌতুক বিশারদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদক। সহকারী-সম্পাদক ছিলেন বর্তমান 'দেশ'-সম্পাদক ভগবৎরত্ন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

পাঁচকড়িবাবু অফিসে আসামাত্রই বেয়ারা গড়্গড়ায় তামাক সেজে আনতো। সুমিষ্ট সুবাসযুক্ত তামাক। সেই তামাক টানতে টানতে সকলের সঙ্গে প্রচুর হাস্যকৌতুক করতেন তিনি। তাঁর অনেক নামী ও খ্যাতনামা বন্ধু এই আড্ডার নিয়মিত সভ্য ছিলেন। আমিও অবসর পেলে পাঁচকড়িবাবুর কৌতুকমুখর আড্ডায় এসে বসতাম। তৎকালীন দেশের অবস্থা, স্বদেশীকর্মীদের জীবনকথা, রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা কাহিনী এই মজলিসে সজীব হয়ে উঠতো। কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে এখানে কত জ্ঞান, কত প্রেরণা, কত আনন্দ লাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

গল্পগুজব শেষ করে পাঁচকড়িবাবু যখন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসতেন, তখন একটা আশ্চর্য তন্ময়তা তাঁকে ঘিরে থাকতো। লিখতে তাঁকে কোন আয়াস করতে হতো না, আপন গতিতেই তাঁর কলম থেকে স্বচ্ছন্দ-লেখা বেরিয়ে আসতো। সেই শান্ত, সৌম্য, সদাহাস্যময় গৌর-কান্তি দীর্ঘপুরুষটির চিত্র এখনও মনের কোণে স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের সঙ্গেও তখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শিশুর মতো স্নিগ্ধ সরস হাসি, অধিকাংশ সময়েই সমুদ্রের কলতানের মতো উচ্ছ্বাসময়, সর্বদা তাঁর মুখে লেগে থাকতো। এমন হাসি যে, অত্যন্ত স্বল্প সময়েই

মানুষটি একেবারে প্রাণের মধ্যে আত্মীয় হয়ে আপন হয়ে ওঠেন। তাঁর নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা ও নিঃস্বার্থ সাংবাদিকতা-প্রাণময়তা সকলকেই মুগ্ধ করতো। পরবর্তীকালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং যখন সেই প্রতিষ্ঠান থেকে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকে 'দেশ'-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখনও তিনি এই কাজে রত। তাঁর সম্পাদনায় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের নিপুণ সহায়তায় অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাভাষার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'দেশ' একটি অনন্য আসন অধিকার করেছে।

'বেঙ্গলী' অফিসে আরো কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অমলচন্দ্র দাশগুপ্ত ও বিভূতি সান্ন্যাল তখন 'বেঙ্গলীর' রিপোর্টার ছিলেন। অমলবাবু এখন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার চীফ-রিপোর্টার ও সহকারী সম্পাদক। 'বেঙ্গলী'তে তখন তিনি সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করেছেন। তাঁর রিপোর্টের কপি আমাকে দেখিয়ে নেবার নির্দেশ ছিল। তাঁর লেখা তখনই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, সেকালেই আমার ধারণা হয়েছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি উঁচুদরের সাংবাদিক হবেন।

বিভূতি সান্ন্যাল ইংরেজি কায়দায় B. Sandal লিখে নাম সই করেন, তিনি ছিলেন কায়দা-কানুন-দুরস্ত রিপোর্টার। 'বেঙ্গলী'তে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তারপর 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে' পাঁচ বছর আমাদের সঙ্গে কাজ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সারভেণ্ট' পত্রিকায় যখন বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেছিলাম, তখন অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে সান্ন্যালকেও নিয়ে যাই। পরে আমার ফ্রী প্রেসে যোগ দেবার সময় তিনিও সেখানে যোগদান করেন। তারপর ১৯৩৩ সালে ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠা করি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত তিনি আমার কর্মসহযোগী।

বিভূতি সান্ন্যাল চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন। বহুতর মজলিস বা বন্ধুসমাবেশে সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' আবৃত্তি করে প্রভূত আনন্দ

বিতরণ করেছেন তিনি। 'সবুজ সম্মেলনী' একটি ছোটদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তিনি, তাঁর রচিত গীতিনাট্য 'মিলন মেলা' আলফ্রেড থিয়েটারে সেই প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

অবশেষে একদিন বেঙ্গলী থেকে চলে এলাম তৎকালীন বিখ্যাত এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিকপত্র 'ডেইলী নিউজে'।

ব্যয়সংক্ষেপ বা জনপ্রিয়তা, যে কোন মোহেই হোক ইংরেজ সম্পাদকের স্থানে তখন যশস্বী বাঙ্গালী সাংবাদিক কালিকৃষ্ণ সেনকে 'ডেইলী নিউজের' সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। আগে কালিকৃষ্ণ ছিলেন বার্তা সম্পাদক।

ভারতীয় সম্পাদকের অধীনে কাজ করতে এংলো-ইণ্ডিয়ান সহকর্মীদের সম্মানে আঘাত লাগে। একযোগে পদত্যাগ করে তাঁরা 'ডেইলি নিউজের' সকল সংস্পর্শ পরিত্যাগ করে যান। এই অবস্থায় বেঙ্গলী'র নৈশ সম্পাদক কিরণচন্দ্র ঘোষ 'ডেইলি নিউজে' যোগ দেন। আমাকেও 'বেঙ্গলী' থেকে নিয়ে আসেন 'ডেইলি নিউজের' সহকারী বার্তাসম্পাদকরূপে চাকরি দিয়ে।

যদিও পুরোপুরি কাজ শেখা তখনও আমার হয়ে ওঠে নি, তবু নতুন পদে যোগ দিতে সম্মত হলাম। মনে হলো অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকতা শেখা আমার পক্ষে সহজ হবে 'ডেইলি নিউজে'। অবশ্য ষাট টাকা থেকে একশপঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধিও উন্নতি বলে মনে হয়েছিল।

তখন সবে প্রথম মহাযুদ্ধে শেষ হয়েছে। ইংরেজী ১৯১৯ সাল।

॥ ৬ ॥

'ডেইলি নিউজ' সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন উইলিয়ম গ্রেহাম। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করতেন তিনি, শেষ জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গ্রেহাম সাহেব ছিলেন উদারনৈতিক ইংরেজ। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় কয়েকজন ইংরেজ সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন সনাতন ব্রিটিশ মনোভাব নিয়ে সংবাদপত্র পরিচালনা করে 'স্টেটস-ম্যান' ও 'ইংলিশম্যানের' সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ হবে না। তা ছাড়া কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ব্যারিস্টার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে আই বি সেন, এ চৌধুরী, জে চৌধুরী, এস এন হালদার, সি সি ঘোষ, ডি সি ঘোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অন্যতম। এঁদের অনেকের লেখাই বেনালে 'ডেইলি নিউজে' প্রকাশিত হতো। বন্ধুদের প্রভাবে উইলিয়ম গ্রেহাম তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তিত করে একজন বাঙালী সম্পাদক নিযুক্ত করা স্থির করেন। তদনুযায়ী 'বেঙ্গলীর' সহকারী সম্পাদক কালিকৃষ্ণসেন 'ডেইলী নিউজেস' সম্পাদক পদে বৃত হন। এই পরিবর্তনের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং কলিকাতার একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্ররূপে 'নিউজের' খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কালিকৃষ্ণ সেন বা কে কে সেন খুব জবরদস্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ছিল রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও সংবাদপত্রের প্রতি বিভাগ সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান। গম্ভীর রাশভারী লোক ছিলেন অসাধ্যসাধন চেষ্টায় সংবাদপত্রের সর্বোচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তাঁর আদর্শ ছিল সুচারু সুপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল একটি সংবাদ-পত্রের। রিপোর্ট, সম্পাদকীয় বা অন্যতর রচনায় সংযত, ঋজু ও ব্যঞ্জনাময়

ভাষা তিনি পছন্দ করতেন। সংবাদপত্রের সমস্ত বিভাগে অর্থাৎ সংবাদ, প্রবন্ধ এমন কি বিজ্ঞাপনেও সুন্দর ভাষা ও আঙ্গিকের সামঞ্জস্য ঘটবে, এ তাঁর ইচ্ছা ছিল।

তখনও আমি শিক্ষানবিশী, সকল বিভাগ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা তখনও জাগে.নি। তাই এমন একজন শক্তিশালী সম্পাদকের প্রধান সহকারী-রূপে কাজ করতে বুক কাঁপতে থাকতো। যদি অক্ষম অপদার্থ অপবাদে বিতাড়িত হই।

রয়টার পরিবেশিত সংবাদ সেন মশাই নিজে দেখে দিতেন। আমার উপর ভার পড়লো এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ ও অন্যান্য রিপোর্টারদের লেখা সম্পাদন করে হেডিং দেবার। আমার কাজগুলো সেন মহাশয়ের হাত দিয়ে যেতো এবং তাতে তাঁর সই থাকতো। প্রতি মুহূর্তে ভয় করতো, আমার শক্তি তাঁর বিচারের কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে যাবার।

আজকালকার মতো কলরবমুখর পত্রিকা অফিস ছিল না তখনকার দিনে। সম্পাদক সেন মহাশয়, সহকারী সম্পাদক বা বার্তাসম্পাদকরূপে আমি দিনের বেলা একটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাজ করতাম। কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দিনের বেলা স্মলকজ কোর্টে ওকালতি করে রাত্রিতে এসে নৈশ সম্পাদকের কাজ করতেন। দিনে দু'জন ও রাত্রিতে দু'জন এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রুফরিডার ছিল।

দ্রুতগতিতে সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল সেন মহাশয়ের। রয়টারের সংবাদ সম্পাদনা করা, সম্পাদকীয় ও অন্যান্য মন্তব্য লেখা এবং আরও বিভিন্ন কাজ করা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যেই এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতেন তিনি। যেগুলো যাওয়া প্রয়োজন সেগুলো সংক্ষিপ্ত করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে লিখে দিতেন এক কোণায়, 'Rewrite—5 lines,' '10 lines,' অথবা '20 lines'। (নতুন করে লিখুন—৫ লাইন, ১০ লাইন অথবা ২০ লাইন) যা যাবে না সেগুলো নীল পেন্সিল দিয়ে কেটে দিতেন।

প্রত্যেকটি মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকার প্রতি ইঞ্চির মূল্য অনেক। তাই সংবাদ সংক্ষিপ্ত করে সম্পাদনা করা একটা প্রয়োজনীয় রীতি। কিন্তু সংক্ষিপ্তকরণে সংবাদের সহজবোধ্যতা ব্যাহত হবে না, অথচ দৃঢ় হবে। এই নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে আমাকে বেশ চেষ্টা করতে হতো। চিঠি-পত্র, রিপোর্ট, মফঃস্বলের সংবাদ, এমন কি সভাসমিতির বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত সমস্ত কিছু লেখা স্বল্পকথায় ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকাশ করার নৈপুণ্য অর্জন করার দিকে প্রথমটা আমাকে প্রচুর খাটতে হতো। কিছুকালের মধ্যেই তা স্বভাবের মধ্যে মিশে গিয়ে সম্পাদনা করা সহজ হয়ে এলো। কিছুদিন পরে অমল হোম সহকারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁকে পাওয়ায় বেঁচে গেলাম। এতদিন গল্প করার সঙ্গী ছিল না। অল্পদিনে তাঁর সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠলো। অমলকে রয়টারের টেলিগ্রাফ ও রিপোর্টারদের কপি এডিট করার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল 'রবিবাসরীয়' সম্পাদনা করা। এমন ভাবে জ্ঞাতব্য তথ্য ও কৌতূহলদীপ্ত সংবাদ দিয়ে পৃষ্ঠাটি সাজাতেন তিনি, অল্পদিনেই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রাত্রি ন'টায় বাড়ি যাবার জন্য উঠবার হয়তো উপক্রম করছি, তখন সেন মশায় ডেকে বল্লেন, 'চলুন একসঙ্গে বাড়ি যাই। এডিটোরিয়ালের ফাইন্যাল প্রুফটা এক্ষণি আসবে, আপনি কপিটা ধরুন।' হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ডাকে মনে মনে একটু বিরক্ত হতাম। তিনি তা বুঝতে পারতেন। নানা গল্পগুজব করে আমার মেজাজটা শান্ত করার চেষ্টা করতেন। তখনকার রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায় সকল সংবাদই তিনি রাখতেন, গল্প করতেন তাঁদের সম্পর্কে, দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে। তারপর প্রুফটা এসে গেলে বলতেন, 'এবার ধরুন।'

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। প্রায় রোজ। কিন্তু পাঁচ বছরের এই দীর্ঘ পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমার মস্ত উপকার হয়েছিল। সেদিন

তা বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে পেরেছি, যখন সার্ভেন্ট পত্রিকায় সাম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার দরকার হয়েছিল। সাংবাদিকের শিক্ষা এভাবেই আমার পূর্ণ হয়েছে।

গ্রেহাম সাহেব যদিও দৈনন্দিন কাজে বিশেষ সহায়তা করতেন না, তবু তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে ছিল এই পত্রিকা। সকালবেলা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাগজটি পড়তেন। অফিস যাবার সময় একটা কাগজে তাঁর মন্তব্য সহ লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া এক কপি পত্রিকা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কোন কিছুই তাঁর নজর এড়াতো না। কোথায় শেয়ার মার্কেট কোটেশনে অঙ্কের ভুল হয়েছে, কোথায় সংবাদ বা বিজ্ঞাপনে বর্ণাশুদ্ধি রয়ে গেছে, কোন রিপোর্টে 'বাবু ইংলিশ' বেরিয়েছে, সব তাঁর চোখে পড়তো। আর এই সব স্থানের চারদিকে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া তাঁর মন্তব্য খুব প্রীতিপ্রদ ছিল না।

অফিসে এসেই গ্রেহাম সাহেবের রিপোর্ট পাবার জন্য আমরা সন্ত্রস্ত থাকতাম। সম্পাদক মহাশয় আমাদের ও রিপোর্টারদের ডেকে এই সব অশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন অম্ল-মধুর ভাষায় মন্তব্য করতেন যে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হতো। আমরা এক একজনে অমানুষিক পরিশ্রম করে পাচজনের কাজ করেছি তা বলার সুযোগ ছিল না। একটা সুউচ্চ আদর্শ নিয়ে ত্রুটিহীনভাবে দায়িত্ব পালন করার দিকেই আমাদের আগ্রহ ছিল প্রবল। তাই প্রত্যেকটি ভুল-ত্রুটি পর্বতপ্রমাণ লজ্জার মতো আমাদের মাথা নত করে দিত। কোন সংবাদ যদি রিপোর্টাররা ভুল করে সরবরাহ করতে না পারতেন তাহলে গ্রেহাম সাহেব মন্তব্য লিখতেন, 'very sorry, you have missed this item.' (খুব দুঃখিত, আপনি এই সংবাদটা বাদ দিয়ে গেছেন)। মালিকের হুকুমে নয়, সাংবাদিকতার ত্রুটিতে আমাদের নিজেদের কাছে তা অপরাধের মতো মনে হতো।

এখন সংবাদপত্রের কাজকর্মে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যান্ত্রিক

উন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের আমূল রূপান্তর ঘটেছে। খবরের সংখ্যা বেড়েছে, সম্পাদনার কায়দা বদলেছে। রাজ-নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও শিক্ষার সম্প্রসারণে পত্রিকার চাহিদাও প্রচুর বেড়ে গেছে। কাজেই আগের চাইতে এখন অনেক বেশি অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন পড়ে সংবাদপত্র অফিসে। কিন্তু একটা কথা অনুভব করা যায় অত্যন্ত সহজেই, আগেকার আদর্শবাদ এখন ম্লান হয়ে ব্যবসাবুদ্ধির প্রাধান্য এসেছে সংবাদপত্র-জগতে। ইউরোপ আমেরিকার মতো। তার ফলে আঙ্গিকে প্রায় স্বপ্নের মতো উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু সাংবাদিকতার চরিত্রে আগেকার তপস্বীর মতো সাধনা মনে হয় কমেছে।

এখানে কাজ করার সময় ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে সি রায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাদের অফিসে এসেছিলেন যুদ্ধোত্তর সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

আলোচনার পর সেন মশায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। স্বল্পক্ষণের আলাপ। দীর্ঘদেহ বিরাট পুরুষটি সশব্দ হাসি দিয়ে মধুর অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে আমার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন।

আমাদের দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া গঠনের ইতিহাস কৌতূহলপ্রদ। তখনকার দিনে বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি সরকারের হেডকোয়ার্টার কলকাতা ও সিমলায় (গ্রীষ্মকালে) সংবাদদাতা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু 'পাইওনিয়ারের' সংবাদ দাতা ছিলেন সব থেকে চতুর। কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। তখন কলকাতার তিনটি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'স্টেটস্‌ম্যান,' 'ইংলিশম্যান' ও 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের' প্রতিনিধিবৃন্দ এ জে বাক, এভরাড কোয়াটস্‌ ও ডালাম সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকেন। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের কে সি রায়ের কাছ থেকে ডালাম প্রচুর সাহায্য পেতে থাকেন। এইভাবে

গড়ে ওঠে এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া। এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠায় কে সি রায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু রায়কে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় নি, তখন তিনি 'প্রেস ব্যুরো' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন। কিছুকাল পরে প্রতিযোগিতায় অপারগ হয়ে 'প্রেস ব্যুরোর' সঙ্গে এ পি সম্মিলিত হতে বাধ্য হলো। তখন 'প্রেস ব্যুরো' বন্ধ হয়ে গেল আর কে সি রায় এ পি'র ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। তারপর যখন রয়টার এ পি পরিচালনা করতে থাকেন তখন কে সি রায়কে ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত করা হয়। তাঁর পরলোকগমনের পর উষানাথ সেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পরে পি টি আই সংগঠিত হয় এবং এ পি আই তার মধ্যে সম্মিলিত হয়।

কে সি রায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল আন্তরিকতার মধুর সাহচর্য পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, সাংবাদিকতা আমার কেমন লাগছে।

মনেপ্রাণে যে কথাটা অনুভব করতাম তাই বলেছিলাম তাঁকে। বলেছিলাম, 'সৃষ্টির আনন্দে আমি আনন্দিত।'

হয়তো উত্তর শুনে তিনি খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, যার সাধনা আছে এবং পরিশ্রমবিমুখ নয়, তার জয় হবেই।

কথাটা দীর্ঘকাল পেরিয়ে এসেও এখনও আমার কানে বাজে।

॥ ৭ ॥

পাঁচ বছর কাজ করেছি 'ডেইলি নিউজে'। অনন্যমনে সাগ্রহে। উৎসাহ আর নিষ্ঠায় একাগ্রচিত্ত হয়ে। অনেক সময় বড় বেশি পরিশ্রম গেছে, অনেক সময় নিজস্ব দায়িত্বের চেয়েও অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, এ-কালটা আমার সাংবাদিক জীবনের স্বর্ণযুগ। শিক্ষানবিশী সাংবাদিক থেকে সংবাদপত্রের সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞাসম্পন্ন পুরাদস্তুর সাংবাদিক হয়ে উঠেছিলাম এ কালটাতেই।

এ সময়ে কয়েকটা ট্রামওয়ে ধর্মঘট হয়েছিল। এমন সাফল্যজনক ধর্মঘট আর দেখি নি। নানা অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধের মধ্যে ট্রাম শ্রমিকদের কাজ করতে হতো; তারি স্তিমিত অসন্তোষ থেকে এক একটা ধর্মঘট ঘটেছে। ঐক্যবদ্ধ দাবীর জোরে ধর্মঘট খুব সাফল্য লাভ করেছিল এবং অধিকাংশ দাবী পূরণ করতে পেরেছিল।

কিন্তু ট্রামওয়ে ধর্মঘটের কালে যাত্রীদের দুর্ভোগ ভুগতে হতো চূড়ান্ত। কলকাতায় তখন যাত্রী পরিবহনের সুলভ উপায় একমাত্র ট্রাম। দূর দূর প্রান্তকে কর্মজীবনের সঙ্গে সংযোগ করেছে ট্রাম; সেই ট্রামের চাকা বন্ধ হয়ে পড়ে থেকেছে ডিপোতে। কলকাতার কর্মজীবনের উপর তার প্রতিক্রিয়া পড়েছে, পথচারীরা বিপন্ন হয়েছে দ্রুত চলাচলের অভাবে।

আবদুল সুভান নামে একজন বুদ্ধিমান বাঙ্গালী এই অসুবিধাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন কলকাতায়। বাস সার্ভিসের প্রচলন আরম্ভ করলেন তিনি। প্রথম বাস চলতো হাওড়া থেকে শ্যামবাজার। পরে অন্যরা আরম্ভ করেন শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। আজ বাস সার্ভিস কলকাতার নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম নির্ভর। অনেক বাস এসেছে, অনেক রুট বেড়েছে, শহরতলীর বহু দূর দিগন্ত থেকে

শহরের কেন্দ্রবিন্দুকে করেছে সংযোজন। আজ হঠাৎ যদি বাস বন্ধ থাকে তাহলে কলকাতার কর্মচাঞ্চল্যের হৃৎপিণ্ড বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর অর্থ ও পরিশ্রমে যে লাভজনক ব্যবসায়ের সূত্রপাত, বাঙ্গালীরা তার থেকে বিতাড়িত হয়েছে। পাঞ্জাবী শিখদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তোষ না রেখেও বলা যায় পরিশ্রম-বিমুখতা বাঙ্গালীকে এমনিভাবে হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা আসাম চা-বাগান কুলিদের সর্বব্যাপক ধর্মঘট। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চল থেকে বিভিন্নভাষী নিরন্ন দরিদ্র মানুষেরা এসে কাজ করতো চা-বাগানে। অল্প মজুরি জুটতো তাদের, দু'বেলা দু' মুটো পেটপূরণও পূর্ণ হতো না। তার উপর ছিল নানানতর নির্যাতনের পালা। ছুটি নেই, বোনাস নেই, সম্ভ্রম নেই, স্বাধীনতা নেই; মানুষগুলো ছিল ক্রীতদাসের নামান্তর। দুঃসহ নির্যাতনের পেষণে তারা পর্যুদস্ত হচ্ছিল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। একদিন তারা মাথা তুলে দাঁড়ালো, বললোঃ 'আমরা কি মানুষ নই?' এই প্রশ্ন বাগান থেকে বাগানে ছড়িয়ে পড়লো; শ্বেতদ্বীপের শ্বেতমানুষের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটি ও চাবুকের দুঃসহ যাতনাও আর স্তব্ধ করে দিতে পারলো না। আরম্ভ হলো ধর্মঘট, সর্বব্যাপক ধর্মঘট।

এই ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছিল দেশের একটি নিদারুণ মর্মবেদনার বিন্দু থেকে, যার ফলে অনতিবিলম্বে দেশের হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়ে উঠলো। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও স্টিমার সার্ভিসের শ্রমিকরা সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট আরম্ভ করলেন, দেশব্যাপী বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে লাগলো। দেশনেতা তখন সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি এই নির্য্যাতিত মানুষদের আশ্রয় দিলেন। তাঁর সেদিনের মূর্তি কি ভোলার? একচোখে তাঁর বজ্রবিদ্যুৎ, আর চোখে মর্মযাতনার অশ্রুজল।

'ডেইলি নিউজ' পত্রিকা ইউরোপীয় সাহেবের। সাহেবদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিঃসহায় কুলিদের ধর্মঘট চলছে, কিন্তু উইলিয়ম গ্রেহাম ইউরোপী-

য়ানদের কলঙ্ককে কলঙ্ক বলেই মনে করলেন। 'ডেইলি নিউজ'-এর পাতায় চা-বাগানের কুলিদের করুণ কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় লেখা হলো, ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জানানো হলো। একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক পত্রিকার এই অসমসাহসে ও দেশবাসীর প্রতি একাত্মীয়তায় পাঠক-সাধারণত খুশী হলেন, উৎফুল্ল হলেন,। 'ডেইলি নিউজের' কাট্‌তি দ্রুত বেড়ে গেল। কিন্তু তবু বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটলো ক্লাইভ স্ট্রীটে, সাহেবদের পাড়ায়, শাসন-কর্তাদের অফিসে। ভারতপ্রীতির জন্য উইলিয়াম গ্রেহাম তাঁর দেশবাসী বন্ধু, আত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে সর্বত্র পেলেন বিদ্রূপ, অপবাদ, নিন্দা। কিন্তু তবু তিনি দমলেন না, টললেন না। পত্রিকার রাজনৈতিক অভিমতের বদল করলেন না।

এই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে 'মণ্টেগো চেমস্‌ফোর্ড' রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়েছে, মহাযুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী সেবাদল পর্যন্ত গঠন করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধের অবসানে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হবে, কিন্তু নতুন শাসন প্রণালীতে কিছুই পাওয়া গেল না। ফলে প্রচণ্ড অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হলো। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতারা এই শাসন প্রণালীকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। এই সময় ভারতবসীকে খুশী করবার চেষ্টায় যুবরাজ এডোয়ার্ড ভারতবর্ষে আগমন করেন।

যুবরাজ যেদিন কলকাতায় পৌছান সেদিন দু'পক্ষ থেকে দু'ধরনের ব্যবস্থা চলেছিল। আমলাতন্ত্র ও উদারনৈতিকরা যুবরাজের অভ্যর্থনা করেন আড়ম্বরের সঙ্গে, অন্যদিকে কংগ্রেস নেতারা ও দেশবাসী এক ব্যাপক হরতাল ঘোষণা করেন। এই হরতাল আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিল। ট্রাম, বাস, দোকানপাট সব বন্ধ। কাজকর্ম, অফিস আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত কিছু প্রতিবাদের স্তব্ধতায় মুখর।

সারা দেশের বিক্ষোভ ও হরতালের খবর আমরা 'ডেইলি নিউজে'

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম। যুবরাজকে অপমান করার কোন মনোভাব ছিল না আমাদের সংবাদ প্রকাশের ভঙ্গীতে, দেশের ইচ্ছা তাঁর কাছে পৌছে দেবার জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। কলকাতা পুলিস-অধিপতি প্রবল প্রভাবান্বিত স্যর চার্লস টেগার্ট তখন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নেতা। উইলিয়ম গ্রেহামকে তিনি কটূক্তি, নিন্দা ও বিদ্রূপে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেই তাঁরা থামলেন না, তাঁরা জোর করতে লাগলেন, হয় কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হোক, নতুবা পত্রিকার নীতি পরিবর্তিত হোক।

দীর্ঘদিন নিজের সমাজে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছেন গ্রেহাম সাহেব। অনেক কটূক্তি, ভর্ৎসনা, অপবাদ বরণ করে নিয়েছেন। নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন অবিচলিত ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ে। কিন্তু আর পারলেন না। এবার ভেঙে পড়লেন। কিছুকাল কাটলো। দু'-এক বছর। তারপর একদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।

জলের দামে বিক্রি করে দিলেন 'ডেইলি নিউজে'র রোটারী মেশিন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি। পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন তিনি। কিন্তু কাকে বিক্রি করলেন ?

বিক্রি করলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। সারা দেশের মর্মজয় করে স্বাধীনতা সাধক 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা তখন দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রোটারী মেশিন চাই। চাই আরো নানান অবশ্যপ্রয়োজনীয় আসবাব পত্র। সেই প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ করলেন উইলিয়াম গ্রেহাম। কল্পনাতীত সস্তায় বিক্রি করে দিলেন। জন্ম থেকে যবনিকা পর্যন্ত উইলিয়ম গ্রেহামের দৈনিক পত্রিকা ভারতপ্রীতিতে ভাস্বর।

॥ ৮ ॥

'ডেইলি নিউজে'র সর্বশেষ সংখ্যা মুদ্রিত হয়ে ছাপাখানা নিস্তব্ধ হলো। কালো মেঘের অন্ধকার নিয়ে আমরা নেমে এলাম পথে। পাঁচ বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ভাগ্যের পরিহাসে পুনর্বার বেকার হলাম। আবার সেই দারিদ্র্য আর কর্মহীন দিনগুলিকে মাথায় নিয়ে উদ্বেগসঙ্কুল দিন যাপন।

দিনের পর দিন যেখানে বসে কাজ করেছি, বছরের পর বছর, সেই অফিসের অন্তরঙ্গ পরিবেশ ছেড়ে এলাম। অনেক আশা আর অনেক স্বপ্ন দিয়ে যাকে লালন করে এসেছি, হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটলে যে নিদারুণ শোক অকস্মাৎ মনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, তেমনি বেদনাময় অনুভূতিতে ভরে গেলাম। চোখে পড়ছিল কতকগুলো ম্লান মুখ, যে মুখগুলো বহুদিনের চেনা, কর্ম-সহযোগী। আমরা সবাই বেকার হয়ে গেলাম বিনা নোটিসে।

একটা আশা ছিল মনে। হয়তো 'ফরোয়ার্ডে'র কর্তৃপক্ষ আমাদের ডেকে নেবেন। সহানুভূতি পাবো তাঁদের কাছ থেকে।

পথে নেমে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কিছু ভাবছিলাম। মনে পড়ছিল একদিনের কাহিনী।

সেদিন অজস্র ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি, বাত্যা সহযোগে। কলকাতার পথঘাট ডুবে গিয়েছিল প্লাবনের মতো। কি করে অফিস যাবো, সে ভাবনাই একান্তভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। কোনদিন কোন কারণেই অফিস কামাই করি নি, আজ কি তাই করতে হবে?

'ডেইলি নিউজ' সাহেবী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বলে বিলিতী পোশাক পরে অফিস যেতাম। পোশাক পরে বেরোলাম রাস্তায়। জুতো আর

কোটটাকে পুঁটলী বেঁধে কোমর জল ঠেলে এগোতে লাগলাম। ট্রাম, ট্যাক্সী, বাস, ঘোড়ার গাড়ি—সব বন্ধ। পথ নির্জন, কয়েকটি ফূর্তিবাজ বালক ছাড়া কেউ বেরোয় নি দুর্যোগের দিনে।

অনেকদূর গিয়েও কোন যানবাহনের সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে পোশাক পরিচ্ছদ ভিজে টইটুম্বুর। তখন উপায়হীন অসহায়তায় বাড়ি ফিরে এলাম।

সারারাত্রি ঘুম এলো না। কেমন করে পত্রিকা বেরোবে কেবল এই চিন্তা। সম্পাদক মশায় অফিসে যেতে পারলেন কিনা, সারারাত্রি কেবল দুশ্চিন্তা।

সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে গেলাম সম্পাদক মশায়ের বাড়ি। বাইরের ঘরে বসে চা সহযোগে তিনি সকালের কাগজ পড়ছিলেন। আমি কম্পিতবক্ষে ঘরে ঢুকে চৌকির এক পাশে বসে পড়লাম। খুব স্বল্পকথায় অফিস না যাবার কারণটা তাঁকে জানালাম। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, অবশেষে বল্লেন, 'ভয়ানক অন্যায় করেছেন। যেভাবেই হোক অফিস যাওয়া উচিত ছিল। এমন যেন আর কখনো না হয়।'

পাঁচ বছরে সেই একদিন মাত্র কামাই হয়েছিল অফিস যাওয়ায়। ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে পাচজনের কাজ একা সমাধা করেছি। কখনো বিরক্তি প্রকাশ করি নি। কখনো ছুটি নিই নি।

আজ পাঁচ বছরের অনলস পরিশ্রমের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। আবার সেই অনিশ্চিতির উদ্বিগ্ন জীবন।

আবার দরখাস্ত পাঠানো। অফিসে অফিসে, আত্মীয়দের কাছে চাকরির খোঁজ নেওয়া। আবার সেই নৈরাশ্য। জীবনের রূঢ় পথ।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে চাকরি প্রার্থনা করেছিলাম। তাঁর জামাতা ডাঃ প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহাধ্যায়ী, প্রমথের সুপারিশক্রমে তাঁর কাছে হাজির হলাম।

স্যর আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রকৃষ্ট সময় ছিল আটটা থেকে দশটা।

বাড়ির নিচের তলায় খালি গায়ে বসে সে সময় তিনি তেল মাখতেন। বহুলোক নানানরকম আবেদন নিয়ে হাজির হতো সে সময়ে।

তিনি আশা দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে ভালো মাহিনায় রীডারের চাকরি খালি হয় অনেক সময়। আমার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। তাঁর সহৃদয়তায় আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

এমন সময় একটা জরুরী মামলার দায়ে পাটনা গিয়েছিলেন স্যর আশুতোষ। অকস্মাৎ সেখানে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। জাতীয় শোকের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত শোক অনুভব করেছিলাম তাঁর মৃত্যুতে।

কিরণ ঘোষ মশায় আবার 'বেঙ্গলী'তে চাকরি জুটিয়ে নিলেন। বন্ধুবর অমল হোম-ও বেকার থাকলেন না। তাঁর আহ্বান এলো 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট' থেকে। দেশবন্ধু দাশ তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন 'গেজেট' সম্পাদনা করার জন্যে। কর্পোরেশনের সংবাদ ও নাগরিক জীবনের নানা খবর-বার্তা ও জ্ঞাতব্য তথ্য থাকতো পত্রিকায়। স্বল্পদিনের মধ্যেই 'গেজেট' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অমল হোমের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল পত্রিকার বিভিন্ন 'স্পেশ্যাল সংখ্যা' সম্পাদনায়। আচার্য জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিশেষ সংখ্যাগুলি সমৃদ্ধরচনা, মুদ্রণশ্রী ও সম্পাদনা নৈপুণ্যে এমন চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে সেগুলি সাময়িক সাংবাদিকতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঁচ বছর একসঙ্গে এক টেবিলে বসে কাজ করেছি—একদিনও মতের অমিল কিংবা বাকবিতণ্ডা হয়নি। সম্পর্কটা বন্ধুত্বে মধুময় হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

আমাদের সম্পাদক কে কে সেন মশায় সাংবাদিক হিসাবে প্রখ্যাত ব্যক্তি। 'ক্যাপিট্যাল' পত্রিকা থেকে অহ্বান পেলেন তিনি। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল'। ভারতবর্ষে পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন তার সম্পাদক প্যাটলোভাট। স্বাক্ষরিত তাঁর সাপ্তাহিক মন্তব্য-গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্যাটলোভাট আমাদের সেন মশায়কে প্রতি সংখ্যায় একটি করে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখবার জন্য নিয়ে গেলেন।

কিন্তু আমার ডাক এলো না। আমি বেকার হয়ে চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অবশেষে মাস-পাঁচেক পর আহ্বান এলো পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশায়ের কাছ থেকে। তাঁর বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'সারভেণ্টে'র বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন আমাকে। সানন্দে রাজী হয়ে আবার নতুন উদ্যমে নতুন পরিবেশে প্রবেশ করলাম।

॥ ৯ ॥

'সারভেণ্ট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন গান্ধীবাদের পুরোধা নেতা। অহিংসামন্ত্র প্রচারের জন্য 'সারভেণ্টে'র জন্ম।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন সারা দেশে প্রবল উত্তেজনা, তখন শ্যামসুন্দরের দক্ষ সম্পাদনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'সারভেণ্ট' আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী সে সময় দেশে এক নতুন প্রাণবন্যার সৃষ্টি করেন। চরকা ও সুতাকাটার ধুম পড়ে যায় চারিদিকে। দেশপ্রেমের শপথ নিয়ে উকিল, চাকুরে ও ছাত্ররা সরকারী ভবন ও ইস্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শহরে গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদবপুরে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হয়।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার আবেগের স্রোত আনে দেশে। সে সময় 'সারভেণ্ট' জনপ্রিয়তার চরম শিখরে। অন্যান্য পত্রিকা দশ হাজার পনর হাজারের বেশি মুদ্রিত হতো না, 'সারভেণ্টে'র চাহিদা ত্রিশ হাজার। শেষরাত্রি থেকে দুপুর পর্যন্ত ছাপা হতো পত্রিকা, তবু সকলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না।

চৌরীচেরা দাঙ্গায় বিচলিত হয়ে গান্ধীজী হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন অসহযোগ আন্দোলন। আহিংসা তাঁর কাছে কেবল দাবী পূরণের পথ ছিল না, জীবনের মূলমন্ত্রও ছিল। হিংসার কলুষতায় কাতর হলেন তিনি, বুঝলেন দেশ এখনো অহিংসার পথে অগ্রসর হবার জন্যে প্রস্তুত হয়নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গান্ধীবাদের পরিপূর্ণ সমর্থক হয়ে উঠতে পারেন নি। স্বরাজপার্টি নামে একটি নতুন দল সংগঠিত করে তাঁদের অভীষ্টপথে দেশসেবার সাধনা করতে লাগলেন। আইনসভায়

প্রবেশ করে নতুন শাসনযন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার সঙ্কল্প ছিল স্বরাজপার্টির, অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধীজী তা' অনুমোদন করেছিলেন। যে সমস্ত কংগ্রেস-কর্মী গান্ধীবাদের অন্ধভক্ত ও স্বরাজপার্টির বিরোধী ছিলেন, 'নো-চেঞ্জার' নামে তাঁদের অভিহিত করা হতো।

স্বল্পকালের মধ্যেই স্বরাজ্য পার্টি জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করে। আইনসভায় প্রবেশ করে দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। এই চমকপ্রদ সংবাদের দৈনন্দিন উত্তেজনায় তখন বাংলাদেশে নতুন জোয়ার এসেছে রাজনীতিতে।

'সারভেন্ট' নো-চেঞ্জার পত্রিকা। তাই তার বিপুল জনপ্রিয়তা স্বরাজ পার্টির অভ্যুদয়ের সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ত্রিশ হাজার চাহিদা, নামতে নামতে এলো পাঁচশ', তিনশ', দু'শয়ে। স্বরাজ পার্টির পত্রিকা 'ফরোয়ার্ডে'র তখন অনন্যসাধারণ প্রভাব ও জনপ্রিয়তা।

আর্থিক দুর্যোগের ভার নেমে এলো 'সারভেন্ট' পত্রিকার ওপর। কিন্তু আদর্শবাদে অবিচল শ্যামসুন্দর স্বরাজ পার্টির মতবাদ গ্রহণ করলেন না, দারিদ্র্য ও সঙ্কট কাঁধে নিয়ে পত্রিকা চালাতে লাগলেন। বিচক্ষণ লেখক স্বর্গত নৃপেন ব্যানার্জি ও আনন্দমোহন ধর তখন বিনাবেতনে 'সারভেন্টে' কাজ করতেন।

শ্যামসুন্দরের পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রেমে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রীত ছিলেন, 'সারভেন্টে'র দুর্দিনে তিনি আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এলেন। রয়টারের ভূতপূর্ব ম্যানেজার টাইসন সাহেব ছিলেন দ্বারভাঙ্গার কলকাতাস্থিত এজেন্ট, মহারাজার পক্ষ থেকে তিনি 'সারভেন্টের' পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত হলেন। এই সন্ধিক্ষণে একশ' পঁচিশ টাকা বেতনে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে আমি এলাম 'সারভেন্ট' পত্রিকায়।

আমার নিয়োগে 'সারভেন্টে'র পুরনো কর্মীরা খুশী হতে পারেননি। যেদিন প্রথম গেলাম অফিসে, গিয়ে দেখি একটিও চেয়ার নেই সেখানে। দাঁড়িয়ে রইলাম। পুরোনো কর্মীরা কেউ এগিয়ে এলেন না, বসবার

একটু ব্যবস্থা করে দেবার মতো সৌজন্য দেখালেন না। আমি একটু বিস্মিত হয়ে তাঁদের নির্বাক অভদ্রতা পরিপাক করতে লাগলাম।

এমনভাবে বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর সহযোগী সম্পাদকের টেবিল থেকে রমেশচন্দ্র রায় উঠে এসে বল্লেন, 'ইনি তোমাদের প্রিসাইডিং অফিসার হয়ে এসেছেন, এঁকে বসবার ভালো জায়গা দাও। আর এঁর পরামর্শ মতো কাজকর্ম কর।' রমেশবাবু এখন অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদক।

এইভাবে বসবার জায়গা পেলাম।

সাংবাদিকতা শুধু আমার জীবিকা নয়, আমার জীবনের মতো। তাই সংবাকিতার অক্লান্ত পরিশ্রমে কখনো বিরক্তি বোধ করতাম না। সকালে যেতাম অফিসে, দুপুর বারোটা পর্যন্ত ছিল একটানা কাজের রথ। খাওয়া দাওয়ার জন্য আসতাম বাড়িতে ঘণ্টাখানেকের জন্য। আবার রাত্রি দশটা পর্যন্ত অফিসের অফুরন্ত কর্মচক্র।

শ্যামসুন্দরবাবুর ভাই গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন পত্রিকার ম্যানেজার। নিরীহ ভালোমানুষ ছিলেন তিনি, সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু ম্যানেজারী কর্ম তাঁর স্বভাবে মিলতো না, তাই নানা গোলযোগ ছিল তাঁর বিভাগে। বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বের মধ্যে মগ্ন থেকেও এই সময় আমি ম্যানেজারের কাজ-কর্ম দেখতে আরম্ভ করি। চন্দ্রভূষণ নাগ ছিল ম্যানেজারের টাইপিস্ট, মুখে মুখে চিঠি বলে যেতাম আমি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করতেন। নানান চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে অফিসের গোলমাল কিছুটা মিটিয়ে ফেল্লাম।

একটা অসাধ্যসাধন করার জন্যে তখন আমার দুর্জয় তপস্যা। 'সারভেণ্টে'র পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। নানাভাবে চেষ্টা আরম্ভ করলাম। সংবাদপত্র হিসেবে পত্রিকার বহু ত্রুটি ছিল, সকল প্রকার খবর ও জনসাধারণের বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিভাগ 'সারভেণ্টে' ছিল না। গান্ধীবাদীদের খবর ও গান্ধীজীর প্রবন্ধই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করতো পত্রিকায়।

পুরোপুরি সংবাদপত্র হিসাবে 'সারভেন্ট'কে পুনর্গঠিত করতে না পারলে দুর্গতির যবনিকা ঘটবে না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই সমস্ত প্রকার সংবাদ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হলাম, জনসাধারণের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য খবরাদিও পরিবেশন করতে লাগলাম।

'সারভেণ্টে'র প্রকাশক উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আমার সমস্ত কাজেই তাঁর শুভকামনা ছিল, প্রীতি ছিল। একদিন বল্লেন তিনি, 'আমার জীবনে আপনার মতো সংবাদ-পত্রের সকল বিভাগে পারদর্শী লোক আর দেখিনি।'

কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্যে, এই প্রশংসা আমার কাছে পুরস্কারের মতো মনে হয়েছিল।

এমন সময় একটা নতুন ঘটনা ঘটে আমার সাংবাদিকতার জীবনে।

দেশে তখন একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়ন। কলকাতা শহরে ১৪৪ ধারা প্রবর্তিত, কিন্তু সুভাষচন্দ্র নানা সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করে এই ধারা ভঙ্গ করতে থাকেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা তখন ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এই আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার 'ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট' পাশ করে নিলেন। এই বিধানবলে সরকার যে-কোন লোককে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখতে পারবে।

যেদিন আইন পাশ করা হয়, সে সময় শ্যামসুন্দর কোকোনাদ কংগ্রেসে স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করে গেছেন। ডি'ফ্যাক্টো সম্পাদক আনন্দময় ধর শয্যাশায়ী। এমন একটা গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে মুখর করে তুলতে কে লিখবেন সম্পাদকীয়?

টাইসন সাহেবকে ফোন করলাম যেন তিনি অনতিবিলম্বে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তিনি জানালেন, তাঁর এখন অবকাশ কম, আমিই যেন লিখি সম্পাদকীয়।

এমন গুরুতর ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় লিখবো আমি? উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করলাম। লিখলাম এক প্রবন্ধ, 'Fresh Fetters'। প্রেসে চলে গেলে কপি। সন্ধ্যায় এলেন টাইসন সাহেব, প্রবন্ধের প্রুফ পড়লেন। তিনবার পড়লেন প্রবন্ধটা। তারপর হেসে বল্লেন, 'Splendid! It's O. K. go ahead!' প্রবন্ধটা ছাপা হলো পরদিন প্রধান সম্পাদকীয় হিসাবে।

উপেনবাবু শ্যামবাবুর প্রিয়শিষ্য। শ্যামবাবু ফিরে এলে উপেনবাবু তাঁকে গিয়ে বল্লেন, 'আপনার ভয় ছিল সাহেবী কাগজে কাজ করে বিধুবাবু সাহেব হয়ে গেছেন কিনা। পড়ে দেখুন Fresh Fetters!'

আমাকে ডেকে পাঠালেন শ্যামসুন্দর। ভয়ে ভয়ে গেলাম, কি জানি কেমন লাগবে, কী বলবেন প্রবন্ধ পড়ে। কিন্তু তাঁর মুখেও টাইসন সাহেবের মতো হাসি। বল্লেন, 'করেছেন কি? জানেন এই প্রবন্ধের জন্য জেল হতে পারে।'

বুঝলাম খুশী হয়েছেন তিনি।

কিন্তু একদিন সঙ্ঘর্ষও বাধলো।

'সারভেণ্টে'র বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী এজেণ্টরা অভিযোগ করতেন, পত্রিকায় স্বরাজ পার্টির নিন্দা করলে বিজ্ঞাপন জোগাড় করা দুর্ঘট। কিন্তু বিজ্ঞাপন না হলে চলবে কিভাবে? লোকসানের ফাঁপা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে এত বড় প্রতিষ্ঠান?

কে বলবে এ সম্পর্কে শ্যামসুন্দরকে। কার এতো সাহস?

সন্ধ্যায় শ্যামসুন্দরের কাছে তাঁর বন্ধুরা আসতেন। নানা গল্পগুজব ও আলোচনা চলতো। তাঁদের আমি বল্লাম কথাটা শ্যামসুন্দরের কাছে উত্থাপন করার জন্য।

কে কথাটা তুলেছিলেন জানি না। কিন্তু শুনতে পেলাম শ্যামসুন্দরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তিনি চীৎকার করে বলছেন, 'তারা সি আর দাশের চর হিসেবে পত্রিকায় ঢুকেছেন।'

কাকে এই কথা বলা হলো বুঝতে পারলাম। বেদনা ও অপমানে দগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো হৃদয়।

প্রথমে নিউজ ডিপার্টমেণ্ট শ্যামবাবুর ঘর থেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। কিন্তু তবু বারবার মনে হতে লাগলো এরকম সন্দেহ যদি বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাহলে এখানে কাজ করা আমার পক্ষে উচিত নয়।

অনেক ভাবলাম। বারবার বেকার হয়েছি। আবার নতুন করে সেই অন্ধকারের পথ বেছে নিলাম। অসম্মান থেকে দারিদ্র্যবরণ করাই শ্রেয়।

অনেক ভেবে শ্যামসুন্দরকে বল্লাম, যদি তাঁর সন্দেহ হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে বিদায় করে দেওয়া হোক।

উপেনবাবু ও অন্যান্য সহকর্মীরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। শ্যামসুন্দর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন।

রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি তখন অনেকখানি পর্বন্ত পথ আমার সঙ্গে এলেন শ্যামসুন্দর। আমার পিঠে হাত দিয়ে খুব দরদের সঙ্গে কথা বল্লেন তিনি।

তখন রাত্রির অন্ধকার নেমেছে সারা শহরের বুকে। তিনি বল্লেন, 'কিছু মনে করবেন না বিধুবাবু। আপনার মত লোক আমি পাইনি আগে। যাঁরা আপনার নামে কটূক্তি করেন, বুঝেছি তাঁরা আমার প্রকৃত হিতৈষী নন।'

এই সময়ে হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। অজীর্ণ রোগে অসুস্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গিয়েছিলেন হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে দার্জিলিঙ। এসোসিয়েটেড প্রেসের দু'লাইন খবর এলো, তিনি দেহরক্ষা করেছেন সেখানে।

॥ ১০ ॥

এসোসিয়েটেড প্রেস মাত্র দু'লাইনের খবর পাঠালো। সি আর দাশ দেহরক্ষা করেছেন।

কিন্তু জাতির কাছে তো তিনি শুধু সি আর দাশ নন, তিনি সর্বত্যাগী জননেতা দেশবন্ধু। তাঁর মহাপ্রয়াণ দেশের বুকে চরম শোকের আঘাত নিয়ে এলো।

তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দরকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ জানানো হলো। অনতিবিলম্বে তিনি চলে এলেন অফিসে। স্বরাজ পার্টির বিরুদ্ধবাদী বলেই লোকের কাছে তাঁর পরিচয়, পরম উৎসাহে গান্ধীবাদের পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই করেছেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু অফিসে যখন এলেন তিনি, দেখলাম নতুন দৃশ্য। বালকের মতো কাঁদছেন তিনি, তাঁর একমাত্র বিলাপ 'চিত্ত চলে গেল!' যাকে সামনে পান বুকে জড়িয়ে ধরেন, উন্মাদের মতো চীৎকার করতে থাকেন, 'ওরে এমন হঠাৎ চিত্ত চলে গেল!' অশ্রুসিক্ত শোকার্ত তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম, বিরুদ্ধতার আড়ালে কতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন তিনি দেশবন্ধুকে। বহু জননেতা ও স্বরাজ পার্টির কর্মী তাঁর কাছে ছুটে এলেন সান্ত্বনা পাবার আশায়, কিন্তু কে দেবে সান্ত্বনা? যাঁর কাছে আসা, তিনিই তো বেদনায় মথিত, তিনিই তো সান্ত্বনার কাঙাল।

আমাদের অফিসে সকলেই শোকে মুহ্যমান। কিন্তু সাংবাদিকের তো কাঁদবার সময় নেই, সারাদেশের কান্নাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। আমি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, রিপোর্টারদের ডেকে তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য বল্লাম। দেশবন্ধুর শ্যালক এস এন হালদার দুই জামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি

চিঠি ও টেলিগ্রামের কপি নিয়ে আসতে হবে, শরৎ বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যে খবর পেয়েছেন তা সংগ্রহ করতে হবে। রিপোর্টারদের বুঝিয়ে বল্লাম সব, তাঁরা দৌড়লেন।

জি ন্যাটশন প্রকাশিত দেশবন্ধুর জীবনীগ্রন্থটি কিনে আনতে পাঠালাম। তার থেকে বৃহৎ জীবন পরিচয় লেখা হলো, রিপোর্টারদের আনা কপি থেকে 'দার্জিলিঙে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত' দেশবন্ধুর শেষ কয়দিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল সংবাদ রচনা করা হলো। ঘুরে ঘুরে আনা হলো জননেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

খুব দ্রুত কাজ চললো। আমরা কি করছি বাইরের লোক তা জানতেই পারলো না। রাত দু'টো পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশবন্ধুর স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা করলাম।

সবই হলো, কিন্তু সম্পাদকীয়? গভীর রাত্রিতে শ্যামসুন্দরের কাছে গেলাম আমি। তখন শোকার্ত মানুষের ভিড় নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। শ্যামসুন্দরকে বল্লাম সম্পাদকীয় লেখার জন্য।

কথাটা শুনেই তিনি শিশুর মতো আমাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন 'আমি পারবো না বিধুবাবু। চিত্তরঞ্জন চলে গেল, আমি কিছু ভাবতে পারছি না; আমাকে ছেড়ে দিন।'

আস্তে আস্তে তাঁকে শান্ত করতে লাগলাম। নানা কথার ভেতর দিয়ে জাতির কাছে প্রেরণার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম। বল্লাম, 'আপনি ডিক্টেশন দিন, আমি কলম ধরবো।'

অনেক সাধ্যসাধনায় তিনি রাজী হলেন। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'লিখুন।'

কাগজের উপর আমার কলম চলতে লাগলো। তিনি চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছেন। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা। আমি লিখে চলেছি,

'Bengal, if you have tears, prepare to shed them now!'

শ্যামসুন্দর কেবল সুপণ্ডিত নন, সুকবিও বটে।

পরের দিন আশাতীত ঘটনা। ত্রিশ হাজার কপি 'সারভেন্ট' বিক্রি হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপরও ভিড়, তারপরও চাহিদা। 'সারভেন্ট' চাই।

দিতে পারি না। মফঃস্বল থেকে চিঠির তাড়া আসে দয়া করে সেদিনের একখণ্ড কাগজ পাঠান।

সেদিনের সংখ্যার দ্বিতীয় মুদ্রণ করা সমীচীন মনে করলাম না। শ্যামসুন্দরকে বল্লাম, দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধদিনে বইয়ের আকারে 'সারভেন্টের' একটি বিশেষ সংখ্যা বার করার জন্য। তিনি সম্মত হলেন।

দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই বিশেষ সংখ্যার উদ্যোগ চালাতে লাগলাম। পত্রিকায় দেশবন্ধু সম্পর্কিত যা কিছু বেরিয়েছে তা সংগ্রহ করা হলো। বিভিন্ন ব্লক এলো। কিন্তু প্রেসে হেডিং টাইপ নেই।

হেডিং টাইপও পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিভাবে। প্রেসের এক কোণায় একটা পুরনো জরাজীর্ণ বাক্সে পড়ে ছিল, কেউ খুঁজে পায় নি। টাইপপত্র এনে কম্পোজ সাজানো চলতে লাগলো।

সবুজ প্রচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বেরোল 'দেশবন্ধু বিশেষ সংখ্যা'। মনে ভয় ছিল, কেমন বিক্রি হবে, কেমন জনপ্রিয় হবে। কিন্তু আশাতীত বিক্রি হলো এই বিশেষ সংখ্যা। গড়ের মাঠে বিরাট জনতা সেদিন, দলে দলে লোক আসছে সভায়, এমন সময় গিয়ে পৌছল আমাদের পত্রিকা। কাড়াকাড়ি করে লোক কিনতে লাগলো, হকাররা ছুটে এসে আরও চাহিদা জানালো

কিন্তু সব বিক্রি হয়ে গেছে। অফিস কপি ছাড়া একটিও বাড়তি নেই। নিরাশ হয়ে ফিরতে লাগলো আগ্রহী ক্রেতারা। বুঝতে পারি নি এত জনপ্রিয় হবে, ছাপা হয়নি বিপুলসংখ্যায়। ভয়ের এই ত্রুটির জন্য আপসোস করতে লাগলাম মনে মনে।

'সারভেন্টের' মূলধন ছিল সামান্য। আদর্শনিষ্ঠার প্রতি মনোযোগটা প্রখর থাকায় পত্রিকার ব্যবসায়িক দিকটা কখনো স্ফীতিলাভ করতে পারে

নি। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আর্থিক সহায়তা একটা মস্ত সংকট থেকে পত্রিকার পরিত্রাণ ঘটালেও পূর্বেকার সকল ঋণমুক্ত হয়ে সহজ গতিতে চলার সামর্থ্য দিতে পারে নি।

পুনর্বার যখন দ্বারভাঙ্গা মহারাজার কাছে অর্থ প্রার্থনা করা হলো, তিনি সম্মত হলেন না। যে টাকা তখনও তহবিলে ছিল, তা রয়টার ও এ পি'র ঋণমুক্তির বাবদে দেখিয়ে টাইসন সাহেবও পরামর্শদাতার পদত্যাগ করে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।

আবার একটা সংকটের সামনে এসে দাঁড়ালো 'সারভেণ্ট'। রয়টার ও এ পি সংবাদ দেওয়া বন্ধ করলো। অথচ সংবাদ না পেলে সংবাদপত্র চলবে কিভাবে?

এই নিদারুণ দুঃসময়ে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। তবু সাহসে নির্ভর করে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে লাগলাম॥

বাংলাদেশের সর্বত্র আমাদের সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁদের কাছে আমাদের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিলাম। যেখানে সংবাদদাতা ছিলেন না, সেখানের উকিল বা মোক্তারবারের সভাপতি বা সম্পাদকের কাছে আমাদের জন্য সংবাদদাতা নির্বাচন করে দেবার অনুরোধ জানালাম। যতো শীঘ্র সম্ভব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠাবার নির্দেশ প্রেরিত হলো। 'তারের' বিল পাঠালে টাকা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

আশাতিরিক্ত সাড়া এলো। চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পেতে লাগলাম প্রচুর। বাংলাদেশের প্রায় সব সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা হলো।

কিন্তু দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রাদেশিক সংবাদ না পেলে চলবে কিভাবে? ভাগ্যের আশ্চর্য যোগাযোগে সে ব্যবস্থাও হলো।

একদিন অপ্রত্যাশিত একটি চিঠি এলো বোম্বে থেকে। 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামে এক অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠানের লেটারপ্যাডে জনৈক এস সদানন্দ নামের ভদ্রলোক একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠির সঙ্গে সি এফ এণ্ড্রু

সাহেবের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিবরণ। লিখেছেন ফ্রি-প্রেসের স্বীকৃতি নিয়ে সংবাদটি বিনামূল্যে প্রকাশ করলে বাধিত হবেন।

বর্ষার দিনে যেন এক মুঠো রোদ এলো। দৌড়ে গেলাম শ্যামসুন্দরের কাছে। চিঠি দেখালাম। সদানন্দকে চেনেন তিনি। তাঁর অনেক খবর রাখেন। শুনলাম।

এস সদানন্দ আগে এসোসিয়েটেড প্রেসে কাজ করতেন। তেজস্বী জাতীয়তাবাদী লোক। সাহেবী প্রতিষ্ঠানের ভারতবিদ্বেষ বরদাস্ত করতে পারেন নি, পদত্যাগ করে চলে আসেন। কিছুদিন গান্ধী আশ্রমে মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন। কংগ্রেসের কাজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। কিন্তু সাংবাদিকতার নেশা কাটাতে পারেন নি কিছুতেই, আবার ফিরে এসেছেন সংবাদপত্র জগতে। 'রেঙ্গুনে মেলে'র সম্পাদনা করেছেন কিছু-কাল, কড়া প্রবন্ধের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছেন। পরে বোম্বের 'এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া'র, সম্পাদনা করেছেন। ভারতীয় সংবাদ সরবরাহের একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান সংগঠন করার স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের, কল-কাতায় শরৎবাবু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছেন। নানা কারণে এতদিন কৃতকার্য হতে পরেন নি। কিন্তু অদম্য সাহস আর নিষ্ঠা সদানন্দের। বারবার বিফল হয়েছেন, বারবার নৈরাশ্য এসেছে কর্মপথে, তবু ভেঙে পড়েন নি। অল্পদিনের মধ্যে বোম্বেতে কেলকার, জয়াকর প্রভৃতি নেতাদের ডিরেক্টর করে 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামে জাতীয়তাবাদী সংবাদপ্রতিষ্ঠান রেজেস্ট্রি করেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি তাঁকে প্রথম কোন সহায়তা করতে স্বীকৃত হয় নি।

সদানন্দের সংবাদ শুনে সুখী হলাম। এমন লোক যে জীবনে সার্থক হবেন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে জবাব দিলাম শ্যামসুন্দরের নামে। অনুরোধ জানালাম প্রত্যহ সংবাদ চাই, স্বীকৃতি অবশ্যই আমরা দেবো। প্রাদেশিক

রাজধানীগুলি থেকে সংবাদ পাঠাবার জন্য তাঁর নির্বাচিত সংবাদদাতার নামে বেয়ারিং প্রেস টেলিগ্রাম করার ক্ষমতাও দেওয়া হবে।

ত্বরান্বিত জবাব এলো সদানন্দের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সম্পর্কের গুরুত্ব। বিভিন্ন শহরের তাঁর নিজস্বসংবাদদাতাদের নাম ও ঠিকানা পাঠালেন। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কাছে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে বেয়ারিং টেলিগ্রামের ব্যবস্থা হলো।

'সারভেন্ট' আবার বেঁচে উঠবার সুযোগ পেলো, 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া'ও পেলো মহৎজন্মের অধিকার। কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, পাটনা, লাহোর থেকে চমকপ্রদ খবর আসতে লাগলো, কংগ্রেস ও এসেম্বলীর নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ভালো হেডিং ও সম্পাদনা করে ফ্রি প্রেসের নামে তা প্রকাশ করতে লাগলাম বড় বড় করে। সাংবাদিক মহলে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল আমাদের অসমসাহসী কাজে। দেশে পড়ে গেল একটা চাঞ্চল্যময় সাড়া।

॥ ১১ ॥

'সারভেন্টে' ফ্রি প্রেসের খবর একটা চাঞ্চল্য তুললো সাংবাদিক মহলে। সবাই জানতে চায়, কারা এই ফ্রি প্রেস। আনন্দবাজার, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, বসুমতী থেকে জিজ্ঞাসা আসে। রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেস, বিলেতী বণিক ও শাসনের রক্ষাবাহী ব্রিটিশ পরিচালিত। তাঁদের পরিবেশিত সংবাদে ভারতীয় আকাঙ্ক্ষা বিকৃত, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কদর্যকীর্তিত। তবু তাঁদের কাছে যেতে হতো সংবাদপত্রের, সংবাদের তারাই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান।

ফ্রি প্রেসের আবির্ভাব তাই কলকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র মহলে আশার সঞ্চার করেছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপ্রতিষ্ঠানের মূল্য বুঝেছিলেন।

শুরুতেই এতটা সাফল্য আশাতীত। সদানন্দকে চিঠি লিখে দিলাম, তাড়াতাড়ি কলকাতা আসতে। তখন কানপুরে কংগ্রেস অধিবেশন বসতে দিন দুই বাকি। প্রথমে কানপুরে গেলেন সদানন্দ, সেখানে চমৎকার কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগলেন। আমারাও সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করতে লাগলাম। এই সংবাদের কাছে এসোসিয়েটেড প্রেস ম্লান হয়ে গেল। আরো গুরুত্ব বেড়ে গেল ফ্রি প্রেসের।

কানপুরে সদানন্দের সঙ্গে দেখা হলো শ্যামসুন্দরবাবুর। দু'জনে মিলে কংগ্রেসনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন ফ্রি প্রেস সম্পর্কে। সকলেই তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন, উৎসাহ দিলেন। নতুন প্রেরণা নিয়ে সদানন্দ এলেন কলকাতায়।

কলকাতা পৌঁছেই সদানন্দ গেলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সর্বময়

কর্তা সুরেশবাবু ও মাখনবাবুর কাছে। কলকাতায় ফ্রি প্রেসের একটি অফিস খোলার প্রস্তাব হলো। 'বসুমতী' পত্রিকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলীর' তৎকালীন সম্পাদক আই বি সেন ও 'বিশ্বামিত্রের' মূলচাঁদ আগরওয়ালা এই প্রস্তাব সমর্থন করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

'সারভেণ্ট' পত্রিকার একটা ছোট ঘরে ফ্রি প্রেসের অফিস বসবে, এই স্থির হলো। কিন্তু অফিসের দায়িত্ব নেবেন কে? কে হবেন কলকাতা সম্পাদক।

আমার প্রতি সাগ্রহে তাকালেন সদানন্দ। মাখনবাবুও সমর্থন করলেন। কিন্তু আমি তখনও 'সারভেণ্ট' পত্রিকার বার্তা-সাম্পদক। শ্যামবাবু কি আমাকে ছাড়তে রাজী হবেন?

শ্যামসুন্দরের সম্মতি আদায় করলেন সদানন্দ। আমার সহকর্মী শ্রীপুলিন দত্ত তখন সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁর হাতে ভার দেওয়া যাবে নিশ্চিন্ত হয়ে, আর ফ্রি প্রেস তো 'সারভেণ্টের' কল্যাণের জন্যই এবং 'সারভেণ্টে'র অফিসেই। 'সারভেণ্টে'র সহযোগিতা করতে পারব অনায়াসে। কিন্তু আমি ভাবনায় পড়লাম।

অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাকে পুনর্গঠন করার সাধনা নিয়েছি, এবং যার আশাতীত সাফল্য এসেছে তাকে ছেড়ে যাবো? যদি নতুন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়। যদি ফ্রি প্রেসের সঙ্কল্প সার্থক হতে না পারে? আবার যাবো অনিশ্চিতের পথে।

সদানন্দের কাছে একদিনের সময় চেয়ে নিলাম।

সারারাত্রি ঘুম হলো না।

খালি ভাবনা, ভাবনা, ভাবনা। নিরুপদ্রব আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াবো?

যে সাহসে বুক বেঁধে এতদিন পথ চলেছি, সেই সাহস সঞ্চয় করেই আবার নতুন পথে যাত্রা করা ঠিক করলাম। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যদি সার্থক করতে পারি, তাহলে তো

সাংবাদিকতার জীবনে পরম সার্থকতা অর্জন করতে পারবো। দ্বিধা মন থেকে মুছে রাজী হলাম সদানন্দের প্রস্তাবে।

পরদিন অফিস খুলে বসলাম 'সারভেণ্টের' একটা কুঠরীতে। 'বেঙ্গলী', 'আনন্দবাজার' ও 'বসুমতী' থেকে ফ্রি প্রেসের মাসিক আয় মাত্র তিনশ' টাকা। বোম্বে গিয়ে সদানন্দ হাজার হোক, পাঁচশ' হোক, কিছু টাকা পাঠাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে মাখনবাবু ফ্রি প্রেসের জন্য একটা সাইকেল ও সাইনবোর্ড করিয়ে দিলেন। নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ফ্রি প্রেস আরম্ভ হলো। অফিসের কাজের জন্য মাত্র আমি, 'সারভেণ্টে'র টাইপিস্ট চন্দ্রভূষণ নাগ আর পিয়ন কুলপৎ সিং। আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তবু কাজ আমাদের আটকে রইল না। সংবাদ পরিবেশন এতেই আমরা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আজ যখন ভাবি সেই দিনগুলোর কথা, তখন অবাক লাগে। কি অদ্ভূত পরিশ্রমই না সেদিন করেছি আমরা। সারাদিন শুধু খবর গ্রহণ আর পরিবেশন, সম্পাদনা, সংবাদ পরিবর্তন, পরিবর্জন আর সংশোধন। এক হাতেই করতে হতো ফ্রি প্রেস আর 'সারভেণ্টে'র কাজ।. তবুও ক্লান্তি সেই, শ্রান্তি নেই, আমায় তখন নেশায় পেয়েছে।

সদানন্দ ওদিকে বোম্বেতে এক অফিস খুলে বসলেন। নামমাত্র দক্ষিণা নিয়ে বোম্বের প্রসিদ্ধ কাগজ 'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল'কে খবর দেওয়া শুরু করলেন। 'বোম্বে ক্রনিকল' ইত্যাদি দু-চারটি কাগজকে বিনে পয়সাতেই খবর দেওয়া হলো। ফলে যা হবার তাই হলো। সদানন্দ ছ' মাসের মধ্যেও টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। এমন কি, চিঠিপত্রেরও সব জবাব তখন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতো না। তিনিও তখন নেশায় মত্ত। টাকার চেষ্টায় দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাকে গ্রাহক করা যায়, কোথায় অফিস খোলা যায়, তাঁর তখন কেবল এই চিন্তা।

কলকাতা অফিসের চিন্তা তাঁর তখন আর মনে নেই। তাঁর ধারণা, আমি যখন রয়েছি তখন যত অসুবিধেই হোক কাজ বন্ধ হবে না।

আমি তখন আর্থিক দুরবস্থার চরমে। কোন মাসে অর্ধেক বেতন নেই কোন মাসে বা বিনে বেতনেই কাজ করে যাচ্ছি অক্লান্তভাবে। দারিদ্র্য আমায় একটুও বিচলিত করতে পারলো না। বাধার পর বাধা ব্যর্থ হলো আমাকে বিমুখ করতে, আমি চলেছি ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র মাথায় নিয়ে।

ছ' মাস পর সামান্য কিছু টাকা এলো। সদানন্দ পাঠিয়েছেন। আর্থিক অসুবিধে একটু লাঘব হলো। এদিকে আমাদের ছ' মাসের অধ্যবসায় আর নিষ্ঠাও সাফল্য অর্জন করলো প্রচুর। 'ফ্রি প্রেসে'র খবর সবাই চায়। জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর 'ফ্রি প্রেস' ছাড়া চলাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাটনার 'সার্চলাইট' কাগজ খবর নিতে শুরু করলো—'হিন্দুস্থান টাইমস', 'তেজ', 'অর্জুন'—দিল্লীর প্রায় সবগুলো কাগজই একে একে গ্রাহক হলো।

সদানন্দ দিল্লীতে খুললেন একটা অফিস। তিনি নিজেই চালাতেন সে অফিস। আইনসভার এমন সব খবর তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন যে সারা দেশের পত্রিকাগুলো তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেমন চমকপ্রদ সব খবর আর কি সুন্দর তা পরিবেশনের কায়দা।

লাহোর থেকে 'ট্রিবিউনের' বিখ্যাত সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়, উর্দু জাতীয়তাবাদী কাগজ দুটো 'প্রতাপ' আর 'মিলাপ' জানালেন, তাঁরাও 'ফ্রি প্রেস' থেকে খবর নেবেন।

লাহোরে তখন একটা অফিস খোলা দরকার হয়ে পড়লো। সদানন্দ ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে কলকাতা এসে টাকার জন্য ঘুরেছেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি তখনকার বাংলা দেশের বড়লোকদের খুব কমই বাকী ছিল, যাদের কাছে হাত পাতেননি। কিন্তু টাকা দেবে কে? 'ফ্রি প্রেসের' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান; মারা যাওয়ার ভয়ে খুব কম লোকই টাকা দিল। সদানন্দ তবুও ঘুরছেন।

কিন্তু বিফল হতে হলো, কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। এই সামান্য টাকা নিয়েই তাঁকে ঘরে বসতে হলো।

কিন্তু লাহোরের কি করা যায়! সব দিক থেকেই সেখানে একটা অফিস খোলা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। শেষে অনেক চেষ্টা করে 'সারভেণ্ট' থেকে শ্রীপুলিন দত্তকে লাহোরে পাঠানো হলো। 'সারভেণ্ট' তখন খুব ভাল চলছে। তাই আমারই মত অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে পুলিন প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন।

পুলিন দত্ত লাহোরে অফিস খুলে কিছু দিনের মধ্যেই স্বীয় নিষ্ঠা আর একাগ্রতায় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী মানুষ। প্রথম প্রথম অপরিচিত পরিবেষ্টনীতে একটু অসুবিধায় অবশ্যই পড়তে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু কালীবাবুর সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই সব কাটিয়ে উঠলেন তিনি। লাহোরে তখন আমাদের কাজ পুরোদমে চলছে, পুলিনের চেষ্টা আর কালীবাবুর আন্তরিক সহায়তায়।

এদিকে দেশের একটা নতুন সমস্যা আমাদের আরো সুযোগ এনে দিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন স্বাধীনতার লড়াই চলছে। এ-লড়াই-এ ব্যবসায়ী সমাজও যোগ দিলেন। ইংরেজ বণিকদের সুবিধার্থে দিনের পর দিন নতুন নতুন আইন-কানুন তৈরি হচ্ছে আর দেশীয় ব্যবসায়ী সমাজের উপর দিনের পর দিন চাপানো হচ্ছে নানান শুল্ক কর। তা এঁরা সইবেন কেন? এরাও লড়াই জুড়ে দিলেন। বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে 'চেম্বার্স অব কমার্স' গঠিত হলো। চেম্বার্স অব কমার্সগুলো দেশীয় বাণিজ্য-বিরোধী আইনকানুনের ঝড় তুললেন। কর্তারা এবার প্রমাদ গুনলেন। দেশী-বিদেশী বণিকের সম্মিলিত শোষণযন্ত্র ভারতের বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা ছিলেন নিশ্চিন্ত। কিন্তু এমনিভাবে দেশীয় অংশটা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, তা তাঁরা ভাবতে পারেননি। যে করে হোক এদের শান্ত করতে হয়। এলো 'মণ্টেগু চেমসফোর্ড' সংস্কার। দেশীয় বণিকেরা আইন পরিষদে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার

পেলেন। প্রদেশে প্রদেশে ত বটেই, কেন্দ্রীয় সভাতেও তাঁদের আসন জুটল।

আইন পরিষদের ভেতরে তখন স্বরাজ্য পার্টি। প্রতিটি ব্যাপারে এঁরা আইন সভায় সরকারকে বিব্রত করে তুলেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় পণ্ডিত মতিলাল, প্যাটেল, তুলসী গোস্বামী, বি দাস, সত্যেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি জননেতারা সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছেন। এমনি সময়ে এসে পাশে দাঁড়ালেন দেশীয় বণিক সভার প্রতিনিধিরা, স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, জি ডি বিড়লা, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, আম্বালাল সারাভাই প্রভৃতি। সম্মিলিত শক্তিতে কেন্দ্রীয় সভায় তখন সরকারী অবস্থা শোচনীয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস আইন সভার খবরাখবর দিত কম। দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরাখবর ত দিতই না। ফলে আমাদের একটা সুযোগ জুটল।

সদানন্দ চলে গেলেন দিল্লী, সেখান থেকে তিনি মাসের পর মাস কেন্দ্রীয় সভার খবর ফ্রি প্রেসে পাঠাতে লাগলেন। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অভাব-অভিযোগ ফ্রি প্রেসে প্রাধান্য পেল। আমাদের প্রেসের মারফত বাণিজ্যপতিদের বক্তৃতা বড় বড় করে পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। শিল্পপতিরা তো আমাদের প্রতি মহা খুশী। তাঁরা ফ্রি প্রেসের ওপর এত সন্তুষ্ট হ'লেন যে, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ফ্রি প্রেসের ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে রাজী হলেন। জি ডি বিড়লা প্রভৃতি অনেকেই হলেন ডিরেক্টর।

টাকার অভাব আর রইল না। দেশীয় শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ফ্রি প্রেসের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হলো।

আমাদের কলকাতা অফিস 'সারভেণ্ট' অফিস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ৮ নং ডালহৌসী স্কোয়ারে। 'সারভেণ্ট' অফিস ছিল তখন বৌবাজারে। বোম্বেতে বড় অফিস করা হলো। মাদ্রাজ, লাহোর,

দিল্লীর অফিসও পরিবর্ধিত রূপ ধারণ করলো। কাজ খুব জোর চলতে লাগল দেশময়।

এই সময়ে আর একটা ব্যবস্থা হলো 'বিড়লা ব্রাদার্স'এর সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানের পাটের বাজারের খররাখরর 'তারে' আনিয়ে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা। খুলনা, ময়মনসিং, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, ভৈরব-বাজার প্রভৃতি জায়গা থেকে খবর আনব আমরা। আর একটা মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে বিড়লা ব্রাদার্স সে খবর কিনে নেবেন প্রতিদিন।

কিন্তু সমস্যা হলো সঠিক সংবাদ কি করে সংগ্রহ করা যায়? ব্যবসার লাভ-লোকসান এই পরিবেশিত খবরের যথার্থতার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং উপযুক্ত লোক প্রয়োজন।

আমার ছোট ভাই শশীভূষণকেই শেষ পর্যন্ত পাঠানো স্থির হলো। তাঁর স্বাস্থ্যের অনুপাতে কর্মদক্ষতা ছিল অনেক বেশী। ছাত্র হিসেবে কৃতী ছিলেন, ব্যক্তি হিসেবেও ছিলেন কীর্তিমান পুরুষ। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই পূর্ব বাংলার নানা জায়গা ঘুরে ফ্রি প্রেসের কাজ করে বেড়ালেন। তাঁর চেষ্টায় আমরা এই কাজেও সাফল্য অর্জন করলাম।

কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁকে ফিরে আসতে হয়। গ্রামে চলে গেলেন। সেখানেও যথেষ্ট কাজ করেছেন, অবশ্য ফ্রি প্রেসের জন্য নয়—গ্রামের জন্য, দেশের জন্য।

পরবর্তীকালে আমাকে ডেকে আনতে হয়েছে তাঁকে তাঁর কর্মকেন্দ্র থেকে। 'ইউনাইটেড প্রেস' স্থাপন করার পর তাঁকে মাদ্রাজে পাঠাতে হয়েছিল সেখানকার অফিসের সম্পাদক করে।

সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অকালমৃত্যুতে 'ইউনাইটেড প্রেস' একজন নিরলস একনিষ্ঠ কর্মী হারিয়েছেন।

মাদ্রাজের কাজে তাঁর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ উত্তরকালে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সাফল্যের মূলে অনেকখানি কাজ করেছে।

কর্মী ছাড়াও শশীভূষণ ছিলেন বন্ধুবৎসল। তাঁর এমনি একটা

আত্মীয়তাময় মনোবৃত্তি ছিল যার হাত থেকে খুব কম লোকই স্নেহাই পেয়েছে। একবার তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এমনই মধুর ছিল তাঁর প্রকৃতি। বাংলা দেশের যে নেতাই যখন মাদ্রাজে গিয়েছেন অন্তত কিছু সময় হলেও তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে আসতে হয়েছে। তাঁর অকাল-মৃত্যুতে রাজাজী তাঁর স্ত্রীর কাছে টেলিগ্রামে বলেছিলেন যে, তিনি একজন "Friend, philosopher, guide" হারিয়েছেন। এখনও রাজাজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি সাগ্রহে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর মেয়েদের খবর নিয়ে থাকেন।

'ফ্রি প্রেস' তখন দিনের পর দিন প্রতিষ্ঠার পথে। দেশের আপামর জনসারণ 'ফ্রি প্রেসের' প্রশংসায় মুখর।

জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে 'ফ্রি প্রেস' নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে—কোনরকমের বাধা বিপত্তিই দমাতে পারেনি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলন ছাড়াও ফি প্রেস দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যে সাহসিকতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে তা উপেক্ষণীয় নয়। 'সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন' কোম্পানীর স্বাধিকার লড়াইএ ফ্রি প্রেস এ সময়েই এর সহযোগিতা করে।

স্বদেশী যুগে এই কোম্পানী ভারতে জাহাজ চালাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তখন জলপথে বাণিজ্যের একমাত্র অধিকার ছিল বিদেশী কোম্পানীগুলোর। সিন্ধিয়ার এই প্রচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হলো সরকারী তরফ থেকে। তা নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে শুরু হলো আন্দোলন। এস এন হাজী একটা বিল আনলেন। প্রবল উত্তেজনার ভেতর দিয়ে এই বিলের আলোচনা চলল। যদিও শেষ পর্যন্ত বিল পাশ করানো সম্ভব হলো না তবুও এই আন্দোলনের ফল হলো যথেষ্ট। দেশীয় স্টিমার কোম্পানী-গুলো বেশ কিছু অধিবার লাভ করলো।

ফ্রি প্রেস বহু ক্ষতি স্বীকার করে এতে যেভাবে সমর্থন জুগিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য।

তারপর লবণ আন্দোলন। স্বরাজ্য পার্টিকে আইন সভায় ঢুকতে গান্ধীজী অনুমতি দিলেন; উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন তখন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী তখন গঠনমূলক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন; এমনি সময়ে এলো 'সাইমন কমিশন'। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে আর একবার নতুন করে ধামা চাপা দেওয়া। বলা হলো, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য কিনা এটা তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে চান।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দেশময় সংকল্প, সাইমন কমিশন বয়কট করতে হবে। কংগ্রেসের আহ্বান ছড়িয়ে পড়লো শহরে গ্রামে সর্বত্র, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'সাইমন ফিরে যাও!'

সদানন্দ নিজে শর্টহ্যাণ্ড জানতেন না কিন্তু ছিলেন দক্ষ সাংবাদিক। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি সাইমনের সঙ্গে। বিচিত্র কৌশলে সংবাদ পাঠাতে লাগলেন তিনি, মনোরম ভঙ্গীতে, প্রাঞ্জল আঙ্গিকে। সে সব সংবাদের মধ্যে দিয়ে সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা ও কমিশনের প্রতি সারা দেশের উত্তেজিত বিতৃষ্ণা ফুটে বেরোল।

ব্রিটিশ সরকার ক্রোধে অগ্নিশর্মা। আদেশ হলো, সদানন্দের রিপোর্ট প্রেসে যাওয়ার আগে সেন্সর করিয়ে নিতে হবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভেঙ্গে দুমড়ে গেল। গর্জন করে উঠলেন সদানন্দ। খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে আদেশের প্রতিবাদ জানালেন। তাঁকে সমর্থন করলেন সারা দেশের জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকবৃন্দ।

ফ্রি প্রেস সাইমন কমিশনের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে ব্রিটিশ সরকারের কাঁটার মালা পরে আরো গৌরবান্বিত হয়ে ওঠলো।

দেশের উত্তেজনা চরমে পৌছলো দু'দিন পরেই। পণ্ডিত জওহরলাল

ও লালা লাজপৎ রায় সাইমনবিরোধী শোভাযাত্রা পরিচালনা করায় সময় পুলিসের আঘাতে আহত হলেন। সারা ভারতবর্ষের পিঠে ঘা পড়লো। উত্তাল জনতা উদ্বেলবেগে আছড়ে পড়লো সুকঠিন পুলিস বেষ্টনীর ওপর।

॥ ১২ ॥

ফ্রি প্রেস এগিয়ে চলেছে সমৃদ্ধির পথে। মনে হলো সার্থকতার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে আমাদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের প্রধানতম জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

সে সময় তদনীন্তন অর্থসচিব স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল আনেন। এই বিল সম্পর্কে ভারতীয় সভ্যরা আগ্রহান্বিত হননি, প্রস্তাব আনয়নে আপত্তিও করলেন না। বিলটির বিশদ পরীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠিত হলো, স্থির হলো প্রাদেশিক শহরগুলি পরিভ্রমণ করে কমিটি সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করবেন।

সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনগুলির সংবাদ এই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। রুদ্ধ ঘরে অধিবেশন বসতো গোপনে, সাংবাদিকদের তাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। সরকারী প্রেসনোটের সংক্ষিপ্ত সংবাদই ছিল সংবাদপত্রগুলির সম্বল।

সদানন্দ ঠিক করলেন, তিনি স্বয়ং রিপোর্ট লিখবেন। যে কোনভাবেই হোক সরকারী গোপনীয়তার মুখোশ টেনে খুলে ধরবেন। এই বিলের জাতীয়তাবিরোধী চরিত্র পুরোপুরি প্রকাশ করে দেবেন।

কমিটির অধিবেশন বসেছে কলকাতায়। কয়দিন তিনি কমিটিসভ্যদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে গোপন সংবাদের তথ্য জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেউ মুখ খোলেন না। মনে হলো, বুঝি সব ব্যর্থ হবে।

কিন্তু অদম্য উৎসাহ সদানন্দের। একদিন মধ্যাহ্নে ভোজনের জন্য সিলেক্ট কমিটির সভা স্থগিত থাকার সময় এক মাদ্রাজী সভ্যকে সঙ্গে নিয়ে

এলেন অফিসে। কফি এল, জলযোগের বিস্তর ব্যবস্থা হলো। গল্পগুজব চলতে লাগলো। তারি ফাঁকে মুদ্রিত এজেণ্ডা নিয়ে রাজনৈতিক কথাবার্তা হলো।

আলাপের ভাষা তেলেগু। আমাদের বোধগম্য নয়। দেখলাম, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এজেণ্ডার মধ্যে কী সব নোট নিচ্ছেন সদানন্দ।

একটু পরে অবাক কাণ্ড। সদানন্দ টাইপরাইটারের সামনে গিয়ে বসলেন। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে সদানন্দের মুখ। কী যেন বোঝাচ্ছেন তিনি সদস্য মহোদয়কে, কিসের যেন প্রেরণা দিচ্ছেন।

টাইপরাইটার চলতে লাগলো। কয়েক পাতা টাইপ করে গেলেন সদানন্দ।

সন্ধ্যার অধিবেশন শেষ হবার সময় আবার নোট নিয়ে এলেন সদানন্দ। সমস্ত লেখা রিপোর্ট ও কাগজপত্র মিলিয়ে টাইপ করতে বসলেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত চললো কাজ।

বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি হলো। মনে হলো যেন, অদৃশ্য সদানন্দ সর্বক্ষণ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, শর্টহ্যাণ্ডে সমস্ত কিছু লিখে নিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ এই রিপোর্ট পাঠানো হলো সকল সংবাদপত্রে। যাঁরা আমাদের সংবাদ নিতেন তাঁদের তো পাঠানো হলোই, যাঁরা নিতেন না তাঁদের কাছেও পাঠানো হলো জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। কেননা এই বিল ছিল জাতীয় স্বার্থবিরোধী, সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে এর প্রতিবাদ হওয়া কর্তব্য।

পরদিন সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলো। দেশময় উত্তেজনা এই রিপোর্ট পড়ে। সরকারী গোপনীয়তার পর্দা যা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তা প্রকাশ হয়ে পড়লো জনসাধারণের মধ্যে।

রোজ এইভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন সদানন্দ। স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার ও ফরোয়ার্ড আমাদের সংবাদ নিতো না, কিন্তু সন্ধ্যায় তাদের রিপোর্টাররা এসে রিপোর্ট নিয়ে যেতেন রোজ। সাগ্রহে।

ফ্রি প্রেসের বনিয়াদ দৃঢ় হলো। আগে যাঁরা আমাদের সংবাদ নিতে স্বীকৃত হননি, তাঁরা বাধ্য হলেন আমাদের গ্রাহক হতে। এই সময়কার আর একটি 'স্কুপ নিউজ' আমাদের প্রভাব আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

গান্ধীজী রেঙ্গুন যাবেন, যাত্রাপথে একদিনের বিশ্রাম নিতে এলেন কলকাতায়। ব্যবসায়ী জীওনলালের গৃহে অতিথি হয়েছেন।

বিকেলে একটি জনসভার ব্যবস্থা করলেন বি পি সি সি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা হবে কিরণশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে। গান্ধীজী বক্তৃতা করবেন।

কলকাতায় তখন ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। সভা ও শোভা-যাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী। জনসমক্ষে বিলেতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ নিষিদ্ধ।

বিকেল হবার আগেই জনসভায় প্রচুর জনসমাগম হলো। গান্ধীজী বক্তৃতা দিলেন তেজোদৃপ্ত ভাষায়। তিনি বল্লেন, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হলে দৈনন্দিন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিলেতী বস্ত্র ও অন্যান্য বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা জাতীয়তাবিরোধী।

সভার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী বিলেতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করলেন।

সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বহু আগে থেকেই সভাস্থলে হাজির ছিল। তারা এতক্ষণ মৌনদর্শকের মতো স্তব্ধ ছিল, কোন বাধা দেয়নি।

কিন্তু অগ্নিসংযোগের সময় লাঠিচালনা করে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দিল পুলিস। গান্ধীজী অনুরোধ জানালেন, 'অহিংসা আমাদের মূলমন্ত্র, পুলিসের কাজে উত্তেজিত হওয়া অনুচিত।'

সভাপতি কিরণশঙ্কর গ্রেপ্তার হলেন। গান্ধীজীকে পুলিস নির্বিবাদে চলে যেতে দিল।

রাত্রিতে শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঘরোয়া সভা বসলো নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য; প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত।

আমাদের নতুন রিপোর্টার দুর্গামোহন ভট্টাচার্যকে পাঠালাম উডবার্ন

পার্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা ছিল প্রথম থেকেই, এই নিষ্ঠাবলেই এখন তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রাত্রি দশটায় দুর্গামোহন ফোনে জানালেন, পুলিস কমিশনার এসেছেন শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে।

নির্দেশ দিলাম সতর্ক সন্ধানে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে। মনে হলো, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করবে পুলিস, দুর্গামোহনকে তা জানিয়ে বলে দিলাম যেন গান্ধীজীর গৃহে গিয়ে খবর নেন।

রাত্রি বারোটার ফোনে খবর এলো, বিলেতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের অপরাধে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস, জামিন দেওয়া হয়েছে, রেঙ্গুন থেকে ফিরে এলে তাঁর বিচার হবে। দুর্গামোহন আরো জানালেন, কোন রিপোর্টার এখনও এই খবর জানেন না।

তৎক্ষণাৎ চার লাইন 'ফ্ল্যাশ মেসেজ' পাঠিয়ে দিলাম দিল্লী, বোম্বে ও অন্যান্য অফিসগুলিতে। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিকে ফোনে জানালাম এই খবর। পনের মিনিট পরে সংবাদ দিলাম, গান্ধীজীকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

প্রচুর উত্তেজনার মধ্যে কাজ করলাম, রাত্রি দু'টো পর্যন্ত। কেবলই উদ্বেগ, এ খবর কি একমাত্র আমরাই দিতে পেরেছি?

পরদিন সকালে দেখা গেল, ফ্রি প্রেসের সংবাদ যারা নেয় একমাত্র সে সমস্ত সংবাদপত্রেই এই সংবাদ বেরিয়েছে। একটি 'স্কুপ নিউজ' দিতে পেরেছে 'ফ্রি প্রেস'।

সদানন্দ তখন বোম্বেতে। তার সহকারী বীরেন সেন ও যতীন মুখার্জী গান্ধী গ্রেপ্তারের সংবাদ বুলেটিন আকারে মুদ্রিত করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তুমুল উত্তেজনা চারিদিকে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে সারা দেশে বহু সভা অনুষ্ঠিত হলো, নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে নিন্দা জানালেন।

এ পি ও রয়টারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের কলকাতা অফিসের কাছে এই

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করতে না পারার জন্য কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করলেন। যে সমস্ত সংবাদপত্র তখনও আমাদের সংবাদ নিতেন না, আমাদের কাজের গুরুত্ব তাঁরা অনুভব করলেন।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত নাম। আত্মত্যাগে জীবনকে নৈবেদ্য করে তিনি স্বাধীনতার আন্দোলনকে প্রবল বেগবান করেছিলেন। অনেক বাধা অনেক বিপত্তি তাঁর পথে বারংবার এসেছে। কিন্তু কখনো তা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি, পারে নি একমুহূর্তের জন্যও বিচলিত করতে। বহুবার ইংরেজ তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে, কারারুদ্ধ অবস্থায়ই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে।

আমি যখন ফ্রী প্রেসে কাজ করি, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। সাংবাদিকের কর্তব্যপালন করতে গিয়ে বারবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, পরিচয় ঘনিষ্ঠতার খাদে নেমে আসে। সুমিষ্ট তাঁর ব্যবহার, সৌজন্য-স্নিগ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্ব। প্রায়ই তার বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যেতেন, চা ও সিগরেট না খাইয়ে কখনো ছাড়তেন না। তাঁর পচ্ছন্দমত করে খবর প্রচার না করলে তিনি প্রায়ই রেগে যেতেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর রাগ দূর হয়ে যেত, মিষ্ট করে হাসতেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় নিবিড়তর হয় ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে। অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র ছিলেন জি ও সি। শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার ও কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তিনি অধিবেশনটিকে অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মেতে ওঠেন।

তখন তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে থাকতেন। কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান ঠিক করা হয়েছিল পার্কসার্কাসের ময়দান।

কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে আমি ও সহকর্মী পুলিন দত্ত গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ি, তাঁর বক্তৃতার অগ্রিম কপি আনার জন্যে। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। বক্তৃতার কপি

তখনও ছাপা হয়ে আসে নি বলে আমাদের অনেকক্ষণ বসতে হয়েছিল। চা ও সিগারেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তখন আমার একটু সর্দ্দিজ্বর ছিল। একটা কবিরাজী ওষুধ খেয়েছিলাম কংগ্রেস নগরে। আমার খুব মাথা ধরেছিল, বসে থাকা সম্ভব নয় দেখে বাড়ি চলে আসার উদ্যোগ করলাম। তাঁকে আমার অবস্থা জানান হলো। খুব চিন্তিত হলেন তিনি। ট্যাক্সি ডাকিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর বক্তৃতার কপি নিজেই লোক দিয়ে আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা ভুল অষুধ পড়ায় সে রাত্রিতে আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠেছিল। তাড়াতাড়ি প্রতিশেধক অষুধ পড়ায় আমি সেবার রক্ষা পেয়েছিলাম। পরের দিন তিনি নিজে এসে আমার দেহের খবর নিয়েছিলেন।

বহু বৎসর তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সংবাদ ও বাণী প্রচার করেছি। নানা দলাদলিতে দেশ তখন আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ভুল বোঝা-বুঝি হয়েছে। কিন্তু তাঁর মহৎ প্রাণও বৃহৎ দান দেশকে গৌরবান্বিত করেছে এ কথা কখনো ভুলি নি।

আজ জীবন-সায়াহ্নে স্মৃতিকথা লিখতে বসে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তাঁকে, তাঁর কর্মকে। আমাদের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল নাম এই ব্যক্তিত্ব।

॥ ১৩ ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায় ফ্রী প্রেস। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই তার জন্ম, স্বরাজ-সাধনার সংবাদ পরিবেশনায় তার প্রসার। স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রশংসা পেয়েছে ফ্রী প্রেস, কিন্তু আর্থিক দুর্গতি ঘোচে নি। বিভিন্ন দৈনিকপত্র থেকে যে আয় আসতো তা'তে কিছুতেই ব্যয়সঙ্কুলান হতো না। তদুপরি আরো একটা ক্ষোভ ছিল সদানন্দের, যে ভঙ্গীতে ও যে পরিমাণে জাতীয় সংবাদের প্রচার হওয়া প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতো, তেমনভাবে কিছুতেই সংবাদ প্রকাশ ঘটতো না।

ফ্রী প্রেসকে অন্যনিরপেক্ষ সংবাদপ্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার জন্য সদানন্দের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর মনে অসাধারণ সাহস। অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অনেক দৈনিকপত্র অভিযোগ করতো, আপনাদের বিদেশী সংবাদ কই। শুধুমাত্র দেশীয় সংবাদ নিয়ে তো দৈনিকপত্রের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারবেন না।

সদানন্দের পণ সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন। আর্থিক দুর্গতিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে লণ্ডনে ফ্রী প্রেসের অফিস খুলে বসলেন। সহকর্মী কাবাদিকে পাঠানো হলো আন্তর্জাতিক খবর পাঠাবার জন্য। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিদেশী সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা হলো ফ্রী প্রেস থেকে। প্রথম কয়েক মাস বিদেশী বার্তা বিনামূল্যে দেওয়া হলো। অনেক পত্রিকা গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। সকলেই প্রশংসা করলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই।

কিছুকাল পর বিদেশী সংবাদের জন্য বর্ধিত চাঁদা দাবী করা হলো ফ্রী প্রেস থেকে। তখন দৈনিকপত্রগুলির উৎসাহ নিভে গেল। বর্ধিত

মূল্য দিতে কেউ সম্মত হলেন না। তাঁদের কেবল ভয়, যদি ফ্রী প্রেস বিদেশী খবর ঠিকমতো দিতে না পারে তাহ'লে তাঁরা স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, টাইমস অব ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিভাবে? যদি তখন তাঁদের নিত্য হার ঘটে!

সকলেই কাজের প্রশংসা করেন অথচ ভরসা করেন না। ঠিকমত আস্থা রাখতে পারেন না।

চঞ্চল হয়ে ওঠলেন সদানন্দ। সুষ্ঠুভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের সহকর্মী এবং বর্তমানকালের বিখ্যাত সাংবাদিক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসকে লণ্ডন আফিসে পাঠানো হলো। চার্লস বার্নস নামক জনৈক ভারত-হিতৈষী ইংরেজ সাংবাদিক ও তাঁর সাংবাদিক-পত্নী মার্গারিটা বার্নসকে লণ্ডন অফিসের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করা হলো। এর কিছুকাল পরেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য মহাত্মাজী লণ্ডন পৌঁছেন। বৈঠকের রিপোর্ট করবার জন্য স্বয়ং সদানন্দ গেলেন লণ্ডন। বিলেত থেকে চমৎকার রিপোর্ট আসতে লাগলো। সকলেই প্রশংসা করে বল্লেন, রয়টার এমন সংবাদ পাঠাতে পারেনি।

কিন্তু তবু আর্থিক অবস্থা মন্দ থেকে ভালো হলো না। সম্মান অর্জিত হলো, সাংবাদিক মহলে কিছুটা প্রতিপত্তিও পাওয়া গেল, তবু দারিদ্র্যের প্রত্যহ প্রহার কিছুতেই ঘুচলো না।

অসাধারণ সাহস ও কল্পনা-শক্তি ছিল সদানন্দের। কিন্তু অর্থনৈতিক সাফল্য আসে যে বুদ্ধিতে, সদানন্দের তার অভাব ছিল। হয়তো ইতিহাসে এমন চরিত্রই সম্ভব। বৃহৎ কর্ম উদ্‌যাপনের মেজাজ নিয়ে যাঁদের জন্ম, অর্থনৈতিক সাফল্যের প্যাঁচ তাঁরা কষতে পারেন না।

লণ্ডন অফিস খোলার জন্য খরচের অঙ্ক বেড়ে গেল। অথচ আয় বাড়লো না। বিলেত থেকে গোলটেবিলের সংবাদের জন্য কিছু বাড়তি চাঁদা

দাবী করা হয়েছিল সংবাদপত্রগুলি থেকে, সে দাবী পূরণ হয় নি। কেবল-মাত্র পুলিন দত্ত লাহোরের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা থেকে ও কলকাতায় আমি সহযোগী সংবাদপত্র থেকে এই বর্ধিত মূল্য আদায় করতে পেরেছিলাম। অন্যান্য প্রদেশ থেকে এমন কি সদানন্দের কর্মক্ষেত্র বোম্বে থেকেও বর্ধিত মূল্য পাওয়া যায়নি। তখন উত্যক্ত হয়ে সদানন্দ দাবী জানালেন দেশী ও বিদেশী সংবাদের জন্য ইংরেজী-ভাষী পত্রিকাগুলিকে মাসিক বারো শ' টাকা ও দেশীয়-ভাষী পত্রিকাগুলিকে পাঁচ শ' টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এই দাবীও সারা ভারতের সংবাদপত্র জগতে অগ্রাহ্য হলো।

কলকাতার সম্পাদকদের সঙ্গে আমি নানান আলোচনা করে এই বর্ধিত মূল্যের প্রয়োজন তাঁদের বুঝিয়ে বলেছিলাম। তাঁরা রাজী হয়েছিলেন বর্ধিত মূল্য দিতে। লাহোরে পুলিন দত্ত কয়েকটি সংবাদপত্রকে সম্মত করাতে পেরেছিলেন। শুধু মুষ্টিমেয় এই কয়টি দৈনিকপত্র ফ্রী প্রেসের দুর্দিনে ন্যায্যমূল্য দিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে কেবল মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা সংবাদ পরিবেশন করে ফ্রী প্রেসের তখন বিশেষ গুরুত্ব। তাই সদানন্দ আশা করেছিলেন, তাঁর দাবী সকলেই মেনে নেবেন। কলকাতা ও লাহোর ছাড়া অন্যান্য স্থানের কেউ রাজী না হওয়ায় তাঁর মনে আশাভঙ্গের আলোড়ন দেখা দিল।

তিনি স্থির করলেন, বোম্বে থেকে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ চলতে লাগলো, ফ্রী প্রেসের ডিরেক্টরদের সভা আহ্বান করে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। নতুন পত্রিকা বার হবে ফ্রী প্রেসের, একটি অসাধারণ দৈনিকপত্র।

প্রকাশিত হলো পত্রিকা। 'ফ্রী প্রেস জার্নাল'। ফ্রী প্রেসের দেশী ও বিদেশী সংবাদের ওপর ভিত্তি করে অপরাজিত জাতীয়তাবাদী পতাকা তুললেন সদানন্দ।

স্বল্পদিনের মধ্যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করলো জার্নাল। প্রচার সংখ্যায় সকলের ঊর্ধ্বে উঠে গেল অনতিবিলম্বে। বহ্নিময় দেশপ্রেম ছিল পত্রিকার অক্ষরে অক্ষরে, অপরাজেয় প্রাণশিখা দৃষ্টিকোণের ভঙ্গীতে। জনপ্রিয়তার অভিনন্দন যেমন আসতে লাগলো, ব্রিটিশ সরকারের রোষ-দৃষ্টিও তেমনি পুড়িয়ে দিতে চাইলো পত্রিকাকে। সরকার একটা 'স্পেশ্যাল প্রেস আইন' প্রণয়ন করে মোটা টাকার দাবী জানালো কিন্তু নির্ভয় সদানন্দ নিঃশঙ্ক। তাঁর কলমে আগুন, প্রাণে দেশপ্রেমের রক্তশিখা। দু'বার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিল সরকার। তৃতীয়বার জামানত চাওয়া হলো কুড়ি হাজার টাকা। সরকারী 'প্রেস এডভাইসার' নিযুক্ত হলো সংবাদপত্রগুলিকে খবরদারি করার জন্য। নিয়ম করা হলো, এইসব ঝানু সিভিলিয়ান 'প্রেস এডভাইসারদের' না-মঞ্জুর কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না।

'প্রেস এডভাইসার' নিযুক্ত করায় সংবাদপত্র জগতে একটা তীব্র সোরগোল উঠলো। চারদিকে প্রতিবাদের বন্যা। যখন কিছুতেই সরকারকে নরম করা গেল না, তখন একযোগে সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ স্থগিত রাখা হলো। বোম্বেতে সভা বসলো সাংবাদিকদের। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সাংবাদিক প্রতিনিধিমণ্ডলী। উত্তেজনা যখন চরম তখন সরকার পশ্চাদপসরণ করলেন। সাংবাদিকদের দাবী মেনে নেওয়া হলো। পত্রিকা-ধর্মঘট উঠিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু ফ্রী প্রেস থেকে কুড়ি হাজার টাকার জামানত দাবী পরিত্যক্ত হলো না। অসম-সাহসী সদানন্দ জামানতের টাকা সরকারী তহবিলে পেশ করে আবার দুর্বারবেগে অগ্নিক্ষরা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন।

উৎসাহে ও উদ্দীপনায় আবার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেন সদানন্দ। নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন ফ্রী প্রেসের। হয়তো নতুন যুগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে। তিনি স্থির করলেন কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও লাহোর থেকে আরো পাঁচটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করবেন। এইসব

পত্রিকার উদ্বৃত্ত লাভ থেকে ফ্রী প্রেস সংগঠনের ঘাটতি ব্যয়ভার সংগ্রহ করবেন। বোম্বের কোটিপতি বণিক মথুরদাস ভাসানজীর সঙ্গে সদানন্দের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু আমি খুব উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমি মাটির কাছাকাছি মানুষ, অতিরঞ্জিত স্বপ্ন আমাকে মোহবিধুর করতে পারে না। পাঁচটি পত্রিকার জন্য অন্তত কুড়ি লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তারপরেও হয়তো আর্থিক সহায়তা দরকার হতে পারে। নতুবা মাঝখানে বিপদ যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বা কালো মেঘ ভিড় করে আসে আকাশে, তখন কে রক্ষা করবে। কিন্তু আশার ঘোড়ায় ছুটছেন সদানন্দ, সকল বাধা তিনি নিজের জোরে উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন।

আংশিক মূল্য দিয়ে পাঁচটি রোটারি প্রেস কেনা হলো। বিভিন্ন শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে পত্রিকার উদ্যোগপর্ব চলতে লাগলো। ফ্রী প্রেসের শাখায় শাখায় তখন শুধু নতুন পত্রিকার স্বপ্ন। আর ভাবনা আমার মনে। এতো বড়ো দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সদানন্দ, তা কি সার্থক করা সম্ভব হবে? সম্ভব হবে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার ওপর নির্ভর করে এতো বড়ো কর্ম-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা।

বিলেত থেকে মার্গারিটা বার্নসকে বোম্বে ডেকে আনা হলো। লণ্ডন অফিসে তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদের তত্ত্বাবধান ছাড়াও রিপোর্ট ও মন্তব্য লিখতেন। মিসেস বার্নসকে নিয়ে সদানন্দ ভারতের কোটিপতি বণিকদের দরবারে ঘুরতে লাগলেন। আশা ছিল মার্গারিটার সক্রিয় সহযোগিতায় পাঁচটি পত্রিকার মূলধন সংগ্রহ করা যাবে এবং নানানতর প্রতিকূলতার বন্ধন উত্তীর্ণ হওয়া চলবে।

মার্গারিটা বার্নস সুশিক্ষিতা, সুমার্জিতা, সদালাপী। ইংল্যাণ্ডের নানা পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পার্লামেণ্ট সদস্য মেজর গ্রাহাম পেলের একান্ত সচিব হিসেবে তিনি অনেকদিন কাজ করেছিলেন; সাংবাদিক চার্লস বার্নসের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন

ভারত-হিতৈষী, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বর্তমানকালের প্রতি অনুরক্ত মমতা ছিল তাঁদের।

সাংবাদিক হিসাবে মার্গারিটার যোগ্যতা আমাদের মুগ্ধ করতো। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য ধর্ম যে কোন আলোচনায় তিনি যোগ দিতে পারতেন। মধুর ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব; কথা বলার ভঙ্গী ছিল মনোরম, ব্যবহারের মধ্যে ছিল সুমিষ্ট আন্তরিকতা। অল্পায়াসে তিনি লোকচিত্ত জয় করে নিতেন।

সদানন্দের আশা হয়তো সার্থক হতে পারতো। মার্গারিটার চেষ্টায় আরও টাকা সংগ্রহ করা গেল, বাধাও কিছুটা কাটলো। যদি অস্থির অধৈর্য হয়ে না পড়তেন সদানন্দ, তাহলে হয়তো মার্গারিটার প্রত্যহ সোৎসাহ সহযোগিতায় তিনি সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

ফ্রি প্রেসের আর্থিক দুর্গতির ফলে লণ্ডন অফিস তুলে দিতে হলো। চার্লস বার্নস ভারতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মার্গারিটার চেষ্টায় অনতিবিলম্বে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বার্তা-সম্পাদক হিসেবে তিনি চাকরি গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। বহুকাল কাজ করে ডিরেক্টর অব নিউজ সার্ভিসেস পদে উন্নীত হয়ে তিনি অগ্রসর গ্রহণ করেন।

মার্গারিটা 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে একটি মূল্যবান বই রচনা করেছিলেন। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে বইটির বিশেষ সমাদর হয়েছিল। সাংবাদিকতার ছাত্রদের পক্ষে এ বইটির প্রয়োজনীয়তা এখনো ম্লান হয় নি।

চার্লস ছিলেন নিরীহ শান্ত ভালোমানুষ। দিনরাত্রি শুধু কাজ নিয়েই থাকতেন। এই সাংবাদিক-দম্পতিকে আমরা ভালোবেসেছিলাম। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহমর্মিতা ছিল।

কিন্তু তাঁদের দাম্পত্যজীবনে একদা বিরোধের মেঘ দেখা দিল। যে প্রেম লণ্ডনের কুয়াশাঢাকা মাটিতে আস্তে আস্তে তাঁদের মনে গাঢ় হয়ে উঠেছিল, মিলনের মধ্যে যা হয়েছিল মধুর সার্থক, ভারতবর্ষে এসে তাতে

দেখা দিল ভাঙনের স্রোত। তারপর চললো নানা ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস, অপ্রণয়। একদিন আইনগত বিচ্ছেদ তাঁদের পরস্পরকে মুক্ত করে দিল বিবাহ-বন্ধন থেকে। কিছুকাল পরে জনৈকা চীন দেশীয়া সহ-কর্মীকে বিয়ে করেন চার্লস। চার্লস ফিরে যান ইংল্যাণ্ডে, আর মার্গারিটা যান আমেরিকায়।

ভারতের সাংবাদিক জগতে অন্তত কিছু পরিমাণেও দাগ রেখে গেছেন বার্ণস দম্পতি। ভারতের ডাকেই তাঁরা লণ্ডন থেকে এসেছিলেন। কিন্তু খ্যাতি ও পরিচিতির প্রখর তাপে তাঁদের পারস্পরিক মধুময় অনুরাগ শুকিয়ে গেল। দগ্ধ হয়ে গেল প্রেম। তাঁদের এই বিচ্ছেদ স্মরণ করে এখনো আমরা বার্ণসদের যাঁরা বন্ধু ছিলাম, মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হই, ব্যথিত হই।

॥ ১৪ ॥

সারাভারতে ফ্রী প্রেসের সকল শাখার মধ্যে কলকাতা ছিল সর্বোত্তম। সবচেয়ে বেশি টাকা আসতো এখানকার সংবাদপত্র থেকে, সবচেয়ে বেশি দৈনিকপত্র এখানে আমাদের খবর নিত। কলকাতার পত্রিকাগুলির পক্ষেও ফ্রী প্রেস ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়, এই জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর না পেলে তাদের চলতো না।

সদানন্দ তখন ফ্রী প্রেসের দৈনিক পত্রিকাগোষ্ঠী সম্পর্কে উঠে-পড়ে লেগেছেন। পত্রিকা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। দিনরাত শুধু নতুন পাঁচটি পত্রিকার ধ্যান।

এমন সময় তাঁর একটা নির্দেশ এলো বম্বে থেকে। জানিয়েছেন কলকাতার সকল কর্মীকে বরখাস্ত করে মাত্র একটি টাইপিস্ট নিয়ে ফ্রী প্রেসের কাজ চালাতে। আয়ের সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা প্রতি মাসে বোম্বের অফিসে পাঠাতে। বোম্বে অফিসে দুঃসহ দারিদ্র্য।

কয়দিন পর সদানন্দ নিজেই এলেন কলকাতায়। নানা আলোচনা তুললেন, চাইলেন নানা পরামর্শ। বারবার তিনি বোঝাতে চাইলেন ফ্রী প্রেস থেকে কিছুতেই টাকা তোলা যাবে না। নিরন্তর অর্থাভাব সর্বদাই পথে কাঁটার মতো বিঁধবে। টাকা তুলতে হবে পত্রিকার মধ্য দিয়ে। এখান থেকে দৈনিক পত্রের দিকেই বেশি মনোনিবেশ দেওয়া দরকার। ফ্রী প্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে প্রত্যেকটি প্রাদেশিক 'ফ্রী প্রেসগোষ্ঠী' পত্রিকাকে বনিয়াদ ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে।

কিন্তু পত্রিকা-প্রকাশ সম্পর্কে আমার খুব উৎসাহ ছিল না। বোম্বে শহরে ফ্রী প্রেস জার্নাল অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কল্পনাতীত

সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রতি প্রাদেশিক রাজধানীতে ফ্রী প্রেসের পত্রিকা বেরোলে সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি পত্রিকা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবে। দৈনিক পত্র ও সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহ-যোগিতার ওপর নির্ভরশীল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিন্দুমাত্র মেঘ যদি নাবে তাহলে বিষম ঝড় উঠবে। সেই ঝড়ে সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের অবধারিত মৃত্যু। একথা আমি বুঝেছিলাম। সদানন্দকে তা স্পষ্ট জানালাম। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেড় লক্ষ টাকা সম্বল করে পাঁচটি নতুন পত্রিকা সংগঠন করা দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু সদানন্দ তখন আকাশকুসুম দেখছেন। কেবল পত্রিকা আর পত্রিকা, এ ছাড়া আর ভাবতে পারছেন না কিছু। পত্রিকা সম্পর্কে সামান্য-মাত্র দ্বিধা আছে যার, তাকেই তার না-পছন্দ।

অথচ আমাকে সদানন্দ শ্রদ্ধা করতেন। আমার কর্মক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। লণ্ডনে চলে যাবার সময় ভারতবর্ষে ফ্রী প্রেসের কাজ চালানোর জন্য আমাকে মনোনীত করেছিলেন ম্যানেজিং এডিটর। কলকাতায় ফ্রী প্রেসের অসাধারণ প্রভাব দেখে বুঝেছিলেন আমাকে তাঁর প্রয়োজন।

তবু আমাদের সম্পর্কে একটু ভাঙন দেখা দিল। সদানন্দ স্বপ্ন দেখছেন পত্রিকা, আমি চেষ্টা করছি সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে। সদানন্দ চলেছেন কল্পনার ঘোড়ার দৌড়ে, আমি মাটিতে হেঁটে। মতানৈক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল দুজনের কাছেই।

সদানন্দ জানালেন কলকাতার ফ্রী প্রেস পত্রিকার নাম 'ফ্রী ইণ্ডিয়া'। 'ফ্রী ইণ্ডিয়ার' সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি কিছুতেই রাজী হতে পারছি না। তখন একটু রাগতস্বরে জানালেন, আমি যদি অসম্মত হই, তাহলে অন্য কোন লোককে সম্পাদনার ভার দিতে হবে।

আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। মর্মাহত হয়েছিলাম। এমনি এক উদ্বেগ-

সঙ্কুল দিনে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম, ভারত বিল্ডিং থেকে মডার্ন রিভিউ-এর খ্যাতনামা সহকারী সম্পাদক শ্রীনীরোদ চৌধুরীর সম্পাদনায় কলকাতায় 'ফ্রী ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনটি একটা আলোড়ন তুললো কলকাতার সাংবাদিক জগতে। সর্বত্র চাঞ্চল্যের হাওয়া। তুষারকান্তি ঘোষ, মাখনলাল সেন, সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (ডাঃ রায় তখন শরৎ বসুর অনুপস্থিতিতে 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনা করছেন) আমাকে ডেকে সব খবর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে আমাকে জানালেন, নতুন পরিস্থিতিতে ফ্রী প্রেসের খবর নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সদানন্দকে টেলিগ্রাম করে এ খবর জানালাম। ডাঃ রায় ও মাখনলাল সদানন্দকে চিঠি লিখলেন। তাঁদের কাছে সদানন্দের উত্তর এলো অনতি-বিলম্বে, কলকাতার পত্রিকা নির্দিষ্ট দিনে বেরোবেই। আমাকে জানালেন, শীঘ্র বোম্বে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার অনেকদিনের বন্ধু। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিনিধি হয়ে তিনি 'ফরোয়ার্ড' পরিচালনা করতেন। তিনি এসে পরামর্শ করলেন আমার সঙ্গে। জানালেন ফ্রী প্রেসের নতুন পত্রিকা বেরোলে সংবাদ নেওয়া বন্ধ করতেই হবে, অথচ এ রকম একটা জাতীয়তা-বাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান না থাকলে কলকাতার পত্রিকাগুলি একান্ত অসুবিধেয় পড়বে। তিনি জানতে চাইলেন, আমি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবো কি না।

আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম সদানন্দের ব্যবহারে। ক্যাপ্টেন দত্তকে জানালাম, প্রাদেশিক ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না; কলকাতার সমস্ত পত্রিকার সহযোগিতা পেলে সর্বভারতীয় সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আমার পক্ষে অসাধ্য হবে না। আমার মতামতটা পত্রিকা মালিকদের কর্ণগোচর হলো।

সদানন্দকে আমি জবাব দিলাম। কলকাতার কর্মীদের পদচ্যুতি ও

পত্রিকাপ্রকাশ থেকে অবিলম্বে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম। স্পষ্টভাষায় তাঁকে জানালাম, অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে এ চিঠিকে আমার পদচ্যুতির নোটিস হিসেবে বিবেচিত করতে হবে। টেলিগ্রাম করে জবাব দিলেন সদানন্দ, অনতিবিলম্বে বোম্বে গিয়ে আলোচনা করতে বললেন। কিন্তু এও তিনি জানালেন, যে কোন প্রতিবন্ধক আসুক না কেন, পত্রিকা-প্রকাশ কিছুতেই বন্ধ হবে না।

সদানন্দ তখন ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। ফ্রী প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এডিটর, 'ফ্রী প্রেস জার্নালের' সম্পাদক। গান্ধীজীর গোল-টেবিল বৈঠকের রিপোর্ট করে সাংবাদিক হিসেবে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির তুলনায় আমি তো নগণ্য। আমার কাজ সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলেও, আমার উপদেশে তিনি কর্ণপাত করলেন না।

ফ্রী প্রেসে আমার পদত্যাগ অবধারিত হয়ে উঠল। স্বেচ্ছায় পদত্যাগের নোটিস দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না।

ইতিমধ্যে ফ্রী প্রেসের সংবাদ নেবার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে কলকাতার সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারীদের একটা জরুরী সভা বসলো। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, তুষারকান্তি ঘোষ, জে সি গুপ্ত (এডভান্স), সতীশ মুখোপাধ্যায় ও মূলচাঁদ আগরওয়ালা প্রভৃতি তাতে যোগ দিলেন। সভায় স্থির হলো, ফ্রী প্রেসের অনুরূপ একটি সর্বভারতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হলো আমার উপর। স্থির হলো বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সভাপতি হবেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমি এবং প্রধান ডিরেক্টর থাকবেন সুরেশচন্দ্র, তুষারকান্তি ও জে সি গুপ্ত। কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বলে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হলো ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া।

বারবার বেকার হয়েছি, বারবার বদল হয়েছে আমার কর্মস্থান। আবার নতুন করে জীবন-সংগ্রামে নামলাম। বৃহত্তর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। এতো বড়ো দায়িত্বের ভার আগে কখনো আসে নি। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই আমার, বিশ্বাস আছে নিজের কর্মক্ষমতার ওপর। নতুনতর কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়মূল আশা নিয়ে আমি অগ্রসর হয়ে গেলাম।

৮নং ডালহৌসী স্কোয়ারে সুরজমল নাগরমলদের এখনকার বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে আরম্ভ হলো ইউনাইটেড প্রেস। অমৃতবাজার পত্রিকা এক হাজার, আনন্দবাজার পত্রিকা এক হাজার, ডাঃ রায় পাঁচশ' ও জে সি গুপ্ত পাঁচশ' টাকা দিলেন। মাত্র তিন হাজার টাকা এলো হাতে। তা' নিয়ে আরম্ভ হলো একটি বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী সংবাদসরবরাহী প্রতিষ্ঠান, আজ যার বার্ষিক ব্যয় দশ লক্ষ টাকা। ১৯৩৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহ শুরু হলো।

আগস্ট মাসের শেষদিন রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিন থেকে আমরা সংবাদ পাঠাতে আরম্ভ করলাম। সেদিনের উত্তেজনা, আশা, আনন্দ আর উদ্বেগ আজো বিস্মৃত হই নি, সেই স্মরণীয় দিনটি উজ্জ্বল আমার জীবনে।

২রা সেপ্টেম্বর সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ঝলমল করে উঠল ইউ-নাইটেড প্রেসের নাম। ফ্রী প্রেস কোথায়? এই প্রতিষ্ঠান কাদের, কবে প্রতিষ্ঠিত হলো? চারদিকে কেবল এই প্রশ্ন।

বাঙলাদেশের সর্বত্র যত সাংবাদিক ছিলেন সকলকে আগেই আবেদন জানিয়ে রেখেছিলাম। পাটনা, দিল্লী, সিমলা, বোম্বাই, লাহোর মাদ্রাজ, নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান নগরীর কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গেও পূর্বাহ্লেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। ডাকে ও তারে তাঁরা সংবাদ পাঠাতে আরম্ভ করলেন। আমরা তা সম্পাদনা করে পরিবেশন করতে লাগলাম।

ফ্রী প্রেসের লাহোর শাখার সম্পাদক পুলিন দত্ত আমার সঙ্গেই পদত্যাগ করেছিলেন। অল্প কিছু মূলধন সংগ্রহ করে ১লা সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি লাহোরে ইউ পি অফিস খুলে বসেছিলেন। 'ট্রিবিউন' সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়ের স্নেহ তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় পুলিন দত্ত 'ট্রিবিউন' 'প্রতাপ' ও 'মিলাপ' পত্রিকার সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নিলেন।

এতো অল্প মূলধনে এতো বড়ো একটি প্রতিষ্ঠান কিছুতেই চালানো সম্ভব নয়। তাই অর্থ-সংগ্রহের দিকে নজর রাখতে হলো। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, ডাঃ রায় ও জে সি গুপ্ত মশায় ছাড়া বাকী যাঁরা টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা টাকা দিতে পারলেন না। তাই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ঋণ নিতে হলো। যথারীতি মাইনেও আর দিতে পারি না আমরা। তখন বাইরের লোকের কাছে অল্প অল্প শেয়ার বিক্রী করতে আরম্ভ করলাম। কিছু বিক্রী হতে লাগলো। এইভাবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিবর্তিত হয়ে গেল প্রতিষ্ঠানটি।

এমন সময় চারু সরকার, অমিয় বর্ধন, চন্দ্রভূষণ নাগ, মুকুন্দ দেব, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, ফণী সেনগুপ্ত যাঁরা ফ্রী প্রেসে আমার সহকর্মী ছিলেন, তাঁরা এসে যোগ দিলেন ইউনাইটেড প্রেসে। দৈনন্দিন কাজকর্ম চললো সুষ্ঠুভাবে, আমার হাতেও কিছু সময় এলো। অর্থ-সংগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানটির সংগঠনের দিকে নজর দিতে পারলাম।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নির্বাচিত হয়েছিলেন অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতি। একদল ডাক্তার-প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি গেলেন বোম্বে সভাপতিত্ব করার জন্য। আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম।

বোম্বে পৌঁছে হিন্দুস্থান ইনস্যুওরেন্সের একটা খালি ফ্ল্যাটে আমরা উঠেছি। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার সুরেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে ও ডাঃ রায়কে নিয়ে গেলেন 'বাম্বে ক্রনিকল' ও 'বোম্বে সমাচার' পত্রিকা দুটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কামা ও সম্পাদক মিঃ ব্রেলভীর সঙ্গে দেখা

করতে। ডাঃ রায়ের অনুরোধে তাঁরা ইউ পিকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সের একটি খালি ঘরে ইউ পি'র বোম্বে শাখার অফিস খুললাম। ফ্রী প্রেসের সহকর্মী শশাঙ্ক ঘটক নিযুক্ত হলেন সম্পাদক। সুরেশবাবু এক হাজার টাকার শেয়ার কিনে ইউ পি'র একজন ডিরেক্টর হলেন।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হলো। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন ফ্রী প্রেসের জন্য। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ফ্রী প্রেসের শেষদিনগুলির সংবাদ। সদানন্দের কর্ম-পদ্ধতিতে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আমাকে শুভ-কামনা জানিয়ে বল্লেন, ফ্রী প্রেসের মতো ভুল যেন আমরা না করি।

বোম্বে থেকে ফিরে এলাম কলকাতা। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মতো একটা প্রেস-এসোসিয়েশন গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে এই সময় মাদ্রাজের বিখ্যাত সাংবাদিক কস্তুরী শ্রীনিবাসন ও সি আর শ্রীনিবাসন এসেছিলেন কলকাতায়। ডাঃ রায়ের বাড়িতে কলকাতা সংবাদপত্র মালিকদের সভা হলো। সকলেই তাঁদের শুভকামনা ও অভিনন্দন জানালেন। মতানৈক্য হলো এসোসিয়েশন গড়ে তোলার ব্যাপারে।

সেই সভাতেই ডাঃ রায় মাদ্রাজ সাংবাদিকদের অনুরোধ জানালেন ইউ পি'কে সহযোগিতা করার জন্য। তাঁরা সম্মত হলেন।

মাদ্রাজে আমাদের শাখা অফিস খুলতে হবে। গেলাম মাদ্রাজ। কস্তুরী শ্রীনিবাসন তখন মাদ্রাজ সাংবাদিকদের মুকুটহীন সম্রাট। সমস্ত সংবাদপত্র মালিকদের একটি সভা আহ্বান করলেন তিনি। স্থির হলো হিন্দু, মাদ্রাজ মেল, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ও অন্ধ্র পত্রিকার কর্তারা ১২৫০৲ টাকা দেবেন মাদ্রাজে অফিস চালাবার জন্য।

মাদ্রাজের হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অফিসে আমি থাকতাম। সেখানকার ম্যানেজার সুধাংশু চৌধুরী আমাদের অফিস খোলার জন্য

একটা ঘর খুলে দিলেন। নতুন অফিস খোলা হলো মাদ্রাজে। কে ভি বেঙ্কটরমণ নিযুক্ত হলেন শাখা-সম্পাদক।

কিন্তু ছ'মাস না কাটতেই নতুন সঙ্কট দেখা দিল। আমাদের অফিসে পদত্যাগ করে বেঙ্কটরমণ রয়টারে যোগ দিলেন। রয়টারের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তাঁরা আশা করেছিলেন কস্তূরী শ্রীনিবাসন নির্বাচিত বেঙ্কটরমণ যদি ইউ পি'তে না থাকেন, তাহলে হিন্দু পত্রিকার সহযোগিতা হারাবে এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি।

অনতিবিলম্বে আমি গেলাম মাদ্রাজ। কস্তূরী শ্রীনিবাসনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর অনুমোদন নিয়ে সেতুরাম নামে একটি যুবককে সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করা হলো। সেতুরাম আগে আমাদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৌলিন্য ছিল না তাঁর, কিন্তু অদ্ভূত করিতকর্মা লোক তিনি। সাংবাদিকের সব যোগ্যতাই তাঁর ছিল। বেঙ্কটরমণ থেকেও কৃতিত্ব দেখালেন তিনি তাঁর কর্মক্ষমতায়।

কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার গোলমাল দেখা দিল। কাজে গাফিলতি দিলেন, হিসেবপত্রেও গোলমাল ধরা পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে লাহোরে বদলী করে মাদ্রাজে সম্পাদক নিযুক্ত করলাম আমার কনিষ্ঠ ভাই শশীভূষণ সেনগুপ্তকে।

শশীভূষণ ফ্রী প্রেসে আমার সহকর্মী ছিলেন। খুব স্বল্পদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ অফিসটি তিনি সাজিয়ে নিলেন। সাফল্য অর্জন করলেন তাঁর সৌজন্যসুন্দর ব্যবহারে। সাংবাদিক মহলে অল্পায়াসে প্রভাব করে নিলেন তিনি। রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। মাদ্রাজ অফিসের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল সর্বত্র।

॥ ১৫ ॥

৭ই অগাস্ট, ১৯৪১ ইং।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হলো। একটা নিদারুণ আর্তনাদের মতো মনের গভীরে শোকভার নেমে এলো। মনে হলো পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে একটি জীবনের অভাবে। ঠাকুরবাড়ির সামনে হাজার হাজার স্তব্ধ নরনারী, আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম শেষ প্রণাম নিবেদন করতে।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক বাঙালীর কতো আপন, তাঁর মহাপ্রয়াণের দিনে তা স্পষ্ট অনুভব করলাম। তাঁর কবিতায়, গানে আমাদের মনের আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তাঁর চিন্তা ও মনীষায় আমরা নতুন করে ভাবতে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র দানে আমাদের প্রত্যেকের জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁর ভাষা আমাদের প্রতিদিনের অনুভব সুরঞ্জিত করে তুলেছে।

তিনি যে কতোখানি আমাদের নিকটতম আত্মার আত্মীয়, তাঁর জীবিতকালে হয়তো তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারি নি। শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁকে অর্পণ করেছি, কিন্তু তাঁর অভাবে পৃথিবী এমন শূন্য মনে হবে, তা হয়তো আশঙ্কা করি নি।

বাল্যকালে তাঁর কবিতা আমার জীবনে নতুন পৃথিবীর দ্বার খুলে দিয়েছিল। যামিনীমোহনের সঙ্গে কথোপকথনে ও পত্রালাপে 'রবি ঠাকুরের' নতুন নতুন কবিতা আলোচনা করে হৃদয় সম্প্রসারিত হতো। তাঁর সঙ্গীত নিজেরা গান গেয়ে চর্চা করতাম ছাত্রাবস্থায়।

রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখি সিটি কলেজে পড়ার সময়। একদিন্ তিনি সে কলেজে অভিভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা আমি আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে দেখেছিলাম, এমন হিরন্ময় মূর্তি আর কবে দেখেছি। এমন দেবোপম চেহারাও কি মানুষের হয়, এমন দিব্য-

জ্যোতির্ময়? দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির মতো তাঁর কথাগুলি শুনছিলাম ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ভাষণ। অবশেষে সকলের অনুরোধে তিনি দু'কলি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সে গান এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে: 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি, আমি অবাক হয়ে শুনি।'

স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জনকল্লোল যখন বঙ্গ-বিভাগ রদ করবার জন্য দুর্মর হয়ে উঠেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা ছিল আমাদের সুগভীর প্রেরণা। ভয়-দুর্বল মনে তাঁর গান এক আশ্চর্য সাহস ছড়িয়ে যেত। পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাঁর কবিতা ও গান জনসাধারণের মনে দুর্বার প্রেরণা জাগিয়ে তুলতো। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে', 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু ওগো কর্ণধার, এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক, ফিরবো নাকো আর' প্রভৃতি গানগুলি আমাদের প্রাণে ভয়হীন, শঙ্কাহীন দুঃসাহসী যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে দিতো।

তারপর নানা স্থানে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, গান শুনেছি। তাঁর প্রতিটি নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করেছি। বিচিত্র অনুভূতির বর্ণসুষমায় নিজেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করার সাড়ম্বর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই উপলক্ষে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীঅমল হোম প্রভৃতি বিশেষভাবে পরিশ্রম করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও মনীষীদের শ্রদ্ধা একটি বিরাট গ্রন্থে মুদ্রিত করে কবিগুরুর কাছে পৃথিবীর অভিনন্দন নিবেদন করা হয়েছিল। এই গ্রন্থটি 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আমি নিজেও এই অভিনন্দন-সভায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলাম, কমিটির প্রচার-শাখার সম্পাদক হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

কলকাতা টাউন হলে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর. ১৯৩১ ইং) এই স্মরণীয় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আজকাল প্রতি বৎসর বিপুল আয়োজনে যে রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রতি পাড়ায় পাড়ায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, এই জয়ন্তী উৎসবটি ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। এই উৎসবের গুরুত্ব এখন ঐতিহাসিক মূল্য পেয়েছে। স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের শ্রদ্ধা মিশে গিয়েছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

কলকাতা নাগরিকদের পক্ষ থেকে কলকতা পৌরসভা অভিনন্দন-পত্রে নিবেদন করেছিল :

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগতকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জন-সমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙালীজাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান

পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

কলিকাতা,
১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

বন্দে মাতরম্।
তোমার গুণগর্বিত
কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়,
মেয়র।"

প্রত্যুত্তরে কবি বলেছিলেন:

"একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্বর্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক—পুরবাসীর দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি॥"

দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়, তার খসড়া লিখেছিলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। সেই অর্ঘ-পত্রে বলা হয়:

"কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতীয় জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগনস্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

কলিকাতা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদ পক্ষে
রবিবার, কৃষ্ণাতৃতীয়া শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু,
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল বঙ্গাব্দ। সভাপতি।"

দেশবাসীর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, দেশবাসীই তাতে অলঙ্কৃত হলেন। যে কবির দানে আমাদের হৃদয়-

কুসুম ফুটেছে, যার কল্যাণ ও সুন্দরের স্পর্শে আমাদের মন বিকশিত হয়েছে, তাঁর প্রতি আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা নিবেদনে আমাদের হৃদয়ই গভীরতর আনন্দে প্রসারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়েছিল শান্তিনিকেতনের এক বর্ষামঙ্গল উৎসবে। তখন সবেমাত্র ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ষামঙ্গল উৎসবে কবি কয়েকজন সাংবাদিককে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কালিপদ বিশ্বাস ও প্রমোদ সেনের সঙ্গে আমিও গেলাম কবিতীর্থে।

তখনও শান্তিনিকেতনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হয় নি, আজকালকার মতো তার চেহারাও ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন স্পর্শ ছিল আশ্রমে, মনে হতো একটি আশ্চর্য শান্তির নীড়ে এসে হাজির হয়েছি।

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা শিশিরকুমার মিত্র ছিলেন শান্তিনিকেতন স্কুলের শিক্ষক। তিনি, সদাহাস্যময় সুধাকান্ত চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দেখাশোনা করছিলেন, থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল 'অতিথিভবনের' দ্বিতলে। 'স্টেটস্‌ম্যানের' তদানীন্তন সম্পাদক ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ সকন্যা এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

গিয়ে পৌছেছিলাম রাত্রিতে, কিছু দেখার সুযোগ হয় নি। সকাল ভাল করে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল, এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। লাল ধুধু প্রান্তরের মধ্যে একটি ছোট উপনিবেশ, ছোট ছোট বাড়ি, লাল সুরকির পথ, চারদিকে গাছের সারি। ছবির মতো সুন্দর। কবির কল্পনার মতো তাঁর গড়া শিক্ষা-উপনিবেশটিও মনোরম। মন মুগ্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

আম্রকুঞ্জে বৃক্ষরোপণ উৎসবটি সম্পন্ন হলো। তখন মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশে চক্রবালরেখার কাছ থকে সূর্যদেবের অরুণ রঙীন রথ এগিয়ে আসছে। পূবদিকে সোনালী কিরণের অপূর্ব ছটা। নয়নাভিরাম

আলপনা চেরা মণ্ডপে ঘট ও বেদী সুসজ্জিত। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই উৎসবের পৌরহিত্য করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বেদমন্ত্র পাঠ করে উৎসবটিকে পবিত্র সুষমায় সুবাসিত করে দিয়েছিলেন। বেদমন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবে সঙ্গীতমুখর সুরের আশ্চর্য কলকাকলী নেমে এসেছিল।

আজকাল সরকার বনমহোৎসব পালন করেন। সরকারের পদস্থ ব্যক্তিগণ মহাসমারোহে বৃক্ষরোপণ পর্ব উদ্‌যাপন করে থাকেন। কিন্তু সেদিন শান্তিনিকেতনে, কবিগুরুর উপস্থিতিতে যে মহান ভাবমণ্ডিত পরিবেশে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখেছিলাম, তার তুলনা নেই। সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও আন্তরিকতায় এই উৎসবটি মনের খুব গভীরে দোলা দিয়েছিল।

উৎসব সমাপ্ত হবার পর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সুধাকান্তবাবু সকল সময়ই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, হাস্যপরিহাস ও গল্পগুজবে তাঁর সাহচর্য সত্যিই চিত্তাভিরাম। আর ছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মকর্তা আমার বিশিষ্ট বন্ধু কালীমোহন ঘোষ মহাশয়। পল্লীসেবা ও শিল্পোন্নয়নের কবি-কল্পনা কালীমোহনবাবুর অপূর্ব সংগঠন শক্তিতে শ্রীনিকেতনে সুষ্ঠু রূপায়িত হয়েছে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত শিষ্য ও শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট কর্মী।

সন্ধ্যায় আমরা সদলে গেলাম কবিসান্নিধ্যে। তিনি আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর শরীর সেদিন ভালো যাচ্ছিল না, তবু তিনি একটা ইজিচেয়ারে উপবেশন করলেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিমা দেবী, নন্দিতা ও রথীবাবু ছিলেন। সুধাকান্তবাবু, অনিলবাবু, ডাঃ ধীরেন সেন, কালীমোহনবাবুও উপস্থিত ছিলেন। চা খাওয়ার পর সকলেই চলে গেলেন। একা সুধাকান্তবাবু রইলেন কবির পার্শ্বে। আমরা কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

সেদিন আলোচনার মধ্যে কবিকে বাঙলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

চিন্তান্বিত দেখেছিলাম। ইস্কুলে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করা হচ্ছিল, তাতে দলীয় মনোভাবে নানারকম বিকৃতি এসে ঢুকেছিল। কবি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, শিশুদের মনে ভাষার এই বিকৃত অপব্যবহার একটা বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও আন্দোলন সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে যথার্থ শক্তি সঞ্চারিত করার দিকেই কবির সর্বাধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, যেভাবে স্বরাজ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, তাতে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল নাও আসতে পারে। যদি শিক্ষিত সেবাব্রতী মানুষ দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের দৃঢ় বনিয়াদ তৈরি না করতে পারে, তাহ'লে ইংরেজ চলে গেলেও দেশের দুর্দিন ঘুচবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু রোমাণ্টিকতার আলো থেকে যাচ্ছে, তার ফলে লোকে তার দিকে আকৃষ্ট হলেও জনসাধারণের মধ্যে আসল প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হতে পারছে না।।

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত স্বরাজ-সাধনা সারা দেশে প্রমূর্ত হবার সুযোগ পায় নি।

বিশ্বভারতী অথবা নিজের প্রচার, কবি পছন্দ করতেন না। আমি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রচারকার্যের কথা তুলি কবিগুরুর কাছে। তিনি সভয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন নানা যুক্তি দিয়ে প্রচারের জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। বিশ্বভারতীর যথার্থ সার্থকতা নির্ভর করে সর্বদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সপ্রীতি মিলনে। কিন্তু প্রচারকার্য যদি পেছনে সহায় না হয়, তাহলে সর্বদেশে বিশ্বভারতীর বার্তা পৌছবে কিভাবে।

কবিকে আমি নিবেদন করি, তাঁর নিজের জন্য নয়, দেশের এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রচার হওয়া

একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য বহুবার গিয়েছেন, প্রচারকার্যের ফলে অর্থসংগ্রহও ত্বরান্বিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ধরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু অবশেষে মহামৃত্যু তাঁকে আহ্বান করলো।

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন আনন্দের, মৃত্যুও আনন্দের। কিন্তু কবির মহাপ্রয়াণে আমাদের মনে মহাশূন্যতা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শোকাশ্রু নিয়ে গেলাম কবিভবনে, সেখানে কাতারে কাতারে লোক জমেছে। কেউ কেউ কাঁদছে, বিলাপ করছে। আমরা গিয়ে শেষপ্রণাম নিবেদন করলাম।

দীর্ঘ শোকযাত্রা শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে এসে দাঁড়ালো নিমতলা শ্মশানঘাটে! সর্বক্ষণ আমি ছিলাম সঙ্গে। পথে দেখেছি আশ্চর্য কবিপ্রীতি। শহরের কাজকর্ম একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রতিটি বাড়িতে শোকভারনত নরনারীর ক্রন্দনরত মুখ। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মানবলীলা সংবরণ করলেন।

শূন্য মন নিয়ে ফিরে এলাম অফিসে। আমার শোক আমার রইলো, সারা জাতির শোক প্রকাশ করতে হবে সাংবাদিক কর্তব্যের মধ্যে। বৃহত্তম শোকসংবাদ প্রেরণ করতে হবে দেশে বিদেশে, প্রতিটি সংবাদপত্র কার্যালয়ে। এই লেখনীর মধ্যেই রইলো আমার প্রণাম কবিগুরুর পায়ে, আমার অর্ঘ।

॥ ১৬ ॥

এই জীবনে সাংবাদিকতায় আমার অঞ্জলি নিবেদন করেছি। আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে এই নিবেদন সার্থক করার চেষ্টা করেছি আজীবন। কিন্তু শুধু নিজের দায় নিয়েই খুশী থাকতে পারিনি, আরো অনেক সংখ্যক সাংবাদিক গড়ার দিকেও মন দিয়েছি। হাতে-কলমে যাঁদের কাজ শিখিয়েছি, আজ তাঁদের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁদের গৌরবে নিজেরই গৌরব অনুভব করেছি সর্বদা।

'বেঙ্গলী' ও 'ডেইলি নিউজে' যখন কাজ করতাম, তখন স্বর্গীয় কে সি সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক। অমায়িক মধুর ছিল তাঁর স্বভাব, সুন্দর নির্মল ছিল চরিত্র। তরুণ সাংবাদিকদের প্রতি তার মমতা ছিল, তাঁদের সঙ্গে বন্ধু'র আন্তরিকতা নিয়ে তিনি মিশতেন। অনেক ছাত্রকেই তিনি উচ্চতর পদ বা চাকুরি দিয়ে জীবনের সংস্থান করে দিয়েছেন।

ফ্রী প্রেসের প্রথম পর্বে একমাত্র টাইপিস্ট নিয়ে আমি অফিস চালাই। রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সে সময় সরকার মশাই একটি ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। এম এ, বি এল পাশ করে ওকালতি আরম্ভ করেছিল ছেলেটি। কিন্তু তাতে মন লাগে নি। মন ছিল সাংবাদিকতার দিকে। নাম চারু সরকার। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আমার কাছে সাংবাদিকতা শেখার।

তৎক্ষণাৎ আমি সম্মতি জানালাম। পরের দিনই কাজে যোগ দিলেন চারু। প্রথম প্রথম ডিক্টেশন দিতাম, সংবাদ সংক্ষিপ্তকরণের কৌশল শিখিয়ে দিতাম। বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ ছেলে চারু। তাঁর হাতের লেখা সুন্দর। ইংরেজী ভাষার ওপর বিশেষ অনুরাগ। মুখে মুখে যা বলতাম,

শর্টহ্যাণ্ডের মতো লিখে নিয়ে টাইপ করে দিতে পারতেন। স্বল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত সাংবাদিক হয়ে উঠলেন তিনি। সদানন্দকে বলে মাত্র ত্রিশ টাকা তাঁকে মাইনে করে দিতে পেরেছিলাম। ফ্রী প্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে আসার সময় চারুর কাছেই কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। পরে তিনি এবং অন্যান্য সকল সহকর্মীরাই ইউনাইটেড প্রেসে যোগদান করেছিলেন।

স্বর্গীয় হরিদাস হালদার সে যুগে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। কালিঘাটের 'সেবাইত' হয়েও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর তিনি বন্ধু ছিলেন। 'সার্ভেণ্ট' অফিসে তিনি নিয়মিতভাবে যেতেন।

ফ্রী প্রেস যখন বড়ো হয়ে উঠেছে, আমি তখন পরেশনাথ মন্দিরের কাছে থাকি। একদিন সকালে সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন হালদার মশাই, সঙ্গে একটি লাজুক ধরণের স্নিগ্ধ চেহারার ছেলে। হালদার মশাই বললেন, এই ছেলেটি তাঁর নাতি। নাম সরোজ চক্রবর্তী। সম্প্রতি ম্যাট্রিক পাশ করে আই এ পড়ছিল, সাধারণ লেখাপড়া শেখার মতো সংস্থান নেই বলে শর্টহ্যাণ্ড শিখছে। তিনি জানালেন, এই ছেলেটিকে রিপোর্টারের কাজ শিখিয়ে মানুষ করে দিতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন।

সরোজকে দেখে আমার কেমন মায়া হলো। তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাজুক স্বভাব তাঁর। ঠিকমতো জবাব পেলাম না। তবু তাঁকে কাজ শেখাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম হালদার মশাইকে।

কিছুদিন পরে সরোজ কাজে যোগ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ঠিকঠাক সব শিখে গেলেন। তাঁর হাতের লেখা খুব খারাপ, প্রায় পড়াই যায় না। কিন্তু ভাল টাইপ করতে জানতেন, দ্রুত নোট নিতে পারতেন শর্টহ্যাণ্ডে। চারুরও তাঁকে ভালো লেগেছিল।

আমার বন্ধু স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টির খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রথম যুগে দিল্লী সিমলার সরকারী সংবাদ তিনি সংগ্রহ করে দিতেন। নানাভাবে তিনি আমাদের সহায়তা করতেন। তারপর তিনি ইউ পি'র ডিরেক্টর হ'য়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের অফিসে। চারু ও সরোজকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন তিনি। তাঁদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল।

বেঙ্গল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। প্রথমেই তাঁর পি-এ'র পদে চাইলেন সরোজকে। সরোজ তখন দক্ষ সাংবাদিক। নানাবিধ গুণসম্পন্ন। তাঁকে ছেড়ে দিলে আমার অসুবিধে ঘটবে বিস্তর। কিন্তু সরকারী চাকুরি ও মাহিনার দিকে তাকিয়ে সত্যেন্দ্রচন্দ্রে'র অনুরোধ মেনে নিলাম। এখন সরোজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ আস্থাভাজন পি-এ।

চারুকে'ও সত্যেনবাবু নিয়ে গেলেন। ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা হয়, তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। এই পুস্তিকা সম্পাদনা করার একটা নতুন পদ সৃষ্টি করে সত্যেনবাবু চারুকে ডাকলেন। এই পদে চারুর ভবিষ্যৎ থাকতে পারে ভেবে আমি অনুরোধ মেনে নিলাম। নিজের হাতে যাঁদের গড়ে তুলেছি, তাঁদের প্রাত্যহিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। তবু খুশী হয়েছি, তাঁরা উন্নতি করতে পারবেন এ সম্পর্কে নির্দ্বিধা হয়ে।

কে সি সরকার মশাই নিজের বাড়িতে একটা শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শেখার স্কুল করেছিলেন। অনেক নতুন সাংবাদিক ও বেকার যুবক তাঁর স্কুলে শিক্ষালাভ করতেন। একদা এই স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভারতবন্ধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবকে সভাপতি ও আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আহ্বান করা হয়। সে সভায় অনিল দাস নামক একটি যুবক আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তাঁর

ব্যবহারে এমন একটা দীপ্তি ছিল যে, আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বিখ্যাত দেশকর্মী পুলিন দাসের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র; বি এ পাশ করে শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখছিলেন। সরকার মশাই অনিলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, আমার কাছে তাঁর অনুরোধ ছিল যেন অনিলের একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিই। তখন হঠাৎ আমাদের দিল্লী ও সিমলা অফিসের জন্য এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের বক্তৃতা রিপোর্ট করার প্রয়োজনে একটি দক্ষ সাংবাদিকের দরকার পড়েছিল। অল্প কয়দিন অনিলকে কাজ দেখিয়ে দিল্লী পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। কিছুদিন পরে অনিল কলকাতা অফিসে বার্ত্তাসম্পাদক হয়ে আসে। ১৯৪৪ সালে 'নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনে' তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টি ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। সুরেশবাবু তাঁকে ভালো মাহিনা, বাড়ি ও এলাওয়েন্স দিয়ে 'দিল্লীতে 'বিশেষ প্রতিনিধি' নিযুক্ত করেন।

অনিল যখন আনন্দবাজারে চলে যাবেন বলে স্থির করেছেন ঠিক সেই সময়ই চারু এসে আমাকে বিপন্মুক্ত করেন। সরকারী কাজে তখনও তিনি পার্মানেণ্ট হন নি, 'গ্রেডে'রও উন্নতি ঘটে নি। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পরলোকগমনে সে পদে তাঁর আকর্ষণও ছিল না! তিনি ফিরে এলেন ইউনাইটেড প্রেসে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে দিল্লী অফিসের সম্পাদক নিযুক্ত করলাম। দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্যে দিনের পর দিন তিনি প্রোজ্জ্বল হয়েছেন। দিল্লীর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি এখন প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন, এর জন্য আমি গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি।

ইউনাইটেড প্রেস কর্মসাধনায় এখন এগিয়ে চলেছে। কাছের ও দূরের বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক। এই কর্মচক্রের রথ বহু প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকের সমবেত সহযোগিতায় দ্রুত সঞ্চারশীল। কিন্তু তার যাত্রারম্ভের দিনে অখ্যাতি ও দারিদ্র্যকে ব্রত করে তরুণ

সাংবাদিক যাঁরা এসেছিলেন রথের রশিতে টান দিতে, আমার স্মৃতিকোঠায় তাঁরা উজ্জ্বল।

জ্যোতি দেব ইউনাইটেড প্রেসের আর একজন বিশেষ গুণসম্পন্ন সাংবাদিক। বোম্বে অফিসের সম্পাদকরূপে তিনি অপরিসীম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার' কাজে আমার সহকর্মী ছিলেন। অবস্থার চাপে তিনি এম এ পড়তে পারছিলেন না। আমার বন্ধু অধ্যাপক জগৎচন্দ্র পালের সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন কাজের প্রার্থনা জানাতে। টাইপরাইটিং শিখে তখন তিনি শর্টহ্যাণ্ড শিখছিলেন। কলকাতা অফিসে কিছুদিন কাজ শিখিয়ে তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জ্যোতি বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী ছেলে, মাত্র ৪০৲ বেতনে দিল্লী যেতে আপত্তি করেন নি। দু'বৎসর পরে যখন ৬০৲ টাকা হয়েছে, তখন বোম্বে অফিসে স্থানান্তরিত হলেন।

জ্যোতির জীবনে সুদক্ষ সাংবাদিক হবার একটা সচেতন চেষ্টা ছিল। প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা খুব খুঁটিয়ে পড়তেন তিনি, কোনদিন তাতে শৈথিল্য ছিল না। ছাত্রের মতো একাগ্র সাধনা ও ধৈর্য নিয়ে প্রাত্যহিক কর্মযাপনে সাংবাদিকতার শিক্ষা নিতেন। অবসর পেলেই দিল্লীর স্টেটস্‌ম্যান অফিসে অথবা বাঙালীদের ক্লাবে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াও তাঁর একটা নেশা ছিল। তাঁর সংগৃহীত Exclusive খবর বহুবার প্রশংসিত হয়েছে।

কিছুকাল পরে তিনি বোম্বে অফিসের সম্পাদক পদে মনোনীত হন। বোম্বে অফিসের সাফল্য তাঁর নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। ইউনাইটেড প্রেসের বিদেশী সংবাদের সুব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে বিলেতে পাঠান হয়। লণ্ডন থেকে প্রেরিত তাঁর সাপ্তাহিক সংবাদগুলি দেশে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে; আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি চমৎকার 'Exclusive interview' পাঠিয়ে সাংবাদিক মহলে

যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর আরো পদোন্নতি হয়েছে। তিনি এখন আমাদের জেনারেল ম্যানেজার।

লেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতিমান। ১৯৪২ সালে একটি সুন্দর বই রচনা করেন, 'Blood and Tears'। বিলেত ঘুরে এসে লেখেন 'I cover Europe'। লেখার ওপর দখল আছে তাঁর, আর আছে দেখার মত চোখ। যা দেখেছেন তা লিখেছেন, কিন্তু লেখা আর দেখার গুণে তাঁর রচনা হয়েছে মনোরম। মনের মধ্যে তা গুঞ্জন তুলে যায়।

॥ ১৭ ॥

জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিন সাধনা আমার। জীবনের একমাত্র ব্রত। দেশের প্রতি প্রত্যন্তে সংবাদদাতা গঠন করেছি, তরুণ সাংবাদিকদের শিক্ষা দিয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করেছি। আর ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের কাছে আমাদের সংবাদ বিতরণ করার অধিকার অর্জন। তার জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে প্রত্যেকটি বৃহত্তর নগরীতে আমাদের শাখা অফিস।

দিন রাত শুধু একমাত্র ধ্যান, একমাত্র ব্রত। জীবনের মধ্যাহ্নে যে দায়িত্ব নিয়েছি স্বেচ্ছায়, তাকে পূর্ণতর মর্যাদা দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে যাবো। তার জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ভারতের নানাস্থানে, সহায়তা ভিক্ষা করেছি নানাজনের। কোথায়ও নিরাশ হয়েছি, কোথাও পূর্ণ হয়েছে আশা। তবু পথচ্যুত হই নি।

জাতীয়তাবাদী সকল সংবাদপত্রের কাছেই অল্পাধিক সহায়তা পেয়েছি সব সময়। কিন্তু স্টেটস্‌ম্যান ব্রিটিশ স্বার্থের ধ্বজাবাহী। তবু তাঁদের কাছে সংবাদ বিক্রয়ের চেষ্টা করেছি। কেননা নানা কারণে এই পত্রিকার গুরুত্ব সমধিক।

তখন আর্থার মুর ছিলেন স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক। ভারতবন্ধু' এই পত্রিকার কণ্ঠ চিরকালই ভারতীয় স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু মুর সাহেব ছিলেন যথার্থ ভারতের বন্ধু।

একদিন সাক্ষাৎ করতে গেলাম আর্থার মুরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হলো। মাসিক পাঁচ শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ নিতে তিনি রাজী হলেন। পরাধীনতা যখন দেশকে শৃঙ্খল

দিয়ে বেঁধেছে, তখন আমলাতন্ত্রের রক্ষক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকের ঘরে সেদিন যে সহৃদয়তা পেয়েছিলাম, তা অপ্রত্যাশিত অভাবনীয়।

কিন্তু স্টেটস্‌ম্যানের বার্তা-সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। একটা সুযোগ তৈরী করে ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদ নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কর্তৃপক্ষের আপত্তির ফলে সম্পাদক আর্থার মুর চেষ্টা করেও এই নির্দেশ পাল্টাতে পারলেন না। তখন তিনি ব্যবস্থা করলেন, আমাদের পরিবেশিত সংবাদ থেকে স্টেটস্‌ম্যানের পছন্দানুযায়ী খবর তাঁরা প্রকাশ করবেন। এর জন্য মূল্য নির্ধারিত হলো কলম পিছু ষোল টাকা।

কিছুকাল পরে আর্থার মুর মতদ্বৈধতার জন্য পদত্যাগ করে চলে যান। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন আয়ান স্টিভেন।

মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন স্টিভেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ভারতীয় প্রাণায়ামে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি ছিলেন নিরামিষ ভোজী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

হাসি, সৌজন্য ও সহানুভূতি দিয়ে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ আচরণ একান্তই ছদ্মবেশ। নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো।

কিছুকাল পরে দিল্লী সংস্করণের সম্পাদক কার্টনার কলকাতা এলেন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে। যুদ্ধের আমলে ভারত সরকারের 'প্রিন্সিপাল প্রেস এডভাইসার' ছিলেন তিনি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্টিভেন তখন ছুটিতে। সেই আর্থার মুরের মতো সহৃদয়তা তাঁর। সাড়ে সাত শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ নেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সহানুভূতি তাঁর সব ব্যবহারে। জানালেন আমাদের টেলিপ্রিণ্টার চালু হলে অন্যান্য পত্রিকার সমান টাকা দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত করার আগেই তিনি অবসরগ্রহণ করে চলে গেছেন।

এমনিভাবে দিনের পর দিন সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

বি জি হর্নিম্যান ও এস এ ব্রেলভী ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দু'জন স্মরণীয় পুরুষ। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও তেজস্বিতায় দু'জনই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী। দু'জনই ক্রমান্বয়ে বোম্বে নগরীর বিখ্যাত দৈনিকপত্র 'বোম্বে ক্রনিকলের' সম্পাদনা করেছেন।

আমাদের বোম্বে সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন, যদি আমরা ১৫ দিন পরীক্ষামূলকভাবে 'বোম্বে ক্রনিকলে' সংবাদ পরিবেশন করি, তাহলে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাঁরা আমাদের সার্ভিস নেবার ব্যবস্থা করবেন। এই মনোভাব শোনার পর একদিন ব্রেলভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি সহৃদয়তা নিয়ে আমার বক্তব্য শুনেন। তারপর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার দাবীকৃত টাকার জন্য সুপারিশ করেন।

মিঃ কামা ছিলেন 'বোম্বে ক্রনিকলের' ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে একদিন হর্নিম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রীতি ও বন্ধুত্বের আন্তরিকতা নিয়ে তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। ফ্রী প্রেস বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁর মর্মবেদনা ছিল, একটি জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিঃ কামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রকেও ব্যবসায় বলে মনে করতেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। ফ্রী প্রেসের সংবাদ জানতে চাইলেন, ভারতীয় সাংবাদিকতা সম্পর্কেও কথা হলো।

পরিশেষে তিনি জানালেন, মাসে আড়াই শ' টাকা দিয়ে আমাদের সংবাদ তিনি নিতে পারেন।

হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক হাজার টাকার আশা নিয়ে আড়াই শ'!

তিনি হাসলেন। বল্লেন, 'বিস্মিত হয়েছেন, না? কিন্তু মনে করুন

আমি আপনার কথাতেই রাজী হলাম। তারপর আমার সামর্থ্যে তা কুললো না। মাসে মাসে বাকী পড়তে লাগলো, অথচ আমার টাকাটা হিসেবে ধরে রেখে আপনারা চলতে লাগলেন। অবশেষে দেখা গেল, আমাদের কপালে জুটেছে বদনাম আর আপনাদের ভাগ্যে বিপর্যয়। তার চেয়ে এই-ই ভালো নয় কি ?'

অবশেষে সাড়ে তিন শ' টাকা ধার্য হলো।

এমনি করে কেটেছে। সারা দেশের বিভিন্ন পত্রিকাগুলির কাছে গেছি। যা আশা করেছি, তা মেলে নি। তবু তারই মধ্য দিয়ে সংগঠন চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। দৃঢ় মজবুত করতে হয়েছে।

সে-বার বোম্বেতে সদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। কী জানি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন আমাকে। হয়তো অসন্তুষ্ট, হয়তো বিরক্ত হয়ে আছেন আমার ওপর। হয়তো রুষ্ট।

কিন্তু তাঁর ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। পুরনো বন্ধুকে অনেকদিন পর কাছে পেয়েছেন, যেন হৃদয়ের কাছাকাছি।

বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। মন খারাপ করার কিছু নেই। তুমি আমার বড়ো ভাইয়ের মতো। সর্বদা তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি। মতের যদি মিল না ঘটে, মনেরও কেন বেমিল হবে ?'

ফ্রী প্রেসের কথা উঠলো। আবার আমার কথা জানালাম। বললাম সংবাদপত্রের সঙ্গে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে চলবে না। চাই পরস্পরের মৈত্রী, বন্ধুত্ববন্ধন।

কিন্তু মনোভাব বদল করেননি সদানন্দ। বললেন, 'তুমি তোমার মতানুবর্তী হয়ে চলো, আমি আমার। কিন্তু হয়তো একদিন দেখবে, তোমারটা ভুল। আমারটা সত্যি। আজ থাকুক সে কথা।'

হৃদয়বান সদানন্দ। জিজ্ঞেস করলেন ইউনাইটেড প্রেসের কথা, সহানুভূতি জানালেন। মাসিক চাঁদার বিনিময়ে আমাদের খবর নিতে রাজি হয়ে মধুর অন্তরঙ্গ হাসি হেসে আমাকে বিদায় জানালেন।

সদানন্দ ভারতীয় সাংবাদিকতা জগতে অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ। বৎসরাধিক কাল পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেছেন। নেপোলিয়নের মতো তাঁর চরিত্র। 'অসম্ভবে' তাঁর আস্থা ছিল না, নিজের প্রতি ছিল অসামান্য প্রত্যয়।

বিদায় নেবার আগে সদানন্দ জানালেন, মার্গারিটা বার্নস আছেন তাজমহল হোটেলে। যদি সময় করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, তিনি খুশী হবেন।

পরদিন মার্গারিটার সঙ্গে দেখা করলাম। যখন তিনি বিলেতে ফ্রী প্রেসের কাজ করতেন, তখন হঠাৎ একদা তাঁর প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম।

আমার একটি বক্তৃতার কিছু অংশ বিলেতের একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সহকর্মীর প্রতি প্রীতিবশে তার কাটিং পাঠিয়ে সুন্দর একটি চিঠি লেখেন।

সেই ফ্রী প্রেস ভেঙ্গে গেছে। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি সারা দেশ। তখনও প্রাক্তন সহকর্মীর প্রতি তাঁর পুরনো সহমর্মিতা অখণ্ড হয়ে মনে রয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই এগিয়ে এসে হাত ধরে বললেন, 'মনে হচ্ছে সহকর্মী হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার কতোকালের পরিচয়।' তাঁর মুখে প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি। কণ্ঠে অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। কিভাবে সদানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয়। কেন তা ভেঙ্গে গেল। কেন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি আমি। নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। নানা খবর জানতে চাইলেন।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আবার তোমরা, তুমি আর সদানন্দ, এক হয়ে কাজ করতে পারো না?'

জানালাম, মতের যেখানে বেমিল, সেখানে সব কাজ শুধু অকাজই হবে।

সদাহাস্যময়ী মার্গারিটা অনেকক্ষণ পর বিদায় দিলেন। মনে হলো যতো প্রশংসা তাঁর শুনেছি, তার থেকে অনেক বেশি গুণবতী তিনি।

যখনই দিল্লী গেছি চার্লস সম্পতির সঙ্গে দেখা করেছি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চার্লস আমাদের সংবাদ নেবার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু সহকর্মী নয়, বন্ধুত্বও ছিল তাঁদের সঙ্গে।

তাঁদের দাম্পত্য জীবনে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ আজো আমাকে বিষণ্নক্ষুন্ন করে। যেখানেই তাঁরা থাকুন, ভারতীয় সাংবাদিকতার এই দুটি অকৃত্রিম সুহৃৎ যেন সুখে থাকেন, এই কামনা।

॥ ১৮ ॥

একটা প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে কোন গুণের গুরুত্ব বেশি? পরিশ্রম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, আর্থিক সহায়তা, না কি নিয়তি? নিয়তির জোরে কেউ কেউ নাকি তর্ তর্ করে উপরে উঠে গেছেন, আবার কেউ নাকি একেবারে ধুলিসাৎ। কিন্তু নিয়তিকে তো দেখতে পাইনে সূর্যের আলোয়, কি ঘুমের ঘোরে, তাহলে কী হাল ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে অপেক্ষা করবো ভাগ্যের দৌড় দেখতে, কোথায় নিয়তি আমাকে নিয়ে যায়, কোথায় তার যাত্রা থামে। কিন্তু খোলা চোখ মেলে প্রতিদিন আমাকে দেখতে হচ্ছে খালি সমস্যা, সমস্যা; অর্থাভাব এবং অসহযোগিতা এবং ঝামেলার জটিলতা। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কাজে ঘুরে মরি, এঁর কাছে যাই, ওঁর দরবারে হাজির হই, সারা ভারতের প্রতিটি সংবাদপত্রের অফিসে সংযোগ রাখি—সংবাদ পাঠাই অথবা সংবাদ পাঠাবার সহমর্মিতা দাবী করি। চিঠির তাড়া পড়ি, জবাব লিখি। আর অসম্ভব অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের তরণী ঠিক মত বেয়ে নেবার কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যাই। নিজের সংসারে নানা প্রয়োজনের হাঁ-মুখ বড়ো হয়ে ওঠে, নানা কর্তব্য এবং বাসনা অপূরণ থাকে অর্থসংকটে। সহকর্মীরাও আত্মত্যাগ করেন। তাঁদেরও চলতে হয় অনেক অসুবিধের মধ্যে।

জানি, ধৈর্য একটা মস্ত গুণ, বড়ো সহায়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। সেই দুঃখময় কালের অনেক পরে, এই সেদিন আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক সভায় অনেকে প্রশংসা করলেন, আমার নাকি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অসাধারণ নৈপুণ্য। মনে মনে আমি হেসেছি। একটা

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এতো কষ্ট, এতো মর্মবেদনা এবং এতো ধৈর্যের প্রয়োজন যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমি অসীম জ্বালা অনুভব করেছি। কিন্তু হার মানি নি ভাগ্যের কাছে, নিরাশ হইনি বহুতর নৈরাশ্যে, তাই হয়তো এগিয়ে যাবার শক্তি পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখার মর্যাদা ও আনন্দ লাভ করেছি। এ যদি গুণ হয়ে থাকে, তাহ'লে এ-গুণই কী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সেই অসাধারণ নৈপুণ্য ?

ইউনাইটেড প্রেস জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে সারা পৃথিবীতে একরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নটা আর দিবাস্বপ্ন বলে মনে হয় না, এভিয়েশন-রেডিও-টেলিভিশনের মিলনে এবং এটম-হাইড্রোজেন বোমার ভীতিতে বিশ্বময় এক রাষ্ট্রের পরিকল্পনাটা কিছু পরিমাণেও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বাস্তব হয়েছে। কিন্তু সেই কালে, প্রায় এক পুরুষ আগে, ভারতবর্ষের বুকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে আছে ব্রিটিশশাসনের নাগপাশ, মহাত্মা গান্ধী মাভৈঃ মন্ত্রের মতো উত্থিত হয়েছেন শোষিত জনসাধারণের মথিত হৃদয়-সমুদ্র থেকে, জাতীয়তাবাদের মধ্যে সকল ভারতবাসীর দেশপ্রেম কেন্দ্রীভূত। দেশপ্রেমের শপথ নিয়ে জন্ম ইউনাইটেড প্রেসের, তাই আমাদের প্রেরণা ছিল জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের প্রতিটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করা নতুন ভারতবর্ষের প্রকাশে অন্যান্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান যেখানে বিদ্বেষপূর্ণ মন নিয়ে এবং ভাঙা তলোয়ার দিয়ে সেই নব-জাগরণকে ঠেকিয়ে রাখতে সচেষ্ট, আমরা সেখানে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের দীনাতিদীন সেবকরূপে তেত্রিশ কোটি জনসাধারণের অভূতপূর্ব জাগরণকে সর্বত্র প্রচারিত করবার সাধনা করেছি।

আমরা জানতাম, আমরা জয়লাভ করবো। তাই একদিনের জন্যও আমাদের কাজে অবহেলা বা নিরানন্দ আসে নি। কিন্তু তবুও ভয় ছিল, আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কি না। তাই কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে আমি যখন কর্তব্যের আহ্বানে উপস্থিত থেকেছি, তখন আরও একটা চেষ্টা করেছি। অবশ্য এই চেষ্টা

থেকে আমি কখনোই বিচ্যুত হই নি। এই চেষ্টাটি হচ্ছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সচেতন করা, তাঁদের সাহায্য ও শুভকামনা অর্জন করা। কেননা, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সেই দুর্যোগপূর্ণ কালের একমাত্র জাতীয় সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আগেই বন্ধুত্ব ছিল, এবার একসঙ্গে প্রবাসজীবন কাটাতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতার খাদে নেমে এলো। তুষারকান্তি ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায়, প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ও রাজকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন আমার সেখানকার সঙ্গী। মাখনলাল সেনের সঙ্গে রাজকুমার চক্রবর্তীর অনেকখানি পার্থক্য স্বভাব চরিত্রে জীবনে, তেমনি কিরণশঙ্করের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের; কিন্তু তবুও আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য নিয়েও সকলে বেশ একটি বিচিত্র ঐকতানের মতো মিশে গিয়েছিলাম।

বোম্বে অধিবেশনে একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বেঁটে খাটো মানুষটি, বয়সে তখনও তারুণ্যের দীপ্তি ঝলমল করছে। বুদ্ধিব্যঞ্জক চেহারা, মুখে সব সময়েই স্মিত হাসির রেখা।

পুণার একটি দৈনিক পত্রের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ছোট্ট একটা টাইপরাইটার মেশিন নিয়ে এসে বসতেন আমাদের ক্যাম্পে, দ্রুত হাতে খট্ খট্ শব্দে টাইপ চলতো, পাতার পর পাতা, কংগ্রেসের রিপোর্ট। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় মন্তব্যও লিখতেন। তারপর টেলিগ্রাম নতুবা লোক মারফত পুণায় তাঁর অফিসে অনতিবিলম্বে লেখাগুলি পৌঁছে দিতেন।

মাঝে মাঝে তাঁর লেখা আমিও দেখেছি। ইংরেজী ভাষার ওপর দক্ষতা ছিল তার, সহজ ইংরেজীতে সুন্দর রিপোর্ট বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর লেখার প্রশংসা করেছি।

কিন্তু আরও বেশী প্রশংসা করেছি সেই লোকটিকে। সহজ আন্তরিকতার একটা মধুর আকর্ষণ জড়িয়ে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে। সহৃদয় হাসি আর স্বচ্ছ পরিহাসে আনন্দমুখর মানুষটি সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর নাম এ ডি মানি।

জীবনটাকে নানা কৃতিত্বের মালা পরিয়ে এখন তিনি ভারতবর্ষের খ্যাতনামা সাংবাদিক। 'সারভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া' পরিচালিত নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্রিকার সম্পাদক। 'অল ইণ্ডিয়া নিউস পেপার এডিটরস্ কনফারেন্সে'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, 'নিউজ পেপার সোসাইটি'র সহ-সভাপতি। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের 'মানবীয় অধিকার সংস্থার' (Human Rights Committee of U. N. O) দু'বছর সদস্যরূপে কাজ করেছেন। পি টি আই-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। প্রেস কমিশনের সদস্য ছিলেন।

মানির একটি বিশেষ গুণ, তাঁর বাকপটুতা। সংবাদপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংঘ-সমিতিতে তিনি আমার সহকর্মী, তাঁর বক্তৃতা বহুবার শুনেছি। সুন্দর বলতে পারেন তিনি, যুক্তির পর যুক্তির বিচিত্র বিন্যাসে তাঁর বক্তব্যটা শ্রোতার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়।

কিন্তু সেদিন বোম্বেতে, সাংবাদিকের ক্যাম্পে দ্রুত টাইপরত অখ্যাতনামা রিপোর্টার 'মানি'কে যে উজ্জ্বল মানবীয় গুণে উদ্ভাসিত দেখেছি আজকাল বহু বিজলীবাতি শোভিত খ্যাতনামা জীবনে যেন সেই আলোক আর দেখি না। রুধিরাশ্রু আচ্ছন্ন জীবনের দুর্গম পথে, সার্থকতার সন্ধান করতে করতে কী একটি প্রাণের বিচিত্র সমারোহ এমনি করেই, আস্তে আস্তে আপনার অজান্তেই পথে পথে রেখে আসতে হয়?

১৯৩৪ ও ৩৫ সাল দেশের রাজনৈতিক জীবনে এক সংকটপূর্ণ অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত জোয়ার ব্রিটিশ-পীড়নের আঘাতে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তরুণ ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ নতুন

পদ্ধতিতে দেশমাতৃকার পতাকা তুলে ধরতে চান, গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও দর্শনের সঙ্গে তাঁদের একটা বিরোধ ক্রমশঃ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কয়েকজন বিপ্লবী নেতা অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে পড়েছেন, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের একটা ঢেউ এসে আঘাত করছে গান্ধীকে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, মিনু মাসানী প্রভৃতি যুব-ভারতের নেতৃবৃন্দ প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে চান, গান্ধীজীর পথে হৃদয়হীন পরশাসনের কঠিন শৃঙ্খলমোচন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা নির্দ্বিধা হতে পারছেন না।

চিন্তাজগতের এই মতান্তরটা যতই গভীর হতে লাগলো, জনসাধারণের মনেও অস্বস্তি ততই ছড়িয়ে পড়লো। যুব-নেতৃত্বের এই দ্বিধা স্বীকার করলেন গান্ধীজী। তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব পথে একাকী চলতে লাগলেন। সত্য, অহিংসা ও পল্লীসংগঠনের দুর্গম পথ তাঁর, এখানে কোন আপস নেই। অহিংসা তাঁর জীবনের পরমধর্ম; শত সহস্র মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে যেতে পারেন তিনি, কিন্তু অহিংসাকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। অহিংসার সঙ্গে সত্যের অমোঘ মিলন, আর এই পথেই তাঁর দুর্গম অভিযাত্রা। এই যাত্রাপথে বৈচিত্র্য, দীপ্তি বা নয়নবিভ্রম সহজ সাফল্য হয়তো পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পথের দীর্ঘ দুঃসহ সাধনা এমন অপরিমিত তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে যেখানে পরাধীনতার শৃঙ্খল নরম মোমের মত গলে গলে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নবীন নওজোয়ানদের সংগ্রামস্পৃহাকে তিনি তাঁদের নিজস্ব পরিক্রমায় যেতে বাধা দিলেন না, কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতৃত্বের পথ থেকে নিজেকে অপসারিত করে নিখিল ভারত খাদি মণ্ডলে নিজেকে নিয়োগ করলেন। কংগ্রেসের চার আনা সদস্যপদও রাখলেন না। পল্লীতে পল্লীতে ধ্বংসোন্মুখ কুটীরশিল্পকে রক্ষা করা ও ভারতের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতাকে নতুন শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করাই হলো তাঁর ব্রত।

এমন সময় জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু যক্ষ্মা রোগে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কমলা ছিলেন নেহরুপরিবারের যোগ্যবধূ, জাতীয় সংগ্রামে তিনি নিজেও যোগ দিয়েছিলেন। এলাহাবাদে গণ-আন্দোলনের এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন, কারাদণ্ডের শাস্তিও জুটেছিল। দেশসেবার যে মহানব্রত সমগ্র নেহরুপরিবারের গৌরব, তিনিও তাঁর যথাসাধ্য সামর্থ্য তাতে অর্পণ করেছিলেন। তাই কমলার পীড়াটা শুধু নেহরুপরিবারের ব্যক্তিগত বেদনার নয়, সমস্ত দেশের পক্ষেই শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কমলা গেলেন সুইজারল্যাণ্ড, জেল থেকে মুক্ত হয়ে জওহরলালও গেলেন সহযাত্রী হয়ে। সারা ভারতবর্ষ একান্ত আন্তরিক কামনা নিয়ে প্রার্থনা করলো, সুস্থদেহে ফিরে আসুন নেহরু দম্পতি। কিন্তু অনেক প্রার্থনাই যেমন সার্থক হতে পারে না, জীবনের অনেক আশা যেমন ব্যর্থ হয়ে যায়, তেমনি একদিন দুঃসংবাদ ভেসে এলো ইউরোপ থেকে, কমলা দেহত্যাগ করেছেন।

নেহরুর জন্য সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানালো সারা দেশ। নেহরুও নিয়ে এলেন দেশের জন্য এক নতুন সম্পদ। তাঁর প্রগতিশীল আন্তর্জাতিকতার বার্তা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে আজ জওহরলাল নেহরু অদ্বিতীয়, অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গৌরবময় আসন দিয়েছেন। এখানে তাঁর জীবনের একটি আশ্চর্য সার্থকতা, বিশ্বশান্তির একটি উজ্জ্বল দীপালোক তিনি। তাঁর এই আন্তর্জাতিকতাবোধের শুরু হয়তো সেই সুদূর কৈশোরকালের হ্যারো বিদ্যালয়ের পরিবেশ। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, কমলার মৃত্যুর পরে সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ তাঁর মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখেছে। ইতালী-জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটরদের শাসন চলছে তখন, সোভিয়েট রাশিয়ায় অভূতপূর্ব সাম্যবাদের আশ্চর্য পরীক্ষা। রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, তেমনি জওহরলালও নতুন প্রেরণা পেলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এলেন জওহরলাল। তিনি ঘোষণা করলেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংগঠনে সোভিয়েট স্বল্পকালের মধ্যে যে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে, ভারতবর্ষকে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস সেই পথে না এগোলে, দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের কল্যাণ আসতে পারে না।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন বসলো উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ নগরীতে। জওহরলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হলেন। জওহরলালের পক্ষে এই সম্মান নতুন নয়, কিন্তু এই নির্বাচনে তরুণ প্রগতিশীল ভারতবর্ষকেই স্বীকার করা হলো। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকেও নেহরু নতুনভাবে সজ্জিত করলেন। সমাজতান্ত্রিক নেতা জয়প্রকাশ, আচার্য দেব, অচ্যুত পটবর্ধন প্রভৃতিকে গ্রহণ করে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন প্রাণস্রোতের বন্যা আনবার চেষ্টা করলেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কৃষকদের মধ্যে সংগঠন, দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং নতুন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তনে যে নির্বাচন আরম্ভ হবে তাতে কংগ্রেসের যোগদান ও প্রতিযোগিতা—এইগুলি ছিল সর্বপ্রধান।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেও ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিক ফৌজ নিয়ে আমি যোগদান করেছিলাম। লক্ষ্ণৌ শহরে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন রাজনারায়ণ মিশ্র। তিনি করিতকর্মা ব্যক্তি, নানাবিধ কাজে সর্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু তবু, তার মধ্যেই, আমাদের থাকা খাওয়া ও আনুষঙ্গিক আরাম-আয়েশের যাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্যে সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

একদিন রাজনারায়ণ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। রাজনারায়ণের কাছে তাঁর সম্পর্কে অনেক খবর শুনলাম। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসীনেতা রফি আমেদ কিদোয়াই-র তিনি

বিশিষ্ট সহকর্মী এবং প্রীতিভাজন। আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে সাংবাদিকতা করছেন।

রাজনারায়ণের ইচ্ছাটাও শোনা হলো। তিনি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য পালন করতে পারছেন না; তাঁর জায়গায় শ্যামাপদকে নিযুক্ত করলে উভয়ত সুবিধা হবে।

শ্যামাপদর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর চেহারায় এমন স্পষ্ট একটা ছাপ আছে যাতে চিনতে ভুল হয় না, তিনি কাজের লোক। যে কোন কাজের ভার নেবেন, তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন।

অল্পদিন পরে শ্যামাপদকে আমাদের সংবাদদাতারূপে নিযুক্ত করা হলো। তারপর দীর্ঘদিন ধরে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারছি কাজে, সমস্যায়, সাফল্যে ও দুর্ভাবনায়। কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের কথা আমি ভুলি নি; সেদিন তাঁর সম্পর্কে আমার যে ধারণা মনে হয়েছিল তা মিথ্যা নয়। অনেকের চেহারা যেমন মরীচিকা সৃষ্টি করে, শ্যামাপদ সম্পর্কে তেমন হয়নি। একজন সামান্য সংবাদদাতা থেকে তিনি উন্নীত হয়েছেন লক্ষ্ণৌ অফিসের সম্পাদকরূপে। তাঁর কর্মনৈপুণ্যে ইউনাইটেড প্রেসের লক্ষ্ণৌ সংবাদ প্রশংসিত হয়েছে, তাঁর দক্ষতায় আমরা গর্বিত।

॥ ১৯ ॥

মহাত্মা গান্ধী বল্লেন, 'গ্রামে ফিরে যাও।' ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক বাস করে গ্রামে, অশিক্ষা অব্যবস্থা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার পঙ্ককুণ্ডে আমাদের কোটি কোটি দেশবাসী জীবনাতিপাত করে। সেখানে যদি আলো না জ্বলে, সেখানে যদি ভয়াবহ দারিদ্র্যের অপনোদন না ঘটে, তাহলে আঙ্গুলে গোনা যায় এই সামান্য কয়টা শহরের দীপ্তি দিয়ে দেশের কী উপকার হবে? তাতে কোটি কোটি গ্রামবাসী জনসাধারণের কী কল্যাণ?'

সেই গ্রামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হলো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো পল্লীর অভ্যন্তরে, অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের বুকের কাছে। লক্ষ্ণৌর পর মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো।

মহারাজ শিবাজীর পদরেণু মাখা মহারাষ্ট্র সমগ্র জাতির পুণ্যভূমি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বীরত্বে উজ্জ্বল ইতিহাস এই ভারতখণ্ডের, নবীন ভারতবর্ষের আর এক সংগ্রামী অধ্যায় এর সঙ্গে যুক্ত হলো।

ফৈজপুরের রিপোর্ট করতে সদলবলে আমি হাজির হয়েছি। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরের শীতকাল।

স্টেশনে পৌছেছি সকাল বেলা। প্রথমেই এগিয়ে এলেন বি জি খের মশায়। অতিথিদের অভ্যর্থনা ও বাসস্থল নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

সৌম্যসুন্দর চেহারা। মুখে শান্ত প্রাণখোলা হাসি। আন্তরিক অন্তরঙ্গতার সুর কথাবার্তায়। বল্লেন, ফ্রী প্রেসের সঙ্গে তাঁর মমত্বময় সংযোগ ছিল আর এজন্যে আমরা তাঁর আত্মার আত্মীয়ের মত।

এক মিনিটেই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম পরস্পর।

বি জি খের খাঁটি গান্ধীবাদী। রাজনৈতিক দীপালোকের মোহ তাঁকে কোনদিন আকর্ষণ করে' নি, যথার্থ জনসেবা ও গ্রামোন্নয়নের মধ্যেই তাঁর সোৎসাহ অনুরাগ। দীর্ঘকাল বোম্বের মুখ্যমন্ত্রীত্ব ও অবশেষে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় হাইকমিশনারের কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সততা ও জনকল্যাণের প্রতি মমতা সম্পর্কে কখনো কোন সন্দেহ জাগতে পারে নি কারোর মনেই।

যখনই বোম্বে গেছি, আন্তরিক প্রীতির টানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থায় বোম্বে গভর্নমেণ্ট আমাদের সংবাদ নেওয়া আরম্ভ করে একমাত্র তাঁরই নির্দেশে।

একদা বোম্বেতে বাঙ্গালীদের এক উৎসবে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। আমার কন্যা প্রতিমা সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিল। তখনকার টেরিফ বোর্ডের সভাপতি ও বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূত শ্রীগগনবিহারী মেটা সে-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে প্রতিমার পরিচয় পেয়ে এগিয়ে এসে তাকে কন্যাস্নেহ জানিয়ে বলেছিলেন আমার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্বের কথা।

সম্প্রতি তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মচক্র থেকে অবসর নিয়ে পুণায় নিরিবিলিতে বাস করছেন। তাঁর জীবন শান্তিময় হোক, তাঁর প্রতি দূর থেকে আমার এই প্রার্থনা।

ফৈজপুর অধিবেশনে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম বাংলাদেশের অনেক সাংবাদিক।

সেই অধিবেশনে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন এক বাঙালী বিপ্লবী নেতা। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নামটা কবে মুছে গেছে, কিন্তু জল জল করছে তাঁর স্বনির্বাচিত নাম, মানবেন্দ্রনাথ রায়। সংক্ষেপে এম এন রায়।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মতো মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া হলো তাঁকে।

তাঁর জন্য সংরক্ষিত রইলো নির্দিষ্ট আলাদা কুটীর; দেশী বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সকলেরই কৌতূহল তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে, সকলেই জানতে চায় তিনি কী কংগ্রেসে কায়মনোবাক্যে যোগদান করবেন।

একজন সাধারণ বিপ্লবীর মত যৌবনের প্রারম্ভে তিনি অস্ত্রের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা তাঁর। বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রায় পৃথিবীর নানা দেশে পরিভ্রমণ করেছেন, ভারতের বিপ্লবের বার্তা দেশেবিদেশে প্রচার করেছেন, সংগঠন করেছেন। তাঁর জীবন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো বিচিত্র। বিদেশী পুলিসের শৃগালচক্ষু থেকে নিজেকে গোপন রেখেছেন, আবার তারই মধ্যে বিপ্লবী অভিযাত্রাও সঙ্কুচিত করেন নি। মেক্সিকোতে তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লব পরিচালনা করেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থায় নেতৃত্ব করেছেন, মহাচীনে সাম্যবাদী বিপ্লবের পুরোধা-অংশ গ্রহণ করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতের বিপ্লবী গণ-আন্দোলনে আবির্ভূত হয়েছেন।

মেক্সিকো, রাশিয়া ও চীনে এম এন রায় যে ঐতিহাসিক ভূমিকা অভিনয় করেছেন, তা একজন বিদেশীর পক্ষে একান্ত অভূতপূর্ব। শুধু অভূতপূর্ব নয়, প্রায় অসম্ভব পর্যায়ের। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে সেই গৌরবময় অধিকার অর্জন করেছিলেন।

এম এন রায় শুধু বিপ্লবী বা কুশলী সংগঠক নন, তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল না। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর এমন উঁচু স্তরের জ্ঞান ছিল যে, মনে হয় সমুদ্রের মতো তা অতলস্পর্শ। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

তাঁর বইগুলিতে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মানুষটির মনীষা ও প্রজ্ঞা ভবিষ্যৎ মানুষদের জন্য সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কার্ল মার্কস্ যেখানে শেষ

করেছিলেন, তারপরে হয়তো একমাত্র তিনিই নতুন কথা সংযোজন করতে পেরেছেন।

ফৈজপুরে এম এন রায় একজন কংগ্রেসের সেবকরূপে যোগদান করেছিলেন। মনে হয়েছিল, তিনি পৃথিবীর বিপ্লবী জয়যাত্রা ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, মাতৃভূমির সেবায় তা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমর্পণ করবেন। কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের খসড়া রচনার জন্য জওহরলাল তাঁকে অনুরোধ করেন। সকলের ধারণা হয়েছিল, পরবর্তী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এম এন রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

নতুন আইন অনুযায়ী সকল প্রদেশে নির্বাচন আসন্ন। স্থির করা হলো, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন, কংগ্রেস সেখানে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে। এসেম্বলী ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় কংগ্রেস কিভাবে জাতির সেবায় সুষ্ঠুভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার আলোচনার জন্য দিল্লীতে একটি কনভেনশন ডাকা হবে বলে নির্ধারিত হলো।

কিন্তু মুশকিল বাঁধলো নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ নিয়ে। আইনানুযায়ী তাঁদের শপথ করতে হবে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে, তাতে ভারতীয় গণসংগ্রামের মস্ত অপমান। কংগ্রেসের চোখে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কটা অধীনতার নয়, অধীনতা উচ্ছেদের। তাই স্থির হলো, আইনসভাতে যোগদানের আগে সকল কংগ্রেসী সদস্য ভারতমাতা ও ভারতবাসীর প্রতি কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করবেন।

দীর্ঘদিনের শহুরে অভ্যাসগুলো গ্রামের নানা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ হতে পারে না। পূর্বেকার অধিবেশনগুলিতে আমাদের খাওয়ার কোন অসুবিধে ঘটে নি, দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর খাদ্যটা সহজেই জুটে যেত, তার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু ফৈজপুরে খাবার ক্যাণ্টিনে একমাত্র কংগ্রেস ডেলিগেটদেরই প্রবেশাধিকার ছিল, প্রেসের লোকেরা

রবাহুত। তাই আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা ছিল আমাদেরই হাতে, একেবারে মুক্তপক্ষ ইচ্ছা স্বাধীন।

কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' আমাদের পক্ষে পরম বিড়ম্বনার মতো। বিশেষ করে আমরা যে কয়জন বাঙালী সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। খাবারের দোকান তো অনেক, সারি সারি বিজ্ঞাপন লাগিয়ে বসে আছে, কিন্তু আমরা দুর্ভাগা বাঙালী মহারাষ্ট্রীয় রান্না মুখে দিই আর অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একদিন মরীয়া হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। বলে গেলেন, 'দাদা, খাবারের একটা ব্যবস্থা করতে পারি তো ফিরবো, নতুবা এই শেষ সাক্ষাৎ।'

লোকটা কি সন্ন্যেসী হয়ে যাবে। মনে আমাদের দুশ্চিন্তা, কিন্তু একটা আশাও জ্বলছে যদি, নিরুদ্দেশ না হয়ে যান তাহলে সত্যেন্দ্রনাথ নির্ঘাৎ খাদ্যের একটা ব্যবস্থা করে ফিরবেন। আমরা সকলে উন্মুখ হয়ে প্রত্যাশা করছি, কখন তাঁর আগমন ঘটে।

ঘণ্টা কয় পরে সতেন্দ্রনাথের উল্লসিত চীৎকার শোনা গেল। আমরা বাঙালী সাংবাদিকরা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরলাম। চার-পাঁচদিনের বুভুক্ষু উদর আর্তনাদ করছে তখন।

'কোথায় গিয়েছিলে দাদা?'

'আরে, ভারি মজার কাণ্ড। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম গ্রামের অভ্যন্তরে। এক মুসলমান বাড়িতে মোরগের সুমধুর কণ্ঠ শুনে সেখানেই গিয়ে হাজির হলুম। বল্লুম, রোস্ট বানিয়ে দাও, পরোটা করে দাও। সে ব্যাটা কি আমার ভাষা বোঝে। কিন্তু উদর-জ্বালা বড় বিষম জ্বালা—'

'আহা, এ কথাটা যদি বুঝতো কংগ্রেসী ডেলিগেটরা।' কে একজন ফোড়ন কাটলো মধ্যপথে।

সত্যেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, 'যা বলেছ। তাই তো প্রতিজ্ঞা করে

বেরিয়েছিলুম, এই ছাই সমস্যার আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করবোই। মুসলমান বাড়িতে মেয়েদের তৈরী মাংস-পরোটা নিয়ে এলুম।'

সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা ঘিরে ধরলাম সকলে। কতদিন পরে মনের মত খাবার খেতে পাচ্ছি। কিন্তু তখনও আমি মুখে দিই নি, অন্য একজন অত্যুৎসাহী মুখ বিকৃত করে সশব্দে মুখে-পোরা মাংস-পরোটা উদ্গীরণ করে ফেল্লেন। 'ছি, ছি, ছি, কেরোসিন।'

বুভুক্ষু উদর লোভ মানে না। আমিও মুখে দিলাম সত্যেন্দ্রনাথের সংগৃহীত খাদ্য। কিন্তু নাভিমূল থেকে উৎসারিত হয়ে নেমে এলো একরাশ অশুচি বমি। 'আরে এ যে কেরোসিনের।'

সত্যেন্দ্রনাথ তখন সুগভীর নৈরাশ্যে নির্বাক স্তব্ধ। আমাদের এমন আশাভঙ্গ বোধহয় কদাচিৎ ঘটেছে।

কিন্তু তবু একটা কথা আমি ভুলি নি। মহারাষ্ট্র আমার ভালো লেগেছিল। বাল্যকালে ইতিহাসের পাতায় আর রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসে যে মারাঠা গৌরবকাহিনী মনের মধ্যে প্রেরণার আলো ফেলেছিল, সেই অতীতকে আজ কিছুতেই ছুঁতে পারিনে। কিন্তু মারাঠী শ্রমিককৃষক স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কর্মকুশল দেহ দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছি। এই শস্য-শ্যামল দেশের হাস্যময় কৃষকদের দেখে একটা গভীর আনন্দ অনুভব করেছি। কাছা দিয়ে শাড়ি পরা, আঁট কাঁচুলি বাঁধা মেয়েদের কাজকর্মে পরিশ্রমে এমন একটা সানন্দ পরিমণ্ডল আছে, যা আমার বহু দেশ-দেখা চোখে কখনো নজরে পড়ে নি।

সেই দেশের খাদ্য আমি মুখে দিতে পারি নি, কিন্তু সেই দেশকে নমস্কার।

ব্রিটিশ-পরাধীনতার আইন অমান্য করেছে কংগ্রেস, কিন্তু এবার আইন-সভায় প্রবেশ করে শাসনতার গ্রহণ করলো। নির্বাচনে সাতটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায়, মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য গবর্নররা কংগ্রেস দলপতিদের অহ্বান করলেন।

দেশের সর্বত্র একটা উত্তেজনা, একটা আনন্দোচ্ছ্বাস বয়ে গেল। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীমহলে দ্বিধা ও সংকোচেরও সীমা নেই। এই সংকুচিত ক্ষমতা বা ক্ষমতার প্রহসন হাতে তুলে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দেশের কী কল্যাণ সাধন করতে পারবেন।

নবনির্বাচিত কংগ্রেসী মন্ত্রিদের মোটর এসে থামলো গভর্নর প্রাসাদের সামনে। শপথ উচ্চারিত হলো। সেক্রেটারিয়েট ভবনগুলির মধ্যে মন্ত্রীদের নির্দিষ্ট কক্ষ জ্বল জ্বল করতে লাগলো।

খবরের কাগজে ব্যানার দিয়ে সংবাদ, মুখরোচক রটনা।

জনসাধারণ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে।

কিন্তু সাত মাসও কাটল না, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সংঘর্ষ চরমে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ পদত্যাগপত্র পেশ করলেন গভর্নরদের সমীপে।

পদত্যাগ করে তাঁরা সোজা এসে উপস্থিত হলেন হরিপুরা।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কর্মভূমি হরিপুরা, বার্দোলী তালুকের একটি অপরিজ্ঞাত নাম। সেই নামটি ইতিহাসে যুক্ত হলো। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছে। বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করবেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের সুখ-স্বপ্নটা ভেঙে গেল। জনসাধারণ স্পষ্ট বুঝলেন, দেশের প্রতিনিধিদের নিকট শাসনভার অর্পণের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিটা একটি ভিত্তিহীন মরীচিকা মাত্র। গভর্নরদের কাছে আবেদন উপস্থিত করারই মালিক মন্ত্রীরা, শাসনভার চালাবার অধিকারী নয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সংঘর্ষটা তুমুল হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রিবর্গ দাবী করলেন, বন্দীদের সসম্মানে মুক্তি দিতে হবে।

গভর্নররা রুখে দাঁড়ালেন। দাসানুদাস সি আই ডি-দের রচিত নথিপত্র খুলে বল্লেন, বন্দীরা হিংসাত্মক অপরাধের গুরু মাতব্বর' তাঁদের ছেড়ে দিলে দেশ রসাতলে যাবে।

মন্ত্রীদের নির্দেশ অমান্য হলো। বোঝা গেল, মন্ত্রীরা কেবল উপদেশ জানাবার অধিকার পেয়েছেন কিন্তু শাসনের প্রত্যেকটি রজ্জু গভর্নরদের হাতে। সে হাত নির্মম নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। বত্রিশটি বলিষ্ঠ বলদের টানা রথে সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে শোভাযাত্রা করে আনা হলো সভামণ্ডপে। ব্রিটিশের প্রবলপরাক্রান্ত শত্রু, জনসাধারণের বীর বামপন্থী নেতা।

ইউরোপেও তখন রাজনৈতিক জগতে কুটিল মেঘ জমে উঠেছে। ইতালী ইথিওপিয়া গ্রাস করেছে, হিটলারের মুখে রণংদেহী হুঙ্কার। মহাযুদ্ধের আসন্ন ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে, সারা বিশ্বে নতুনতর আতঙ্ক, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মারণাস্ত্র প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা।

সুভাষচন্দ্র বল্লেন, ভারতবর্ষ চারদিকের এই যুদ্ধসজ্জা সমর্থন করে না, যুদ্ধের ডামাডোলে ভারত নিরপেক্ষ। ভারতের পক্ষে কোন কথা বলার অধিকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নেই। সে অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

ব্রিটিশ সরকার শশব্যস্ত হয়ে জনসাধারণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লেখার স্বাধীনতা খর্ব করলেন। মহাযুদ্ধের পাপচক্রে ইংরেজের বশংবদ ভৃত্যের ভূমিকায় ভারতকে দাঁড় করিয়ে রাখবার কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখলো না ব্রিটিশ।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি বা 'জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সমিতি' স্থাপন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তার সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তারই ভিত্তিতে আজ স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র। গুরুর মতো মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষেরও বহুক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল। যুবভারতের আদর্শ, চাঞ্চল্য ও আপসহীন সংগ্রামী মনোবৃত্তিতে তিনি সমুদ্রের মতো ঊর্মিমুখর, বামপন্থী কংগ্রেসের তিনি অবিসম্বাদী নেতা।

এমন সময় নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশন বসলো জলপাইগুড়িতে। সুভাষচন্দ্র সেখানে ওজস্বিনী ভাষায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জীবনপণ গণ-আন্দোলনের আবেদন জানালেন। বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ হলো যে, ছয় মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করে তাহলে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে জনসাধারণের সেই মহৎ অধিকার অর্জন করতে হবে।

দেশের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। আপসহীন আন্দোলনের বাণী প্রচারিত হতে লাগলো নানা দিগ্‌প্রান্তে, ভারতের নানা অভ্যন্তরে সংগ্রামের প্রবল তৃষ্ণা জাগরিত হতে লাগলো।

কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম সহ্য হলো না রুগ্ন দেহের, সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখটা গুরুতর। ঝরিয়াতে শরৎবাবুর ছেলের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসা চলতে লাগলো।

এই সময় ত্রিপুরাতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসবে।

মহাত্মা গান্ধী চাইলেন দেশের এই দুর্যোগকালে তাঁর একজন বিশ্বস্ত শিষ্যের উপর কংগ্রেসের ভার থাকুক। সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহী, গণবিপ্লবী।

মহম্মদ আলী জিন্নার হিন্দুবিদ্বেষটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। হিন্দুরা সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করতে উদ্যত, জিন্নার এই আর্তনাদ তখন ব্রিটিশের পক্ষপাতিত্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভারতের গণ-আন্দোলন বিপন্ন ; জিন্না সারা দেশের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন 'ইসলাম বিপন্ন, মুসলমান জাতি বিপন্ন, মোল্লা মৌলবী ভাইসব হুঁশিয়ার !'

মহাত্মা গান্ধী চাইলেন যে, এই সংকটে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসের কর্ণধার হউক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম তিনি প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র মনে করলেন, দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে ভারতের দিগন্তে, এই বিপদে একজন বামপন্থীর হাতে কংগ্রেস পরিচালনার ভার

না থাকলে গণজাগরণ ভ্রান্ত পথে চলবে। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর অনেক কাজ অসমাপ্ত তাই তিনি পুনর্বার সভাপতি পদে মনোনয়ন প্রত্যাশী।

কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র। একদিকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী পুরোধা, অন্যদিকে যৌবনের প্রতীক, গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিবিম্ব, আপসবিরোধী সংগ্রামের অনির্বাণ শিখা।

মৌলানা আজাদ জানালেন যে, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নহেন। সুভাষ তাঁর স্নেহের পাত্র, সুভাষের প্রতি তিনি প্রশংসমান। ওয়ার্ধায় যে মিটিং বসেছিল, সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন।

মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়ন পড়লো ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার উপর। গান্ধীবাদের সৈনিক, গান্ধীর বিশ্বস্ত ভক্ত।

কংগ্রেসে তুমুল উত্তেজনা। প্রথম সভাপতির পদ নিয়ে নির্বাচন আরম্ভ হলো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর উল্লাস, চারদিক থেকে সুভাষচন্দ্র অভিনন্দনবার্তা পেতে লাগলেন।

এমন সময় হঠাৎ মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, তাঁর প্রার্থীর পরাজয় তাঁর নিজেরই পরাজয়।

কথাটা বজ্রাঘাতের মতো আঘাত করলো কংগ্রেসকে। মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে কল্পনা করা যায় না। তাই গান্ধীর পরাজয় কথাটা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে গান্ধীকে হারাবার একটা আশঙ্কা দেখা দিল। পূর্বে যাঁরা সুভাষকে চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকে এবার অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

তাই ত্রিপুরীতে যখন কংগ্রেস অধিবেশন বসলো, তখন ডেলিগেটদের শিবিরে শিবিরে মহা উল্লাস, প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা। মহাত্মা গান্ধী, না সুভাষ বোস?

মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরী অধিবেশনে যোগদান করেন নি। রাজকোট দেশীয় রাজ্যে মহারাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, মৃদুলা সারাভাই ও মণিবেন প্যাটেল। মহারাজ তাঁদের বন্দী করেন। পরে জেলের অভ্যন্তরে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে মহারাজ সাক্ষাৎ করেন এবং একটা মীমাংসার শর্ত উভয় পক্ষ গ্রহণ করেন।

কিন্তু সে চুক্তি অনতিবিলম্বে ভঙ্গ করলেন মহারাজ। প্রজাদের আন্দোলন নির্মম নিষ্পেষণে চুরমার করতে চাইলেন, অজস্র কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে প্রেরিত হলো।

মহাত্মা গান্ধীর পিতা রাজকোটের দেওয়ান ছিলেন। তাই রাজকোটের সঙ্গে গান্ধীর মর্মগত একটা গভীর সংযোগ ছিল। রাজকোট রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দিলেন। ঠিক এই অনশনের সময়েই ত্রিপুরী কংগ্রেস, গান্ধীর যোগদান তাই অসম্ভব হয়ে পড়লো।

সমগ্র দেশের মহাদুর্যোগের সামনে রাজকোটের সমস্যাকে এতো বড়ো করে দেখার জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটা অভিমানের সুর দেখা দিল বামপন্থী মহলে।

সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দিলো যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য একযোগে এই সময়ে পদত্যাগ করলেন। কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি ও সদস্য থাকলেন শরৎচন্দ্র বসু। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনও একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

সুভাষচন্দ্র তখন প্রবল পীড়ায় কাতর, উত্থানশক্তি রহিত। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না; দেশের দুর্দিনে হাল ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রইলেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটা প্রস্তাব পাশ করতে চাইলেন যে, কংগ্রেস পূর্বেকার নীতি অনুযায়ী চলবে।

সভায় গুরুতর গোলমাল দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্ঘবদ্ধ

প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার সামনে একাকী দাঁড়াতে পারলেন না সুভাষ, অবশেষে তিনি পদত্যাগ করলেন।

কলকাতায় এপ্রিল মাসে এ আই সি সি'র পুনরধিবেশন বসলো। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি মনোনীত হলেন।

ত্রিপুরীর ঘটনা কংগ্রেস ইতিহাসের একটি উত্তেজনামুখর পরিচ্ছেদ। কলকাতার অধিবেশন নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অসম্মানের ঘটনায় পরিপূর্ণ; তথাপি রাজেন্দ্রপ্রসাদ শান্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ জয়লাভ করলেন, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তখন মহাসমরের পুঞ্জীভূত মেঘ জমে উঠেছে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে পোল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

॥ ২০ ॥

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ রাজনৈতিক জগতের একটি উত্তেজনাময় ঘটনা, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও এই ঘটনা ক্ষতিকর। সুভাষচন্দ্রকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে দেখেছি আমি, সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে পদত্যাগপত্র দিয়ে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেছিলেন। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ইউ পি আই-এর মাধ্যমে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্ধানের মাত্র কয়দিন আগেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছিলাম।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না যে, সেদিনের সেই রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

তিনি জীবিত থাকুন; শত সহস্র বৎসর তিনি জীবিত থাকুন এই ভারতবর্ষে। বীরত্বে, বীর্যে ও দুঃসাহসের প্রেরণায় যুগে যুগে তিনি ভারতীয় মনের ক্লান্তি ও ভয়ের মেঘ ভেঙে অনন্ত প্রেমের সৃষ্টি করুন। দুর্যোগের দিনে বার বার তাঁর জন্ম হোক ভারতবাসীর মনে মনে, তরবারির আঘাত দিয়ে অসত্যের গ্লানি পরাভূত হয়ে যাক।

ইউনাইটেড প্রেসের জন্মকালে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে আমি এইরকম জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও শুভকামনা যাচ্ঞা করেছি। কেউ কেউ বোঝার অবকাশই গ্রহণ করেন নি।

অথচ দেশে তখন ইউনাইটেড প্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, দেশের সংবাদ দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে সর্বত্র প্রচারিত করছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে এইরকম প্রতিষ্ঠান একান্ত অপরিহার্য। সাংবাদিকতার পক্ষে তো বটেই।

অথচ আমাকে বহুক্ষেত্রে নিরাশ হতে হয়েছিল। অথবা কেবলমাত্র বাক্যাড়ম্বরের চমকপ্রদ কূজন শুনেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তার ব্যক্তিক্রম। প্রথম থেকেই সুভাষ আমাদের সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন।

বহুদিন পর্যন্ত তাঁর সব বিবৃতি কেবল আমাদের উপরই প্রকাশের ভার ছিল। যখন অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় অবস্থান করেন, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর অনেক বিবৃতি এয়ার মেলযোগে আমাদের নিকট পাঠাতেন।

সুভাষচন্দ্রের এই সাহচর্যের ফলে ব্রিটিশ সরকারের একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমাদের উপর চিরকালই ছিল। আমরা যখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে এ পি'র মতো সংবাদ সরবাহ করতে চাইলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্যর মরিস হ্যালেট তাতে বাধা দিলেন। বড়লাটের কাছে দরবার করেও কোন ফল হয় নি।

সেই সময় একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আমাদের বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁর নাম এস এন এ জাফ্‌রী, তিনি কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। আমাদের সংবাদ পরিবেশনা ও কর্ম দক্ষতায় তিনি বিশেষ প্রীত ছিলেন এবং তাঁর একটা সহানুভূতি সর্বদাই আমাদের প্রতি করুণাধারার মতো ছিল সংবাদপত্র সম্পাদক ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে রেলওয়ে পাস দেবার রীতি অনেকদিনের, এ পি'র ছিল দু'টো পাস। আমরা একটি পাসের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আবেদন জানাই। সেই সময় জাফ্‌রী সাহেব আমাদের খুব সাহায্য করেন।

আমাদের আবেদনপত্র সঙ্গে সঙ্গে না-মঞ্জুর হয়েছিল। স্যর মরিস জবরদস্ত ব্যক্তি, তিনি আমাদের আবেদনপত্রের শিরে রিপোর্ট লিখেছিলেন যে, আমরা নাকি সাংঘাতিক জীব, বিপ্লবীদের ও সন্ত্রাস-বাদীদের প্রচারকার্য করাই আমাদের জীবিকা।

জাফ্রী সাহেব আমাদের অভয় দিলেন। বল্লেন ভয় কী, স্যর জাফরুল্লা খান আছেন। স্যর জাফরুল্লা তখন কেন্দ্রীয় সরকারেরর রেলওয়ে মন্ত্রী। অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ও সাহসী ব্যক্তি।

জাফ্রী সাহেবের সঙ্গে গেলাম জাফরুল্লা খানের নিকট। তিনি পরামর্শ দিলেন নতুন করে আবেদনপত্র পাঠাতে এবং একটি কপি যেন তাঁর নিকট পাঠাই, তিনি তাতে রেলওয়ে বোর্ডকে পাস মঞ্জুর করবার জন্য লিখে দেবেন। অবশেষে তাই হলো, স্যর মরিস সাহেব আর অগ্রসর হতে পারলেন না।

সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, তখনও আমাদের আর্থিক অনটনটা স্বচ্ছলতার দিগন্ত কেটে যেতে পারে নি। তাঁকে আমাদের ভিতরের খবর খুলে বলতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এবং বহু ধনী কংগ্রেসীকে আমাদের শেয়ার কিনবার পরামর্শ দেন। তাতে কিছু ফল পাওয়া গিয়েছিল।

সুভাষকে যাঁরা আপ্রাণ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে লালা শঙ্করলাল ও বোম্বের নাথালাল পেরেক উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা যখন চরমে উঠে যায় তখন এই দুই ব্যক্তি সুভাষের পার্শ্বে সর্বদা ছিলেন। লালা শঙ্করলাল তাঁর ব্যবসা থেকে তখন অনেক অর্থ তুলে বামপন্থীদের জন্য ব্যয় করেছেন। নাথালাল পেরেকও বহুতরভাবে সাহায্য কররার জন্য ব্যগ্র থাকতেন। বোম্বেতে সুভাষ বা শরৎবাবু গেলে তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করতেন। দিল্লীর ঐতিহাসিক আই এন এ বিচারের পর নাথালাল পেরেক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহযোগিতায় সুভাষজীবনের নানা ঘটনাবলী দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেন এবং আই এন এ রিলিফ ফাণ্ডে চিত্রটি উৎসর্গীকৃত হয়। এই দুই ব্যক্তির কাছে সুভাষের অনুরোধ অনুযায়ী কিছু সহানুভূতি পেয়েছি।

এ ছাড়াও সুভাষ আমাদের জন্য অনেক কিছু করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে প্রত্যেক কংগ্রেসী প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের সাহায্য করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী বিরোধিতার ফলে তাতে খুব কাজ হয় নি।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ (এখন পর্যন্ত) তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধানের ৪।৫ দিন আগে তাঁর বাড়িতে। সুভাষের ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ আমাকে সংবাদ দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যান।

গিয়ে দেখি সুভাষ বসে আছেন। অসুস্থতার জন্য কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন, তখনও অসুস্থতার স্পষ্ট প্রকাশ ছিল দেহে। মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়েছে, চেহারা খুব মলিন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর যেমন রোগজীর্ণ ক্লান্ত রূপ ছিল, তখনও যেন অনেকটা তেমনি। কিন্তু দু'টি চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি।

বেশি কথা বলে তাঁকে বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় নি। তিনি বল্লেন, যে-পথে কংগ্রেস চলেছে তাতে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত। এই যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ চারদিকে ব্যতিব্যস্ত, এখনই মস্ত সুযোগ। চরম আঘাত দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার এমন পরম লগ্ন খুব কম পাওয়া যাবে।

বেশিক্ষণ কথা হলো না, ফিরে এলাম। আশা ছিল সুস্থ হয়ে তিনি দেশের কর্ণধার হবেন।

কিন্তু কয়দিন পরেই পরমাশ্চর্য খবর শোনা গেল। সুভাষ নিরুদ্দেশ। তাঁর বাড়ির সামনে সতর্ক পাহারায় পুলিস সর্বদা মোতায়েন ছিল, সি আই ডি ডিপার্টমেণ্টও শ্যেনচক্ষু মেলে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। সর্বদা সর্বক্ষণ। কিন্তু তবু, কোথায় গেছেন, কখন গেছেন, কেমন করে গেছেন—কেউ বলতে পারে না, কেউ জানে না।

বাংলাদেশের শাসনচক্রের মাথায় তখন স্যর নাজিমুদ্দিন। তাঁর সরকার কুকুরের মতো চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো, ভারত সরকারের সমস্ত পুলিস বিভাগ সারা ভারত ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছত্রখান করে

দেখতে লাগলো। কিন্তু যে মুক্ত স্বাধীনপ্রাণ বাঙালীর ঘরে দৈববলে জন্মগ্রহণ করেছিল, কে তাকে খুঁজে পাবে।

কলকাতা জেটি, প্রতিটি সীমান্ত অঞ্চল, পণ্ডিচেরী, হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য পথে সরকারের বিশ্বস্ত ভৃত্যরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঠিকানা কেউ জানে না।

বার্লিন বেতারে তিনি যখন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন, কেবলমাত্র তখনই জানা গেল যে, তিনি ইংরেজের বিষম বৈরী অক্ষশক্তিতে যোগদান করেছেন।

বীর্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতার প্রতীক। মাতৃভূমি থেকে অন্তর্ধান করে তিনি চলে গেলেন দক্ষিণ প্রাচ্যে। গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং 'আজাদ হিন্দ্ সরকার'। আক্রমণ পরিচালিত হলো ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে। 'দিল্লী চলো' এই মন্ত্র আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে।

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' গঠন সংবাদ প্রকাশ্যভাবে জগতে ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন :

"ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন। আজ ঈশ্বর আমাকে এই কথা ঘোষণা করার সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছেন যে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সেনাদল গঠিত হয়েছে! আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্বদা আপনাদের আশে-পাশে থাকব; বর্তমানে আপনাদের আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুঃখকষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দিতে অসমর্থ!'

ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর সংগ্রাম হয়তো পরমবিজয়ে সার্থক হতে পারে নি—কিন্তু তিনি তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। যুগ-যুগান্তে সুভাষের মতো বীরপ্রাণ পুরুষের জন্ম খুব বেশি হয়

না। তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানান আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এখনও যথার্থ সত্য নিরূপিত হয় নি। জানি না তিনি বেঁচে আছেন কি না, কিন্তু একথা সত্য যুগে যুগে তিনি ভারতের মনে বেঁচে থাকবেন, দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগিয়ে রাখবেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

জওহরলালের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় কবে ও কখন হয়েছিল, সে কথা আজ সঠিক মনে পড়ে না। সাংবাদিকের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার সম্পর্কটা দিনরাত্রির, দেখা হলে তো বটেই, দেখা না হলেও তাঁদের আমরা নানা সংবাদের মধ্যে স্পষ্ট চিনতে পারি। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন সম্পর্কে আমার উচ্চাশা ছিল এবং প্রায় এক যুগ আগে ব্রিটিশ শাসনকালেই আমি বিলেতের খবরের কাগজে প্রকাশ করেছিলাম যে, স্বাধীন ভারতে অথবা ডমিনিয়ন স্টেটাসযুক্ত ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেদিন আমার এই কথা নিয়ে নানারকম মতদ্বৈধতা উঠেছিল, কিন্তু ইতিহাস আমার ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছে যথার্থভাবে।

জওহরলাল কলকাতায় এলে আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অবস্থান করতেন। একদিন ডাঃ রায়ই বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, নানা ব্যস্ততার মধ্যে কুশল প্রশ্ন করেছেন। আমি মাঝে মাঝে বিশেষভাবে ইউনাইটেড প্রেসের কথা তাঁকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু তেমন অবসর খুব কমই ঘটেছে। সর্বদা তিনি ব্যস্ত, নানা সমস্যার তিনি প্রতিক্ষণ ভাবনার রাজ্যে সমাসীন।

জহওরলালের মধ্যে দু'টি পৃথক সত্তা এসে মিলেছে। একটি তাঁর তীব্র সংবেদনশীল আত্মাভিমান, অন্যটি সৌন্দর্যবিভোর আত্মসমাধিস্থ মনোভাব, সর্বদা যেন তিনি চিন্তা রাজ্যে বাস করছেন, দু'টি চোখে সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি। যেন মনের মধ্যে এমন আশ্চর্য মৃগনাভি রয়েছে যে, প্রতিমুহূর্তে তিনি তা উপভোগ করছেন। অথবা যেন সর্বদা ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন।

সে স্বপ্ন সার্থক হতে দেরি হচ্ছে বলে মাঝে মাঝে তাঁর চাঞ্চল্যের সীমা থাকে না, মেজাজটা রুক্ষ হয়ে যায়, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

সামান্য দেখায় তাঁকে চেনা যায় না। তাঁকে চিনতে গেলে তাঁর সাহিত্য ও সৌন্দর্যভরা তুষারসিক্ত শৈলবিহারী মনের সন্ধান করতে হয়। সে মনের ছাপ আছে তাঁর রচনায়, তাঁর গ্রন্থে, তাঁর আত্মজীবনীতে, তাঁর 'ভারত-আবিষ্কারে'। সেই মনকে জানতে না পারলে তাঁর সম্পর্কে বিচার করা প্রায়ই মারাত্মক হবে। একদা এক সাংবাদিক সম্মেলনের পরে ডাঃ রায়ের বাড়িতে এবং আরেকবার বোম্বে শহরে কৃষ্ণা হাতীসিং-এর গৃহে জওহর-লালকে সুমধুর ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত দেখেছিলাম। স্নিগ্ধ হাসি, প্রাণখোলা শিশুর মতো আনন্দ চপলতা। সেই সুযোগে ইউনাইটেড প্রেসের কঠোর সংগ্রাম ও স্বদেশসেবার কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি মন দিয়ে আমার কথা শোনেন এবং তাঁকে একটি পরিকল্পনা পাঠাতে বলেন। কিন্তু পরি-কল্পনাটি পাঠাবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি জেলে বন্দী হন, দেশের রাজনৈতিক চক্রাবর্ত দ্রুত ঘুরে চলে, ঘটনাপ্রবাহের বন্যা নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই কালের আবর্তে আমার পরিকল্পনাটিও কখন ভেসে গেছে, জওহরলাল বা আমি কেউ-ই খেয়াল করতে পারি নি।

জওহরলালও সুভাষচন্দ্রের মতো তাঁর সব বিবৃতি ও প্রচার আমাদের মারফত করতেন। স্বাধীন ভারতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে বর্তমানে অবশ্য নানা কারণে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তথাপি আমি নিঃসন্দেহে জানি, আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দরদ তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৩৬ সালের প্রথমদিকে পণ্ডিত নেহরু বার্মা-মালয়-মণিপুর ভ্রমণ করে আসেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় করা ও সেখানে কংগ্রেসের বাণী প্রচারই ছিল তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য। সেই সময় ভাহামনকার নামক একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লণ্ডন থেকে আমাদের বিদেশী সংবাদ পাঠাতেন। তিনি একটি সংবাদ পাঠান যে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী একটি পত্রিকায় পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ

করবার জন্য কংগ্রেসকে পীড়াপীড়ি করছেন কিন্তু গান্ধীজী রাজী হচ্ছেন না।

আমি যখন এই সংবাদ পাই, তখন পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণান্তে নেহরু এসে উঠেছেন কলকাতায়, ডাঃ রায়ের বাড়িতে। আমি গিয়ে এই সংবাদটি দেখিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রার্থনা করলাম।

তিনি একটু হাসলেন। তারপর নিজের ঘরে আমাকে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল্লেন। কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজের হাতে সংবাদটির প্রতিবাদ লিখে আমার হাতে দিলেন। আমি বল্লাম, impressionটি লিখে দিন।

তিনি বল্লেন, তাঁর হাতে এখন সময় বড় অল্প। কিছুদিন পরে লিখে পাঠিয়ে দেবেন।

এলাহাবাদ যাবার পথে তাঁর impressionটি লিখে ট্রেন থেকেই ডাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ ছিল, আমাদের সমস্ত শাখা থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতের সর্বত্র যেন ইহার প্রচার করা হয়। এই নির্দেশটি তাঁর সহৃদয় মনেরই পরিচয়। কেননা, তারযোগে তৎক্ষণাৎ সেই লেখার সর্বাংশ পাঠাতে আমাদের অত্যধিক খরচ পড়ে যেত।

১৯৪২-এর মে-জুন মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। তখন আমাদের বোম্বে শাখার সম্পাদক শ্রী জে এম দেব জওহরলালকে নানা প্রশ্ন করে সংবাদ বার করার চেষ্টা করতেন। প্রথমে জওহরলাল বিরক্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে আবার ডেকে উত্তর দিতে শুরু করতেন। কথায় কথায় নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ হয়ে যেত। অনেকটা রহস্যের মতো করেই তখন তিনি হাসতেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নানা সংবাদ প্রত্যহ সম্পাদনা করে টেলিপ্রিন্টারযোগে পাঠাই। তাঁর বক্তৃতা, অভিভাষণ,

ঘোষণা। অক্ষরের পর অক্ষরের মালায় নামটি জ্বল জ্বল করতে থাকে। কিন্তু আমি সেই অক্ষরের পাহাড় ভেদ করে তাঁর একটি ছবি দেখি।

নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের শেষে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আসরে দিল্লীতে সমবেত হয়েছি। ভারতের নানা দিগ্‌প্রান্ত থেকে নানা সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ এসেছেন। ভারত সরকারের কয়জন মন্ত্রীও আছেন ভোজন আসরে। শ্রীজওহরলাল নেহরু মধ্যমণির মতো উপস্থিত।

আমি তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ইউনাইটেড প্রেস কেমন বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাচ্ছে, তাঁকে তা বিস্তৃতভাবে খুলে জানালাম। একটি সিগেরেট উপহার দেওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করলেন। ছু'ঠোঁটের মাঝখানে সিগেরেটটি রাখা হয়েছে, আমি দেশলাই জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

একটি দেশলাই কাঠি জ্বলছে। তার আলো গিয়ে পড়েছে জওহর-লালের মুখে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগেরেট। একটি ক্ষণের জন্য তাকিয়ে দেখলাম, দূরপ্রসারিত তার দৃষ্টি। গভীর অভিনিবেশ সহকারে কী ভাবছেন।

কিন্তু এ চেহারা তো শিল্পীর। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মধ্যে সেই দুর্লভ চেহারা আমি রাশি রাশি অক্ষরমালায় রোজ দেখি।

॥ ২১ ॥

পাটনাতে অফিস খোলা হলো ইউনাইটেড প্রেসের। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মশায় এই অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ফণীন্দ্রনাথের জীবন বিচিত্র ঘটনায় উর্মিমুখর। উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে বিহারে, সে সময়ই চরমপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। একজন অসমসাহসী বিপ্লবীনেতা রূপকথার বীরের মতো সে সময়ে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশ মান্য করে ফণিবাবু দুর্গম পথের অভিযাত্রিরূপে মাতৃভূমির তমসাবৃত রাত্রি লঙ্ঘন করার দুঃসহ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

বিপ্লবী কর্মচক্রের সঙ্গে সাংবাদিকতার সাধনাও তাঁর সে সময়েই। বয়স যখন যৌবনের দীপ্তরাগে রঙীন, সেকালে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপ্লববাদের তূর্যনাদে পত্রিকাটির প্রতি অক্ষর ছিল বহ্নিময়; তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল এই আগুনে রক্তক্ষরা। পুলিসের সদাসতর্ক দৃষ্টি তাঁর পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করতো। কিন্তু বিপ্লবী দলটি পুলিস থেকেও চতুর। একবার পুরো দলটিকে গ্রেপ্তার করার ফন্দি আঁটে পুলিস, ষড়যন্ত্রের নানা জাল ছড়িয়ে রাখে। কিন্তু আগেই খবর পৌঁছে যায় বিপ্লবীদের কাছে। যখন পুলিস এলো সাফল্যের গর্ব নিয়ে, এসে দেখে নীড় ভাঙা, সব পাখি উড়ে গেছে। ফণিবাবুরা সকলেই আত্মগোপন করেছেন। নৈরাশ্যপীড়িত পুলিসবাহিনী প্রস্থান করলো আত্মদংশন করতে করতে।

কিছুকাল পরে ফণিবাবু এলেন কলকাতায়। বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জি, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন-পন্থী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন এখানে।

তখনকার দিনে বিপ্লববাদের পুরোধা পত্রিকা ছিল 'যুগান্তর'। বারীন ঘোষ মশায় পরিচালনা করতেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিরন্তর শঙ্খনাদ ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায়। অতুলনীয় অগ্নিময়ী ভাষায় পরাধীনতার জ্বালা ছড়িয়ে দেওয়া হতো। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'যুগান্তর' স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। মৃত্যুপণ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান করেছিল 'যুগান্তর' সেই আহ্বানের মধ্যে এমন এক নির্ভয় নিঃশঙ্ক উন্মাদনা ও বৃহত্তর জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল যে, এই পত্রিকার প্রতিটি পাঠকের দেহে রোমহর্ষক শিহরণ বয়ে যেত। ফণীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রিণ্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তখন 'যুগান্তরের' প্রিণ্টারস্ কলমে সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। রাজদ্রোহের অপরাধে ফণিবাবু যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন সম্পাদকের নাম প্রকাশ করার জন্য তাঁর ওপর অমানুষিক পীড়ন চালানো হয়েছিল। কিন্তু অবিচলিত রইলেন ফণীন্দ্রনাথ, সম্পাদকের নাম কিছুতেই প্রকাশ করেননি। প্রথমে তাঁকে রাখা হলো প্রেসিডেন্সী জেলে, তারপর স্থানান্তরিত হলেন হাজারীবাগ জেলে। অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন তিনি, যা অন্যায় বলে মনে করতেন প্রাণ গেলেও তা মানতে পারতেন না। রাজার অভিষেককালে অনেক রাজনৈতিক বন্দী মুচলেকা দিয়ে মুক্তি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মাথা নত করবেন না কিছুতেই। মুক্তির আবেদন জানানো তো বাতুলকল্পনা।

জেল থেকে মুক্তিলাভের পর কলকাতায় ফিরে জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন তিনি। রাষ্ট্রগুরুর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি, তিনি তাঁকে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মুদ্রণবিষয়ে কর্তা নিযুক্ত করেন। পুলিসের সতর্ক প্রহরা সর্বদা ছায়ার মতো তাঁর অনুসরণ করতো, কোথায়ও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার জো নেই। পরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই অস্বস্তি থেকে তিনি মুক্তি পান।

'বেঙ্গলী'তে থাকবার সময়ই ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিকতা করার জন্য তাঁর আগ্রহ জন্মে। একটা মস্ত অন্তরায় ছিল, ইংরেজী ভাষার উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার মতো অবকাশ পান নি জীবনে। কিন্তু ইচ্ছা প্রবল, বাধাকে জয় করলেন। 'বেঙ্গলী'র প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগল, সাংবাদিকদের সঙ্গে ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মিশতে লাগলেন। পড়তে আরম্ভ করলেন নানা সাহিত্য—সেক্সপীয়র মিল্টন শেলী বায়রন ডিকেন্স বার্নার্ড শ'র। অর্জন করলেন ভাষার উপর অধিকার, সাংবাদিকতার প্রতি সবিশেষ আগ্রহ জয়ী হলো।

'ইংলিশম্যান' জবরদস্ত পত্রিকা। 'স্টেটসম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'ইংলিশম্যানে' লাইন ভিত্তিতে রিপোর্টারের সুযোগ পেলেন তিনি। তখনই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। 'সারভেন্ট' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক আমি। প্রায়ই আসতেন আমাদের অফিসে, তাঁর লেখা দেখাতেন, আলোচনা করতেন, ভালো সাংবাদিক হওয়ার পথ জানতে চাইতেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর নিষ্ঠা দেখেছি। বিপ্লবের বহ্নি-উৎসবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কালটা দিয়ে এসেছেন তিনি, কারাভ্যন্তরে কেটেছে দীর্ঘকাল। তবু উৎসাহের অন্ত নেই, জীবনকে জয় করার অত্যুগ্র সাধনা প্রদীপের মতো হৃদয়ে জ্বলছে।

'ইংলিশম্যানে'র ভারতবিরোধী ভূমিকা বেশি দিন বরদাস্ত করলেন না তিনি। চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পাটনা চলে গেলেন। বেহারে তাঁর যৌবন কেটেছে। অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। পাটনার 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন স্থানীয় রিপোর্টার হিসেবে। 'ফ্রী প্রেসের' সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন।

তারপর আমি 'সারভেন্ট' ছেড়ে 'ফ্রী প্রেসে' গেছি। ফণিবাবুর সঙ্গে তখন আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। তাঁর নিষ্ঠা ও আগ্রহের আস্বাদন পেয়েছি প্রতি দিনের কাজে। ফ্রি প্রেস ছেড়ে ইউ পি আই যখন গড়ে তুলেছি, তখন তিনিও যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে।

তখন পাটনাতে পত্রিকার অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ক্ষুদ্র রাজধানী লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যগুরুত্বে হীনবল। তাই দৈনিক পত্রিকাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তদুপরি কলকাতা থেকে বিখ্যাত পত্রিকাগুলি পাটনাতে হাজির হয় অনতিবিলম্বে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকাও বিরাট সমস্যা। 'সার্চ লাইট' কংগ্রেসপন্থী পত্রিকা, তবুও অর্থাভাবে ইউ পি আই'র সংবাদ নিতে পারে নি। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থানুকূল্যে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' প্রকাশিত হয়, তাঁরাও একই অসুবিধায় আমাদের খবর নিতে রাজী হয় নি।

কিন্তু কলকাতার পত্রিকাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকতা করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। দেশ জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ, জাতীয় সংগ্রামের সংবাদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইউ পি আই জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান। তাই পাটনার পত্রিকাগুলি আমাদের খবর না নিয়ে পারলেন না।

কিন্তু পাটনার পত্রিকাগুলি এতো অল্প চাঁদা দিতে রাজী হয়েছিলেন যে, তাতে একটি ছোট্ট অফিসের ব্যয়ও কুলানো যায় না। বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন ফণিবাবু। তাঁর অসীম সাহস, আশ্চর্য নিষ্ঠা। তিনি এগিয়ে এসে পাটনা অফিসের ভার নিলেন।

অর্থাভাবের সমস্যায় ফণিবাবু ভারাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু অপরাজেয় তাঁর নিষ্ঠা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি এমন চমৎকার কাজ চালিয়ে-ছিলেন যে, সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিরাও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল আন্তরিকতার দীপ্তিতে ঝলমল, হৃদয় ছিল প্রীতিতে পূর্ণ। সাংবাদিক ও সাংবাদিকতাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতারূপেও কাজ করেছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধারদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অজাতশত্রু। পাটনার সকল সাংবাদিক ও দেশ-

কর্মী ছিলেন তাঁর সুহৃদ, তাঁর স্নেহভাজন। মৃত্যুর অনতিপূর্বে তাঁর জন্মদিন বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়েছিল পাটনা নগরীতে ; মন্ত্রী, পদস্থ কর্মচারী ও সকল সাংবাদিকের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে তাঁর প্রীতিময় হৃদয় অভিষিক্ত হয়েছিল। শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ মূল্যবান উপহার দিয়ে কনিষ্ঠরা প্রণাম জানিয়েছিলেন, সমবয়সীরা প্রীতি।

হাঁপানীর রোগ ছিল তাঁর, তাতেই তিনি শেষ বয়সে বড়ো কষ্ট পেয়েছেন। শেষ সময়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সমস্ত পাটনা নগরীতে শোকের ছায়া মেলে দিয়েছিল। এমন শোক অনেক রাজার ভাগ্যেও ঘটে না।

তিনি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ইউ পি আই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল। এই রকম সৎ, চরিত্রবান এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী সব দেশেই বিরল। তাঁর জীবন থেকে অনেক শিক্ষা নেবার আছে, অনেক প্রেরণা। তাঁর স্বার্থত্যাগী, দেশপ্রেমিক ও স্নেহময় হৃদয়ের কাছে একবার যিনি গেছেন, তাঁকেই মুগ্ধ হতে হয়েছে।

তাঁর দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ পিতার স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। পাঠনা অফিসের তিনি সম্পাদক। কনিষ্ঠ সেখানকার অফিসেই নিযুক্ত। তাঁর কন্যা বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বতী মেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর পিতার সস্নেহ সাহায্যে তাঁর দিন কাটতো। এখনও হয়তো অনেক বাধা-বিপত্তি তাঁর পথে এসে দুঃখ দিয়ে যায়। তবু বাবার কাছে চরিত্রশক্তি পেয়েছেন, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হননি। দুঃখের ভিতর দিয়েও পুত্র-কন্যাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা করেছেন তিনি। মহৎ পিতার সন্তানদের সুখী করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

॥ ২২ ॥

সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দিল্লী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী সংবাদের উৎস এখানে, শাসন-কর্ণধারদের রাজধানী। ইংরেজ আমলে সরকারী গ্রীষ্মাবাস সিমলাও বৎসরের কয়েকটা মাস দিল্লীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী ও সিমলা থেকে সংবাদ সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তখন কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, আমাদের সরকারী ও আইনসভার সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে তিনি প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। কিছুকাল পরে ফ্রী প্রেসের সহকর্মী শশাঙ্ক ঘটক দিল্লী-সিমলার ভার নেন। বোম্বে অফিস খোলা হলে তিনি স্থানান্তরিত হন বোম্বেতে। সে সময় সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু আমাদের দিল্লী-সিমলা অফিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী সত্যেন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। 'ফরোয়ার্ড,' 'ইংলিশম্যান,' 'বসুমতী' (ইং), 'লিবার্টি' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন, লেখক হিসেবেও তিনি তৎকালীন পরিবেশে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্নেহ ও আনুকূল্য লাভ করে তিনি এসে যোগদান করেন ইউনাইটেড প্রেসে। মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা বেতনে। তাঁকে নিযুক্ত করা হয় দিল্লী ও সিমলা অফিসের সম্পাদক পদে।

অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যেই আমাদের অফিস তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও তাঁর সংবাদ পরিবেশনের আশ্চর্য কায়দা আমাকে মুগ্ধ করেছে। অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহার

তাঁর। স্বভাব সুন্দর স্নিগ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্ব। যাঁর কাছেই তিনি গেছেন, তাঁর প্রীতি অর্জন করেছেন সহজেই। সকলেই তাঁকে সাহায্য করেছেন, প্রশংসা করেছেন। আইনসভার সদস্যবৃন্দ, পদস্থ রাজকর্মচারী ও 'একজিকিউটিভ কাউন্সিলের' সভ্যবৃন্দ তাঁর প্রতি প্রীতিযুক্ত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তখন ভারত সরকারের আইনসচিব, প্রবল প্রতাপে তিনি কর্মে অধিষ্ঠিত। সত্যেন তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন দু' দিনেই। স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহারের গুণে তিনি তাঁর স্নেহ অর্জন করে নিলেন।

আইন সভার অধিবেশনকালে আমি গেছি সেখানে। উঠেছি তাঁর বাসস্থানে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো ব্যবহার তাঁর, তাঁর স্ত্রী আত্মীয়ার মতো আপন। মুগ্ধ হয়েছি সুখী দম্পতীর সৌজন্যময় আতিথেয়তায়।

খুব কাছের থেকে দেখেছি তাঁকে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ। আমি মুগ্ধ হয়েছি। ইউনাইটেড প্রেস এমন কর্মীর জন্যে গর্ব করবে চিরকাল, তাঁর মতো সাংবাদিক খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন না। বিষম ভূমিকম্পে যখন কোয়েটা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি দুর্মর সাহসে ভর করে ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। তাঁর প্রেরিত বার্তায় সারা ভারত চমকে উঠে জেনেছিল, কতো বড়ো প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে গেছে সেখানে। যাতায়াতের দুর্ভোগ আর কষ্ট তাকে দমিত করতে পারে নি। অসহ গ্রীষ্মে দেহে ফোসকা পড়েছে, শ্রান্তিতে নুয়ে এসেছে দেহ। কোয়েটার খবরে ইউ পি আই-এর পতাকা আরো উঁচুতে উঠলো—কিন্তু সত্যেনের দেহ ভেঙে গেল তাতে।

অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁর দিনাতিপাত হয়েছে। পরিশ্রম করতে হয়েছে অমানুষিক। এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতোটা যে জীর্ণ তা কেউ বুঝতে পারেনি।

তখন আমাদের সিমলা অফিস ছিল নীচু জমিতে। রোজ কয়েকবার দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পথ পেরিয়ে আসতে হতো। একদিন তিনি অফিসে

এসে একটা সংবাদ লেখার জন্য টাইপ রাইটারের কাছে গিয়ে বসলেন। কয়েকটা লাইন খট্‌খট্‌ করে টাইপ করে গেলেন, তারপর হঠাৎ মেশিনের উপর তাঁর দেহটা ঢলে পড়লো।

সহকর্মী অনিল দাস ছুটে এলেন, খবর পেয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। মনে হয়েছিল বুঝি ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু ঘুম নয়, পরম-মৃত্যু তাঁকে আলিঙ্গন দিয়েছে। যশস্বী সাংবাদিক সংবাদ রচনা করতে করতে মহামৃত্যুর কোলে চলে গেলেন।

খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ছুটে এলেন, এলেন স্যার উষানাথ সেন এবং অনেক সাংবাদিক ও পদস্থ রাজকর্মচারী। দীর্ঘ শোকযাত্রা স্তব্ধ-মৌন হয়ে নিয়ে গেল তাঁর দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু টাকা দিয়ে ও চাঁদা তুলে তার শেষ পার-লৌকিক কার্য সমাধা করে দিলেন। আরো কিছু টাকা দিলেন তার স্ত্রীর হাতে, তারপর পুত্রকন্যা সহ তাকে পাঠিয়ে দিলেন তার পিতা সাহিত্যিক সরোজনাথ ঘোষের গৃহে।

অকস্মাৎ সত্যেনের পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। শিশুর মতো কাঁদতে আরম্ভ করলাম আমি অফিসের মধ্যেই।

দুঃখের দুর্দিনে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু ইউনাইটেড প্রেসের পতাকা তুলে রেখেছিলেন সুউচ্চে: তাঁর পতাকা আজ আমরা সকলে বহন করে চলেছি।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতনামা, কিন্তু লেখক হিসেবেও তিনি বিশেষ প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ওপর সেকালে 'আর্য পাবলিশিং'-এর দোকানে সাহিত্যিকদের একটা মস্ত আড্ডা জমতো। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সে আড্ডার একজন মধ্যমণি। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ

সান্যাল প্রভৃতি ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। . সাহিত্যের প্রতি তার আশ্চর্য মমতা আর আকর্ষণে তার বন্ধুরা মুগ্ধ হতেন।

তার পরলোকগমনের পর সারা ভারত থেকে শোকবাণী এসেছে; মন্ত্রিবর্গ, পদস্থ রাজকর্মচারী, খ্যাতনামা নেতা ও দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত দৈনিকপত্রে তার অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে। একজন তরুণ সাংবাদিকের জন্য সারা দেশ জুড়ে এতো বেদনা, এমন আর কখনো দেখা যায়নি।

বহু দৈনিক ও সাময়িক পত্রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় রচনা করেন বর্তমানকালের একজন যশস্বী সাহিত্যিক। 'এস পি বি'—এই শিরোনামা দিয়ে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল; 'বাংলা দেশের অনেক সংবাদ-পত্রে পুস্তক সমালোচনা এবং সাহিত্য প্রবন্ধের নীচে এই তিনটি ইংরেজী অক্ষর আপনাদের অনেকের চোখে প্রায়ই পড়ে থাকবে। এই তিনটি ছোট ছোট হরফের আড়ালে লুকিয়েছিল মস্ত বড় একটি মানুষ, মস্ত বড় একটা প্রাণ। আমরা তাঁকে জানতাম সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু বলে। বাংলা দেশের খবরের কাগজগুলিতে যাঁদের সহকারী হিসেবে প্রবেশ করতে হয়, ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে চিরকাল অন্ধকার হয়েই থাকে. কিন্তু সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সে অন্ধকারকে নিজের অমিত অধ্যবসায়ের বলে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'বসুমতী' এবং 'ফরোয়ার্ডে'র সম্পাদনাগারে যাঁর কর্ম-জীবনের সূচনা হয়েছিল, সিমলা পাহাড়ে এই সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময়ে তিনি ছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ নিউজ এজেন্সী ইউনাইটেড প্রেসের দিল্লী-সিমলার প্রধান সম্পাদক। সত্যেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুতে আজ সাংবাদিক মহলে শোকোচ্ছ্বাসের অন্ত নেই, কিন্তু আমরা জানি, অনন্যসাধারণ আত্মপ্রত্যয় এবং কর্মনিষ্ঠা না থাকলে তাঁকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোন স্বরাজী বা অর্ধস্বরাজী দৈনিকের সংবাদ স্তম্ভের শিরো-নামা সাজিয়ে দিন কাটাতে হতো।...

...দুঃখের কথা এই যে, সত্যিকার সদালাপী একটি মানুষকে আমরা হারালাম। যে মানুষের বন্ধুত্বের গণ্ডি ছিল বিস্তীর্ণ, চিত্তের প্রসারতা ছিল আকাশস্পর্শী, আতিথেয়তা ছিল আত্মীয়তারও বড়, সে নেই। সাংবাদিকের পৃথিবীতে সত্যকার শোক নেই, তারা mock mourner, কিন্তু মানুষের মনে মৃত্যু পুরানো দিনের খবরের কাগজের মতো সহজে পুরাতন এবং অর্থহীন হয় না, তারা প্রবাসে এই বাঙালী ছেলেটির একান্ত আকস্মিক মৃত্যুতে পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনা বোধ করবে।'

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, শ্রীদেবদাস গান্ধী, স্যার আবদার রহিম, শ্রীপ্রকাশ, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, কেন্দ্রীয় আইনসভার তৎকালীন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট অখিলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চিঠি লিখে সত্যেনের জন্য শোক জ্ঞাপন করেন। সিমলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ এ এইচ জোয়েস সত্যেনের স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন :

"I am writing in the absence of Mr. Jafri, the Director of Public Information, to say how shocked and grieved we are to hear of the sudden loss of your husband. Only yesterday afternoon, I had a long and very pleasant talk with him. Not only will his death be a great loss to the Agency which he represented, but will be keenly felt both by his fellow journalists in Simla and by the officers of this Bureau. He was a man for whom I, personally, had a great regard, for he was a journalist who did honour to his profession.'

কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ইউ পি আফিসে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হলো, সকলের কৃতজ্ঞতা। যতোদিন ইউনাইটেড প্রেসের কর্মচক্র চলতে থাকবে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের স্মৃতি আমরা বহন করে যাবো শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে, অনুরাগে।

॥ ২৩ ॥

পাঞ্জাব অফিস সম্পর্কে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। দীর্ঘকালের সহকর্মী শ্রীপুলিন দত্ত কলকাতার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোরেও ইউনাইটেড প্রেস অফিস খুলেছিলেন।

'সারভেণ্ট' পত্রিকায় আমার সহকারী ছিলেন পুলিনবাবু। স্মিতহাস্য সৌম্য চেহারা, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুলিনবাবু অনায়াসে লোকচিত্ত জয় করে নিতেন। অল্পায়াসেই সাংবাদিকতার কাজেও দক্ষতা অর্জন করেন। ফ্রী প্রেসে যোগদান করবার সময়ে তাঁর উপরই আমার 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার দায়িত্ব দিয়ে আসি।

'সার্ভেণ্ট' থেকে তিনি আসেন ফ্রী প্রেসে। লাহোর শাখার দায়িত্ব নিয়ে তিনি যান পাঞ্জাবে। প্রবাসের অপরিচিত স্থানে অনাত্মীয়বোধ স্বল্পদিনেই কেটে গেল তাঁর। লাহোরের বিখ্যাত পত্রিকা 'ট্রিবিউনের' যশস্বী সম্পাদক কালীনাথ রায় মশায়ের স্নেহ ও প্রীতি অর্জন করে লাহোরের সাংবাদিক মহলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

লাহোরে যখন তিনি ইউনাইটেড প্রেস আরম্ভ করেন, তখন তিনি পাঞ্জাবের খ্যাতিমান সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সম্মান বজায় রাখাব জন্য তাঁর খ্যাতি তখন সারা ভারতে বিস্তৃত। দৃঢ়চিত্ত ও অসম সাহসী শ্রীপুলিন দত্ত। পাঞ্জাব সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি জটিল মামলা দায়ের করেন এবং গ্রেপ্তার করে এক মাস পর্যন্ত বিনা জামিনে লাহোর জেলে পুরে রাখেন।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা হয় সীমান্ত প্রদেশের দমন-নীতির সংবাদ নিয়ে। ১৯৩০ সাল থেকেই সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে। মহাত্মা-শিষ্য খান আবদুল গফুর খান

এই আন্দোলনের পুরোধা নেতা। হিংস্র পাঠান জাতির মধ্যে অহিংসা ও স্বাধীনতার মন্ত্র তিনি প্রচার করতে থাকেন অপরিমেয় উৎসাহে। ইংরেজ সরকার বিচলিত হয়। এই আন্দোলন যখন গভীর মূলে প্রবেশ করে পাঠান জাতিকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তখন ভীত ইংরেজ সরকার নির্বিচার ও নির্মম দমননীতির আশ্রয় নিয়ে তা নির্মূল করার চেষ্টা করেন। 'ফ্রণ্টিয়ার ক্রাইমস রেগুলেশনে'র আশ্রয় নিয়ে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনকে পীড়ন ও ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়ে যান। এই সময় উৎমনজাই গ্রামে খান আবদুল গফুর খানের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বাড়িতে কংগ্রেসের অফিস ছিল।

এই খবর শ্রীপুলিন দত্ত অনিতবিলম্বে প্রচার করে দেন। ফ্রী প্রেস মারফত সংবাদটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন সীমান্ত প্রদেশের সংবাদ প্রকাশ করা সম্পর্কে সরকারের কড়া বাঁধন ছিল, সুতরাং সংবাদ প্রচারের জন্য পাঞ্জাব সরকার ভারত সরকারের নির্দেশে পুলিনবাবুকে গ্রেপ্তার করেন এবং এক বিরাট মামলা (Under Section 505B, 124AIPC etc). দায়ের করেন।

দীর্ঘ এক বছর এই মামলা চলতে থাকে। বিচারে পুলিনবাবুর একশ' টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করেন সেসন কোর্টে। সেখানকার বিচারে মাত্র এক টাকা জরিমানা রেখে বিচারপতি ঘোষণা করেন, সরকার সীমান্ত প্রদেশে যেরূপ কড়া দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সংবাদের সত্যতা পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই। এমন কি, মৌলানা সৌকত আলী, ফাদার এলুইন, মৌলভী সফী দাউদের মতো নেতাদেরও সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। একটা আঙ্গিকগত ত্রুটি (Technical offence) ছাড়া তিনি 'আসামী'র কোন অন্যায় দেখেননি।

পুলিনবাবুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা হয় জলন্ধর আদালত অবমাননার অভিযোগে। জলন্ধরের আদালতে সমাজতন্ত্রী নেতা মুন্সী আহমদ্দীনের

বিরুদ্ধে একটা রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। মুন্সীজীর পক্ষে পুলিন ছিলেন অন্যতম সাক্ষী। সরকারের চীফ সেক্রেটারী এক নির্দেশ জারি করে সমাজতন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করার গোপন আদেশ দিয়েছিলেন। সংবাদটি ইউনাইটেড প্রেস মারফত প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পুলিনবাবুর সাক্ষ্যদান কালে পাবলিক প্রসিকিউটর সংবাদটির উৎস বা সংবাদদাতার (Source of the News) নাম জানতে চান। কিন্তু অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে সংবাদদাতার নাম জানতে অস্বীকার করেন পুলিনবাবু। সরকার আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু জনমতের চাপে সরকারকে পুনরায় পরাস্ত হতে হয়।

এই সমস্ত মামলা পুলিন দত্তকে পাঞ্জাবের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সাংবাদিকতার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভয় সংগ্রাম একটা বহুবিস্তৃত খ্যাতিতে ভূষিত করেছিল তাঁর নাম। ইউনাইটেড প্রেসের লাহোর শাখার কর্ণধার হয়ে আছেন পুলিনবাবু, তাই সেদিকে আমার নিশ্চিন্তি ছিল।

সব দেখাশোনা করতে একবার লাহোর গিয়েছিলাম। নিস্‌বেত রোডে আমাদের অফিস ও পুলিনবাবুর বাসস্থান। গিয়ে উঠলাম পুলিন-বাবুর বাসায়, কয়দিন আরামে কাটলো।

সর্বপ্রথমেই গেলাম কালীনাথ রায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আন্তরিক যত্ন ও প্রীতির সঙ্গে তিনি অভ্যর্থনা করলেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন আমার ব্যক্তিগত পারিবারিক নানা প্রশ্ন, তারপর জানতে চাইলেন ফ্রী প্রেসের সংবাদ।

বললেন, 'সদানন্দ যদি অধৈর্য হয়ে না উঠতেন তাহলে আপনাদের এমনভাবে নতুন করে সংগ্রাম করতে হতো না। অর্থকড়ি সম্পর্কে কতটা সাহায্য করতে পারব জানি না, সাংবাদিক ও বন্ধু হিসেবে যথাসাধ্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

এই প্রতিশ্রুতি তিনি সর্বদা পালন করে গেছেন।

ট্রিবিউনে'র ম্যানেজার মিঃ সন্ধির সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সহৃদয় সহযোগিতা আমাদের প্রতি। বললেন, 'পুলিনবাবুর মতো লোক লাহোর অফিসের কর্তা, আপনার ভাবনা কী।'

দেখাসাক্ষাৎ করে 'ট্রিবিউনে'র অফিস ও মেসিনপত্র পরিদর্শন করে ফিরে এলাম। ফেরার সময় কালীনাথবাবু তাঁর গৃহে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন; বললেন, 'একটু আগে যদি আসেন তাহলে একহাত ব্রীজ খেলা যাবে আপনার সঙ্গে।'

কালীনাথ রায় কেবলমাত্র পাঞ্জাবের একজন খ্যাতনামা সম্পাদক নয়। সারা ভারতের যশস্বী ও প্রতিভাবান সম্পাদকদের তিনি অন্যতম। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়। মনীষা ও পাণ্ডিত্য মিশ্রিত হয়ে তাঁর চরিত্রে একটা দীপ্তি ছড়িয়ে গিয়েছিল। 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদক হিসেবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ রচনা শত্রুমিত্র সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে পাঠ করতেন।

লাহোর শহরটা যেখানে জনাকীর্ণ সেখানে আবর্জনা আর নোংরা। 'দি মল' ছাড়া শহরের কোথাও সৌন্দর্য নেই। কালীনাথবাবু যেখানে থাকতেন তার নাম মডেল টাউন। প্ল্যান করে তৈরী করা এই অংশটুকু শ্যামল শোভায় স্নিগ্ধ। দূরে দূরে বাড়ি, প্রতি বাড়ির সংলগ্ন এক এক টুকরো লন। কালীনাথবাবুর বাড়িটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকরও। হাঁপানী রোগে তিনি ভুগতেন বলে মডেল টাউনে বাস করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়ও ছিল।

সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। চা খেয়ে বসে গেলাম ব্রীজ খেলতে। পুলিন খেলতে জানেন না, বসে বসে দেখতে লাগলেন। অবশেষে হাসি-তামাশা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে নিমন্ত্রণ সেরে আমরা ফিরে এলাম।

আরও বহুবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আন্তরিক মমতা নিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন। বয়সানুযায়ী তাঁর স্বাস্থ্য যথাযথ ছিল না,

একটু বেশী বৃদ্ধ মনে হতো তাঁকে। হাঁপানী রোগটা তাঁকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন।

'প্রতাপ' আর 'মিলাপ' লাহোরের আর দুটি খ্যাতনামা উর্দু দৈনিক পত্রিকা। মহাশয় কৃষ্ণাণ ও মহাশয় কুশলচাঁদ যথাক্রমে পত্রিকা দু'টির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পুলিনবাবুর সঙ্গে বিশেষ প্রীতি ছিল তাঁদের এবং আমাদের সংবাদ তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করতেন।

'মিলাপে'র স্বত্বাধিকারী কুশলচাঁদ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আর্যসমাজপন্থী সাধুপ্রকৃতির লোক তিনি। পত্রিকার কাজ খুব বেশি দেখেন না, মাঝে মাঝে দু'একটা সম্পাদকীয় লেখেন। বাংলা দেশ ও হায়দরাবাদে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল, তিনি অনেকক্ষণ এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আর্য সমাজের কাজই জীবনব্রত করেছেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রণবীরের সঙ্গে আলাপ হলো। পত্রিকা তিনিই দেখতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানেন তিনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের সব বই তিনি পড়েছেন, বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। উর্দুপ্রধান দেশে একটি 'রবিপন্থী' পাঞ্জাবী যুবকের দেখা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল। বাঙ্গালী খাদ্য তিনি ভালোবাসতেন; বাড়িতে মাছ-মাংস খেতেন না, কিন্তু কোন বাঙ্গালী বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলে আনন্দের সঙ্গে বাঙ্গালী রান্নার মাছ-মাংস খেতেন। বাংলা দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রাণের টান ছিল।

'প্রতাপ' পত্রিকার মহাশয় কৃষ্ণণের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি একদিন। নরম চাপাটি আর গাজরের হালুয়ার ভারি চমৎকার স্বাদ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র সুভাষপন্থী। সুভাষের বীরত্বপূর্ণ আপসহীন সংগ্রামবাদ তাঁকে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনিই পত্রিকার কাজ দেখাশোনা করতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র তখনও

কলেজের ছাত্র। বর্তমানে বীরেন্দ্র রাজনীতিতে যোগদান করেছেন, পূর্ব পাঞ্জাব বিধানসভার তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিছুকাল সরকারের প্রচার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। নরেন্দ্র এখন পত্রিকার সম্পাদক ও কর্ণধার।

নরেন্দ্র ও রণবীর এখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুজন খ্যাতনামা সম্পাদক। রণবীরের একটা নেশা ছিল বড় বড় কাচের পাত্রে রঙীন মাছ পোষা। একবার তাঁর সব মাছ মরে গিয়েছিল, কলকাতা থেকে আমি রঙীন মাছ কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন, একটা সাম্রাজ্য পেলেও তাঁর এতো আনন্দ হতো না।

আমাদের লাহোর শাখায় আনন্দস্বরূপ নামে একজন উত্তর প্রদেশের সুশিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক কাজ করতেন। আমাদের 'বিশেষ প্রতিনিধি' হয়ে তিনি পেশোয়ারে বদলী হন। সেখানে গিয়ে তিনি কর্মদক্ষতায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং নেতৃবৃন্দের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুকাল পরে পেশোয়ারে পুরোদস্তুর একটি অফিস খুলে বসেন। ডাঃ খান সাহেব যখন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার আমাদের সংবাদ নেওয়া শুরু করেন।

আনন্দস্বরূপের আমন্ত্রণে আমি পেশোয়ারে যাই। সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। খান আবদুল কোয়াম বর্তমানে লীগ গভর্নমেণ্টের একজন স্তম্ভবিশেষ, কিন্তু তখন তিনি একজন সামান্য উকিল এবং খান আবদুল গফুর খানের শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁর গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। ইউনাইটেড প্রেসের জাতীয়তাবাদী কাজের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তখন মনেপ্রাণে তিনি কংগ্রেসী। গভর্নর ক্যানিংহামের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি ঝানু সিভিলিয়ান হলেও কংগ্রেসী দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক বিকেলে তাঁর বাংলোয়। ঢিলে সালোয়ার আর কোট গায়ে ছিল তাঁর, শান্ত সৌম্য সদাহাস্যময় মুখ। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এমন একটা শান্তির সুষমা আছে তাঁর, এক মুহূর্তেই খুব ভালো লেগে যায় তাঁকে। যথেষ্ট টাকা দিয়ে আমাদের সার্ভিস নিতে পারলেন না বলে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমাদের জাতীয়তাবাদী কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল। আন্তরিকভাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, পরে ইউনাইটেড প্রেসকে ভালো টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রথিতযশা পুরুষ খান আবদুল গফুর খান। মহাত্মা গান্ধীর যোগ্য শিষ্য। একটা হিংস্র জাতিকে তিনি অহিংসা ও শান্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন নিজের দেবোপম চরিত্র ও সুদৃঢ় সংগঠন শক্তিতে। সেবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটেনি। তখন তিনি নিজের গ্রামে পল্লী উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর বহুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। খুব কাছের থেকে দেখেছি তাঁকে। দৈর্ঘ্যে যেমন বিরাট পুরুষ, মহত্তেও তেমনি সুবিশাল। শক্তিমান এই বিশাল পুরুষের হৃদয়ে সুউচ্চ ঔদার্য ও মানবতাবোধ। তাঁর সাহচর্যে এসে বারবার যীশুখৃষ্টের কথা মনে হয়েছে আমার। আধুনিক কালের তিনি উজ্জ্বল একটি মানবরত্ন।

পেশোয়ারে দুজন মহদাশয় বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। একজন কংগ্রেস নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ, তিনি থাকতেন চকবাজারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি জনসেবাক্ষেত্রে খ্যাতিমান। অন্যজন শ্রী পি সি চৌধুরী, সীমান্ত প্রদেশের একাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন।

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সঙ্গেও তখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি খুব প্রতিপত্তিশালী হিন্দুনেতা ও যশস্বী আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর বাড়িতে। ভোজনের আসরে বসে

সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের সমস্যা তিনি খুব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী।

পরদিন সকালে তাঁর মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে, খাইবার পাস ভ্রমণ করে আসার জন্য। খুব সাহসী ও বিশ্বস্ত একটি ড্রাইভার ছিল সঙ্গে। আনন্দস্বরূপকে নিয়ে আমি পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলাম।

পেশোয়ারের বাজার পেরিয়ে আমাদের যাত্রা চলতে লাগলো। বাজার রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দু'সারে তাঁবুর মিছিল। দীর্ঘকায় পাঠান ও কাবুলীরা ফলমূল ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে বিপণিমালা খুলে বসেছে। সব একদর। টাঙ্গা আর ঘোড়া ছোটাছুটি করছে চারদিকে। কলরব কোলাহল উঠেছে কিন্তু তার মধ্যেও আশ্চর্য একটা শৃঙ্খলার নিশানা।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। পূববাংলায় আমার জন্ম, কলকাতা আমার কর্মস্থান। আমার দেশের সঙ্গে এখানের মিল নেই কোথায়ও, চেহারা চরিত্রে সব বেমিল। কিন্তু তবু 'ভারতীয়' বোধটা এখানে ঠিক তেমনি—নানা বৈচিত্র্যের ফুল জোড়া দিয়ে 'ভারতীয়' জাতীয়তার মালা তৈরি। এই জাতীয়তা কত বড়ো আর কতো বিচিত্র, এখানে পেশোয়ারের দীর্ঘকায় মানুষদের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম।

রুক্ষ প্রান্তরের ছোট ছোট কেল্লা ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মোটর ছুটে চলেছে। দুর্ধর্ষ আফ্রিদিদের বাসভূমি চারদিকে। সকলে এদের ভয় করে, ব্রিটিশ সৈন্যরাও এখানে সর্বদা ভীতচকিত। কখন যে ক্ষেপে যাবে আফ্রিদিরা তার কোন ঠিক নেই, গোলমাল বাঁধবে, খণ্ডযুদ্ধ ঘটে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়। 'বুলেট' হচ্ছে এখানকার একমাত্র পরোয়ানা।

'খাইবার পাসে' এসে গাড়ি থামলো। মৃত্যুর স্তব্ধতা চারিদিকে, সুনিবিড় নিঃশব্দতা। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইতিহাসের পাতা খুলে যেতে লাগলো মনের মধ্যে। নতুন একটা বৃহত্তর আমেজ। মনে পড়ে গেল, কতবার এই পথে এসেছে কত অভিযানকারী আক্রমণ-

কারীরা, অত্যাচারের বন্যা নামিয়ে দেশকে পর্যুদস্ত করেছে, পরাহত করেছে। কিন্তু তবু জয় করতে পারে নি তার এই মহাদেশ, মহাকালের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার এই দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে একদেহে লীন হয়েছে।

একটী আশ্চর্য মুহূর্ত আমার জীবনে। 'খাইবার পাসের' ইতিহাস-লগ্ন স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আমার মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে গেল।

অনেকক্ষণ পর আমরা ফিরে এলাম পেশোয়ারে।

১৯৪৭ সালে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো পাঞ্জাবে। স্বাধীনতার 'বলি' চলতে লাগলো অমানুষিক বর্বরতায়। এই দাঙ্গার সময়ে কিছুসংখ্যক গুণ্ডা আমাদের অফিস আক্রমণ করার চেষ্টা করে। তখন একজন সহৃদয় বাঙ্গালী সামরিক অফিসারের সহায়তায় আমাদের কর্মীরা রক্ষা পান। পুলিনবাবু লাহোর থেকে চলে আসেন সিমলা, সেখানে আমাদের অফিস খোলেন। 'ট্রিবিউন' পত্রিকাও স্যার মনোহারলালের চেষ্টায় চল্লিশ দিন পরে সিমলা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তারপরে পুলিনবাবু এসেছেন কলকাতায়, এখন তাঁর দক্ষ ও কুশলী সহযোগিতা লাভ করেছি আমরা কলকাতা অফিসে।

এই দাঙ্গার কালে আমাদের সহকর্মী শ্রীপরেশ মুখার্জি অপরিসীম সাহস ও মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। লাহোর অফিসে পুলিনবাবুর সহকারী ছিলেন তিনি। বহু দুর্গত মানুষের প্রাণরক্ষা করেছিলেন, নানা বিপদগ্রস্থ মানুষকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেছিলেন, সাহায্য করেছিলেন সেই দুঃখ-তমসা রাত্রিতে আরো নানানতরভাবে। এখন তিনি আমাদের কর্ম-প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে নিযুক্ত, তাঁর কুশলী সাংবাদিকতাগুণে তিনি আমাদের একটি সম্পদ।

॥ ২৪ ॥

উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙ্গালীর বহুকালের আত্মীয়তা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দু'দেশের হৃদয়গত ঐক্যও দীর্ঘকালের। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা উড়িষ্যাকে পর্যুদস্ত করে রেখেছিল অনেকদিন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্যাস্রোতে সে দেশের নবজন্ম হয়েছে।

ইউনাইটেড প্রেস প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই উড়িষ্যায় আমাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী নামক উচ্চশিক্ষিত ও সুমার্জিত যুবককে কটকে সংবাদদাতা নিযুক্ত করা হয়! কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের উৎসাহী সভ্য ছিলেন দ্বিবেদী।

উড়িষ্যার প্রাচীন পত্রিকা 'সমাজ'। উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সেদেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মতোই প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে 'সমাজ' আপন ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। 'নিউ উড়িষ্যা' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকাও প্রকাশিত হতো, কিন্তু এই সংবাদপত্রটি কংগ্রেস-ভাবধারার সম্পূর্ণ বাহক ছিল না।

১৯৩৫-এর সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে উড়িষ্যায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সরকারের আনুকূল্যে ও সংবাদপত্রগুলির সহযোগিতায় কটকে ইউনাইটেড প্রেসের পুরো অফিস খোলা সম্ভব হলো। তদানীন্তন অর্থসচিব শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো ও অমৃতবাজার পত্রিকার তৎকালীন কটকশাখার কর্ণধার শ্রীমোহিত মৈত্র তখন নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর ঐকান্তিক চেষ্টায় কটকে আমাদের অফিস ভালো-ভাবেই কাজ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৯৪২-এর স্বরাজসংগ্রামে দ্বিবেদী কারারুদ্ধ হন। তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান নন্দ চৌধুরী।

তিনি আমাদের নানা শাখায় কাজ করেছেন, সাংবাদিকতাকর্মে বিশেষ কুশলী।

• কংগ্রেস মন্ত্রিসভা স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর পার্লাকামেদি'র রাজার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শ্রীগোদাভারস মিশ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এই মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কিন্তু আমাদের কাজ এমন দক্ষতার সঙ্গে চলেছিল যে নতুন মন্ত্রিসভা তাঁদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করলেন না।

কিছুকাল পরে নন্দ চৌধুরী এলাহাবাদে বদলী হওয়ায় উড়িষ্যার প্রবীণ সাংবাদিক আচারিয়ার পুত্র শ্রী এন কে স্বামীকে কটক শাখার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, সংবাদ-সরবরাহ স্বষ্ঠুভাবে চলতে থাকে।

ইউনাইটেড প্রেসের প্রায় দশ বছর আগে এ পি আই টেলিপ্রিণ্টার লাইন প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু উড়িষ্যায় তা বদ্ধিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কটকে সে লাইন প্রসারিত করার সঙ্কল্প করেছিলাম। এই সময় উড়িষ্যার কংগ্রেস নেতা শ্রীহরে কৃষ্ণ মেহেতাব, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, শ্রীরাধানাথ রথ প্রভৃতি কটকে টেলিপ্রিণ্টার লাইন খুলে সংবাদসরবরাহের জন্ম অনুরোধ করেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন আর্থিক অসচ্ছলতায় যাতে ইউনাইটেড প্রেসের কাজ ব্যাহত না হয়, সেদিকে তাঁরা সতত দৃষ্টি রাখবেন। আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন কটকে নিয়ে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পি টি আই সেখানে টেলিপ্রিণ্টার প্রসারিত করেছে।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মেহেতাব একটি প্রীতিউজ্জ্বল সান্ধ্য সম্মেলনে আমাদের কটক টেলিপ্রিণ্টার লাইনের উদ্বোধন করেন। অভি-ভাষণে তিনি উইনাইটেড প্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন, উড়িষ্যায় জনসেবার উদ্দেশ্য নিয়েই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার প্রসারিত হয়েছে। সেই সভায় তিনি ঘোষণা

করেন, পূর্ব-উপকূলবাসীদের উপকারের জন্য একটি উঁচু মানের ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের একান্ত আবশ্যকীয়তা রয়েছে।

এই ঘোষণা কিছুদিন পরেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর নিজের পত্রিকা 'প্রজাতন্ত্র' অফিস থেকে 'ইস্টার্ন টাইমস' অল্পদিন পরেই প্রকাশিত হওয়া আরম্ভ করে।

বর্তমানে উড়িষ্যার রাজনৈতিক চিত্রের অনেক বদল হয়েছে। শ্রীমেহেতাব দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন, পরবর্তীকালে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। সম্প্রতি বোম্বের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। উড়িষ্যার পত্রিকাগুলি আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে চলেছে, দুটী সংবাদপত্র বাধ্য হয়ে আমাদের সংবাদ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের কটক অফিস নানা কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে চলছে। তবু আশা আমাদের দৈনন্দিন পথ যাত্রার পাথেয়। উড়িষ্যার সংবাদপত্রগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবে এবং তাঁদের সহযোগিতায় আমাদের আর্থিক দুর্গতিও কেটে যাবে, এই আশা আমাদের প্রত্যহ কর্ম-উদযাপনের মধ্যে গভীরতর হয়ে আছে।

এলাহাবাদে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ ব্যবস্থা যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে, তখন সেখানে গিয়ে সংবাদ সরবরাহের উদযোগ করি। এলাহাবাদে 'লীডার' ও 'ভারত' দু'টি সংবাদপত্র খ্যাতি অর্জন করেছিল আগেই, কিন্তু আমাদের সংবাদ নেবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন নি। সত্যেন সান্যালের পরিচালনায় এলাহাবাদে সংবাদ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিলাম। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সংবাদ নেওয়া শুরু করলে 'ভারত' ও 'লীডারও' আমাদের সংবাদ দাবী করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁরা আবার এই সার্ভিস আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ বন্ধ করে দিয়েছেন।

নাগপুরেও এ পি আই টেলিপ্রিণ্টার লাইন নেয় নি। 'নাগপুর টইমস' ও 'হিতবাদ' মাসিক বর্ধিত চাঁদা দিয়ে টেলিপ্রিণ্টার সার্ভিস প্রার্থনা করলে

এবং মধ্যভারত সরকার আমাদের সংবাদ কিনতে সম্মত হলে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন নাগপুরে পরিবর্ধিত করে নিয়ে যাই। তার কিছুদিন পরেই পি টি আই নাগপুরে তাঁদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন সম্প্রসারিত করেন এবং 'নাগপুর টাইমস' ও 'হিতবাদ' আমাদের সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া স্থির করেন।

নাগপুরে আমাদের অফিস চালানো কষ্টকর হয়ে ওঠতো। মধ্যভারত সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করায় আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়েও সেখানে আমাদের কাজ বেশ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে।

নাগপুরে টেলিপ্রিণ্টার লাইন উদ্বোধন কালে মধ্যভারতের স্বরাষ্ট্র ও প্রচারসচিব পণ্ডিত দ্বারিকাপ্রসাদ মিশ্র বলেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ইউনাইটেড প্রেস যে নির্ভয় ও একনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছে, তার মূল্য অসীম। এই সহযোগিতা না থাকলে কংগ্রেস এমন অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করতে পারতো কিনা সন্দেহ।

দুঃখে দারিদ্র্যে আমাদের বিগত জীবন কেটেছে। বর্তমানের পথ চলাতে সহস্র কাঁটার দংশন। তবু অতীতে যেমন এখনও তেমনি, জাতীয়তাবাদের আদর্শ আমাদের শিরোভূষণ। তাই স্বদেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তা না পেলে এই প্রাচীন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন সফল হওয়া সম্ভব হবে না কিছুতেই।

॥ ২৫ ॥

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

গ্রীনউইচ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সাড়ে এগারোটায় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মধ্য ইউরোপে পোল্যাণ্ডের মাটিতে হিটলারের দৈত্যবাহিনী ধ্বংসলীলা শুরু করেছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকে। একটা অতৃপ্ত রাক্ষসের প্রচণ্ড রক্তপিপাসা। সম্পদ ও সমৃদ্ধির লালসা। মনুষ্যত্বহীন নিষ্ঠুর ভয়াল ভয়ঙ্কর আক্রমণে জনপদের পর জনপদ মৃত্যুর গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

ইংল্যাণ্ড সেই নিষ্ঠুর দৈত্যটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

মনুষ্যত্ব, শান্তি ও গণতন্ত্রের পতাকা ধারণ করে ইংল্যাণ্ড সভ্যতার আদি ভিত্তিকেই রক্ষা করবার প্রয়াস করল।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কাছে ইংল্যাণ্ডের এই কল্যাণব্রতী স্বরূপটা ধরা পড়তে পারলো না।

নিজের দেশে ইংরেজ ভদ্র বিনয়ী। ভারতবর্ষে তার রূপ আলাদা। নিজের দেশে ইংরেজ স্বাধীনতার ধারক, ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার শত্রু।

ইংরেজের চরিত্রে এখানে একটি বিচিত্র বিস্ময়। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যে ইংরেজকে মহৎ ও মনীষার শিখা রূপে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রশংসা করা নিতান্ত স্বাভাবিক, ইংল্যাণ্ডের পৃথিবীময় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকৃত স্থানে তার সে চেহারাটা আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

তার সেখানে প্রবল প্রতাপান্বিত রূপ, দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত শোষকের চেহারা। হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বহীন, করুণাহীন।

সেই চেহারার সঙ্গে হিটলারের চেহারার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার।

দু'শো বছর ইংরেজের এই চেহারা ভারতবর্ষে।

তাই ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণায় যে কল্যাণব্রতী রূপ ছিল,—তার যতই রাজনৈতিক প্যাঁচ ও কূটনৈতিক কুটিলতা থাকুক, তবুও ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাইরে পৃথিবীর মানুষ তাতে আশান্বিত হয়েছে।

অথচ এই যুদ্ধ ঘোষণায় ভারতবর্ষ রোষে ফুঁসে উঠেছে।

ইংল্যাণ্ডের বেতারে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় জার্মানীর বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিন্তু এই ঘোষণার পূর্বাহ্ণে কেন্দ্রীয় এসেম্বলী বা ভারতীয় জনসাধারণের নামমাত্র অনুমোদনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করলেন না।

তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা হিটলারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হলেও ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ইহা আদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। দাসজাতির প্রতি প্রভুর বজ্রকঠিন আদেশ।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে হিটলারের প্রতি তিলমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কেননা কংগ্রেসের সংগ্রাম ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধেও বিঘোষিত।

ইউরোপেও যখন ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের প্রতি প্রীতির মনোভাব ছিল, তখন থেকেই ইউরোপের মাটিতে রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র* ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, ফ্যাসিজম সভ্যতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ববিরোধী জেহাদ।

কিন্তু তবুও, ভারতের অনুমোদন গ্রহণ না করে ভারতীয় জনসাধারণকে যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস গর্জন করে উঠলো।

এই গর্জন ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং আসলে সকলপ্রকার ফ্যাসিজমেরই বিরুদ্ধে।

---

* অমিয় চক্রবর্তীর নিকট লিখিত সুভাষের চিঠি।

কংগ্রেসের মনোভাবটা অনেকদিন থেকেই স্পষ্ট। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সুভাষ প্রখর ভাষায় এ কথা ব্যক্ত করেছিলেন। নেতৃবৃন্দ নানা বিবৃতি ও বক্তৃতায় দেশের নানাস্থানে ভারতীয় জনসাধারণের এই চিন্তাধারাটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন।

যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে ভাইসরয় মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধী ইংরেজকে সহায়তা করেছিলেন সর্বান্তঃকরণে, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামটাই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ইংরেজের পক্ষে। ভারতবর্ষ তখন বিশ্বাস করেছিল, যুদ্ধের অবসান ঘটলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তার ভাগ্যে জুটবে। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিও ছিল সেইরকম।

কিন্তু যুদ্ধের সমাপ্তিতে তার ভাগ্যে জুটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ। স্বাধীনতাকামী কোটি কোটি জনসাধারণের অপ্রতিরোধ্য ঝামেলাকে, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে মৃত্যুর শ্মশানে ধ্বংস করতে চেয়েছিল ইংরেজ।

তাই আর একটা মহাসংগ্রামে ভারতকে বিনা অনুমোদনে টেনে নামানোর জন্যে কংগ্রেস ক্ষোভে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল।

ভূগোলের সীমানা বা রাজনৈতিক কার্যকারণের কোন সংস্পর্শ ছিল না ভারতের যুদ্ধ ঘোষণায়। হিটলারের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ থাকলেও শত শত মাইলের ব্যবধানের ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন সুযোগ বা সার্থকতা ছিল না।

চারদিকের রুষ্ট প্রতিবাদে শঙ্কিত হলো সরকার। কূটনীতি মহলে পরামর্শ হলো, গান্ধীর যদি নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সরকারী প্রচারের মস্ত সহায় হবে।

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীকে নিমন্ত্রণ জানালেন লিনলিথগো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎকার ঘটলো যথানিয়মে। কিন্তু লিনলিথগো নিরাশ হলেন।

মহাত্মা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিটলারী তাণ্ডবলীলার বিরোধী, মিত্রশক্তির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত মতামত বা সমর্থনের কোন মূল্য নেই। ভারতবর্ষের সমর্থন লাভ করতে হলে সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা ও আপস হওয়া দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না ঘটবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের নৈতিক সমর্থন ইংরেজ সরকার আশা করতে পারেন না।

যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে ইংরেজ অনিচ্ছুক। প্রভুর আদেশ নির্বিচারে পালন করবে দাসানুদাস ভারতবর্ষ, লিনলিথগোর এই মনোগত বাসনা।

এই মনের চেহারা যার, গণতন্ত্রের মুখোশটা সেখানে বীভৎস হিটলারের সঙ্গে তার পার্থক্যটা চরিত্রগত নয়, সেখানে মূলগত ব্যবধান নেই। কংগ্রেস এই কথাটা বার বার ঘোষণা করতে লাগল।

আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল। সকল প্রদেশই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে এল। মন্ত্রিত্বের প্রতি মোহ ছিল না কংগ্রেসের, তার সামনে দুটো সমস্যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক, সরকারের আপসবিরোধী অনমনীয় মনোভাব; দ্বিতীয়ত, মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। মহম্মদ আলী জিন্না একদা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, সরোজিনী নাইডু তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের সেতু। কিন্তু ক্রমশ দিনের পর দিন মহম্মদ আলী জিন্না রূপ পাল্টাতে আরম্ভ করেন। মিলনের সেতু তিনি ভেঙে শুধু চৌচির করলেন না, হিন্দু ও মুসলমানকে ভয়ঙ্কর বিরোধিতা ও ঘৃণার শ্মশানভূমি দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী জীবনের একমাত্র সাধনা।

আশ্চর্য রূপান্তর।

হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত জনসাধারণের সমষ্টিকে কংগ্রেস অনুভব

করেছে ভারতীয় জাতি। ধর্মের বিভেদটা একজাতিত্বের বিচ্ছেদ ঘটায় না, অত্যন্ত সহজ বুদ্ধিতেই তা ধরা যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিও তার প্রমাণ করে।

কিন্তু মিঃ জিন্না বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর জীবন প্রমাণ করেছে ভাগ্যও তাঁর সুপ্রসন্ন। ইংরেজের প্রসন্নহস্ত তাঁর সর্বকালের বন্ধু। তাই রাজনীতির উচ্চাশায় তিনি ঘোষণা করেছেন, হিন্দু ও মুসলমানের কোন মিল নেই; মৈত্রী নেই; আত্মীয়তা নেই। পৃথক জাতিত্বের বিচ্ছিন্ন সীমানায় উভয়ের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। উপরন্তু, হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদী লোভের ফলে ইসলাম বিপন্ন!

মুসলিম লীগের প্রচারকৌশল ও সংগঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই শক্তি ছিল, নতুবা স্বল্পকালের মধ্যে তার সভ্য ও সমর্থকসংখ্যার বিপুলাকৃতি সম্ভব ছিল না।

তবুও বাংলা দেশে এ কে ফজলুল হক, পাঞ্জাবে সর্দার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ, সিন্ধুতে মৌলানা আল্লাবক্স ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নেতা ডাঃ খানসাহেবের জাতীয়তাবাদী নীতির ফলে মুসলিম লীগ কোণঠাসা ছিল। কিন্তু ভাগ্য যার সহায়, তাকে কে রোধ করতে পারে? সিন্ধুতে আল্লাবক্স আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াৎ খাঁর মৃত্যু হলো এবং ১৯৪৩ সালে গভর্নরের চক্রান্তে বাংলায় ফজলুল হক পদচ্যুত হলেন ও বেআইনীভাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব লাভ করল। সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া প্রায় সব ক'টি মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশেই মুসলিম লীগ ক্ষমতা লাভ করলো বটে, কিন্তু তা রাজনীতির ঋজুপথে নয়, জনসাধারণের হৃদয় আশ্রয় করেও নয়—চক্রান্ত ও ইংরেজের সহায়তায় এবং কিছুটা স্বপক্ষ ঘটনাবিন্যাসে।

কংগ্রেসের সুনিবিড় প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে। কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতার স্বাক্ষর দেখেছে কংগ্রেসের কর্মপন্থায়, আদর্শে। সেখানে পথের মতানৈক্য ঘটলেও কংগ্রেস সম্পর্কে কারও মতানৈক্য ছিল না।

ইংরেজ কংগ্রেসের এই চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে। তাই দেশের মধ্যে কংগ্রেসকে প্রবল শত্রুর মধ্যে দাঁড় করাতে না পারলে তার শান্তি ছিল না। মুসলিম লীগ ইংরেজকে সেই শান্তি দিলো। অত্যন্ত খুশী হৃদয় ইংরেজ প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যের ভান করে বললে, কংগ্রেস তো সারা দেশের প্রতিনিধি নয়, আমরা কার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করব? আগে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের একটা মীমাংসা হোক।

সেই মীমাংসা হলো ১৯৪৭ সালে, দেশ বিভক্ত হয়ে।

তার আগে কংগ্রেস বার বার গেছে জিন্নার গৃহে। সুভাষ, জওহর, আজাদ, গান্ধী বার বার চেষ্টা করেছেন। জিন্না সকল মীমাংসার উর্দ্ধে। দেশকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ না করে দিলে কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। কোন যুক্তি কোন সৌজন্য, কোন রাজনৈতিক রীতির কোন ধার ধারেন না, তাঁর একটিমাত্র দাবী, তিনি অচল, অটল।

বার বার নেতৃবৃন্দ নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছেন।

আর জিন্না সাহেব মুসলমান জনসাধারণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আদেশ দিয়েছেন এক হও।

দূর দূর প্রান্তে এই আদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, মসজিদে মসজিদে নামাজের শেষে মোল্লা-মৌলবীরা অগ্নিবর্ষী ভাষায় হিন্দুবিদ্বেষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে গোপনে গোপনে মুসলমান জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন; মুসলিম লীগের পতাকার নিচে সমবেত হয়েছে অগণ্য অশিক্ষিত মানুষের দল, তাদের মাথার উপরে শিক্ষিত রাজনীতিবাদীরা কড়া কড়া ভাষায় হিন্দু ও কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েছে।

মহম্মদ আলী জিন্না হয়েছেন কায়েদ-ই-আজম। মুসলিম লীগের অবিম্বাদী নেতা, ডিক্টেটর।

তিনি দাবী করলেন, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চাই।

পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পথে হাজার হাজার শহীদের রক্তে স্নান করে কংগ্রেস যে নীতি স্বপ্ন ও আদর্শের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম

চালিয়ে এসেছে, পাকিস্তানের দাবী তার প্রতি চ্যালেঞ্জ। ইংরেজের চ্যালেঞ্জের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়।

তাই কংগ্রেস বার বার আপস করতে এসে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৭ সালেও অনন্যোপায় হয়ে তাঁদের রাজী হতে হয়েছিল দেশ বিভাগের চুক্তিতে।

পাকিস্তান আজ বাস্তব সত্য। কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানে জাতির জনক। তিনি এখন মৃত, তাঁব সাধনা সার্থক।

তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক!

॥ ২৬ ॥

১৯৪০ সালে রামগড় অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সভাপতির মনোনয়ন নিয়ে কিছুটা দ্বিধা ছিল হাইকম্যাণ্ড মহলে। কিন্তু গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল, এই দুর্যোগের দিনে মৌলানা সাহেব হোন সভাপতি। শুধু তাঁর জাতির প্রতি সর্বস্বত্যাগ অনুপম সেবা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার হিসাবে নয়, মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিত্বের নীতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যও এই মনোনয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

কংগ্রেস শুধু হিন্দু বা মুসলমানের নয়, কংগ্রেস সমগ্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সব ধর্মীয় ভারতীয়দের সম্মিলিত রূপ, সমবেত চেহারা, সংঘবদ্ধ ঐক্য আমাদের জাতি।

কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর জেদ ছাড়তে নারাজ। তিনি নাসিকা উচ্চকিত ও ভ্রূকুঞ্চিত করে মৌলানা সাহেবকে আখ্যা দিলেন হিন্দুদের শো-বয়।

মৌলানা সাহেবের একটি তারবার্তার উত্তরে জিন্নাসাহেব জবাব দিলেন, 'যেহেতু মুসলিম-ভারতের সর্বপ্রকার আস্থা আপনি হারিয়েছেন অতএব আপনার সঙ্গে পত্রালাপে বা অন্য কোন প্রকারে কোন আলোচনা করতে আমি অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। আপনি কি বোঝেন না যে, জাতীয়তার মিথ্যা চেহারা প্রকাশ করে বিদেশী জনমতকে প্রবঞ্চিত করার জন্য আপনাকে কংগ্রেসের শো-বয় সভাপতি করা হয়েছে! আপনি হিন্দু বা মুসলিম কারোরই প্রতিনিধিত্ব করেন না। কংগ্রেস সর্বাংশে হিন্দুপ্রতিষ্ঠান। আপনার যদি আত্মসম্মানবোধ থাকে তাহলে এক্ষুণি পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসুন। আপনার শক্তির বৃহৎ অংশ লীগের

বিরুদ্ধে শত্রুতা করে কেটেছে, কিন্তু আপনি জানেন তা পরিপূর্ণ ব্যর্থ। এইসব পরিত্যাগ করুন।'

কোটি কোটি জনসাধারণের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখনকার দিনে রাষ্ট্রদণ্ডহীন রাষ্ট্রপতি। তাঁকে কটূক্তি-ভর্ৎসনা-তিরস্কারে মুসলীম লীগের পত্র-পত্রিকার ও নেতৃবৃন্দের বিরাম ছিল না।

কেননা, মৌলানা সাহেব জাতীয়তার প্রতীক।

বোঝা গেল যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের অস্তিত্ব ভারতের বুকে সমাসীন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে মুসলীম লীগের মনোভাব অনমনীয়। স্বাধীনতার সূর্যালোক প্রবেশ না করলে লীগের মানসিক কুয়াশা কিছুতেই কাটবার নয়!

ইংরেজের সঙ্গে একটা লড়াই অনিবার্য। কিন্তু গান্ধী বল্লেন, জনসাধারণ এখনও প্রস্তুত হয় নি, অহিংস সংগ্রামের উপযুক্ত ক্ষেত্র এখনও যথোপযুক্ত দৃঢ়তায় নির্মিত নয়।

সেই সংগ্রামের পূর্বে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনসাধারণের যে কোন নৈতিক সমর্থন নেই, একথাটা নির্দ্বিধভাষায় জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

মহাত্মা সকল প্রকার হিংসা ও হিংস্র তাণ্ডবের বিরুদ্ধে আশ্চর্য আলোক-বর্তিকা। অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন, জীবন ও জনতার সকল বৈরিতার থেকে মুক্তিলাভের পথে অহিংসা তাঁর কাছে একমাত্র অস্ত্র।

এ অস্ত্র মানুষের প্রাণ নাশ করে না, প্রাণের রূপান্তর ঘটায়। হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায়। শয়তানের নবজন্ম ঘটায় দেবতায়।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হবে সত্যাগ্রহে, অসহযোগ আন্দোলনে নয়, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে। সভা বা শোভাযাত্রার কোন আড়ম্বর থাকবে না, বক্তৃতা ও উত্তেনার কোন উষ্ণ পটভূমিকা তৈরী হবে

না—কেবলমাত্র সত্যাগ্রহী এককভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বল্পকথায় প্রতিবাদ জানিয়ে কারাবরণ করবেন।

কংগ্রেসের মধ্যে সত্যাগ্রহের এই শীতল পথ নিয়ে গভীর মতানৈক্য ছিল। অনেকের মনে হয়েছে এই এক একজনের সত্যাগ্রহে কোটি-কোটি জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রখর দাগ পড়বে না, কোন প্রবল প্রভাব পড়বে না। একজন মানুষের এই প্রকার নিস্তরঙ্গ আন্দোলনে সুবিশাল জনসমুদ্রে কোন তরঙ্গ, কোন আলোড়নের সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু মহাত্মার জোর ছিল নৈতিকশক্তির উপর, বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না।

১৭ই অক্টোবর প্রথম সত্যাগ্রহ করলেন বিনোবা ভাবে। তখন বিনোবা খ্যাতিহীন কর্মীমাত্র, গান্ধী-আশ্রমের সর্বত্যাগী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্রে তার নাম প্রায় অশ্রুতপূর্ব। অনেকের মনে হতো, এমন গুরুত্বপূর্ণ একক আন্দোলনে খ্যাতিহীন ব্যক্তির প্রথম সত্যাগ্রহের ফলে দেশের জনচিত্তে কতদূর সাড়া পড়তে পারে? তাঁরা চেয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি বা জওহরলাল উদ্বোধন করুন এই আন্দোলনের, এই রকম অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির সত্যাগ্রহ ও কারাবরণের ফলে দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলবে।

কিন্তু মহাত্মা বল্লেন, বিনোবা ভাবে অহিংসার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এই অনন্যসাধারণ সত্যাশ্রয়ী করবেন সত্যাগ্রহের উদ্বোধন, খ্যাতি বা জন-প্রিয়তার কতখানি মূল্য, যত মূল্য সত্য ও অহিংসার। বিনোবা সত্য ও অহিংসার প্রবক্তা ও প্রতীক।

নির্দিষ্ট হলো, জওহরলাল হবেন দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী।

১৭ই অক্টোবর সকালবেলা ওয়ার্ধা থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাউনর গ্রামে বিনোবা সত্যাগ্রহ করলেন। কিন্তু সরকার সে সভা নিষিদ্ধও করলেন না, বিনোবাকে গ্রেপ্তারও করলেন না। চারদিন বিনোবা হেঁটে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে লাগলেন এবং যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ জানিয়ে

সত্যাগ্রহী মন্ত্র ঘোষণা করতে লাগলেন। ২১শে তারিখ পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য প্রেরণ করলো।

সত্যাগ্রহ করার আগেই জওহরলালকে গ্রেপ্তার করা হয় এলাহাবাদ স্টেশনে। পূর্ববর্তী কয়েকটি বক্তৃতার জন্য তাঁর বিচার হয়।

বিচারের ফলাফল অত্যন্ত কৌতুককর। বিনোবার শাস্তি হলো তিন মাস, জওহরলালের চার বছর।

ছ'মাসের মধ্যেই আন্দোলনের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা, পূর্বতন মন্ত্রী, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও খ্যাতনামা কর্মীরা সত্যাগ্রহ করে কারান্তরালে গমন করেন। প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি বন্দী ও দশহাজার টাকা জরিমানা আদায় হয়।

ঠিক এই সময় কংগ্রেসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজাগোপালাচারি নতুন ভঙ্গিতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা আরম্ভ করেন। মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে একটা আপস করে ইংরেজের দীর্ঘদিনের অভিযোগটাকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতা অধিকার করবার জন্য তিনি মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও গান্ধী স্বয়ং এই মতের বিরোধিতা করেন। মতানৈক্যতার জন্য রাজাগোপালাচারি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে এককভাবে তাঁর মতানুযায়ী কাজ করতে থাকেন। রাজাগোপালাচারি অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। অনেকে চাণক্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন।

তেলেগু ভাষায় তিনি একজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক। মাদ্রাজ কংগ্রেসের শীর্ষনেতা, মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের প্রশ্নটা মারাত্মক; তিনি 'সুপবিত্র ব্রাহ্মণ্য রক্তের' উত্তরাধিকারী কিন্তু শূদ্র মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর বৈবাহিক।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি নানারূপে দেখা দিয়েছেন; গবর্নর, গবর্ণর-জেনারেল, কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুখ্যসচিব কেবলমাত্র রাষ্ট্রদূতের পদ

ছাড়া অন্যান্য সকল পদে অধিষ্ঠান হয়ে কিছুটা অদ্ভুত নজীর স্থাপন করেছেন।

• কিন্তু সে সময়টা তাঁর পক্ষে শুভ ছিল না। কেননা, তাঁর মতামতটা কংগ্রেসী কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। তিনি মনে করতেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ইংরেজ এখন মানবতার সহায় হয়ে সংগ্রাম করছে, এই সময় যে কোনপ্রকার আন্দোলনই মনুষ্যত্বের সেই মুখ্য সংগ্রাম ব্যাহত করবে।

তাঁর এই মতামতের জন্য কংগ্রেস-অনুরক্ত জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি তাঁর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সংবাদপত্রের 'কলমে' নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও প্রত্যাঘাতে তাঁকে আক্রমণ করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক রেওয়াজ হয়ে পড়েছিল।

তখন ইউনাইটেড প্রেসের মাদ্রাজ শাখার সম্পাদক ছিলেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শশিভূষণ সেনগুপ্ত। আমার এই ভ্রাতার কথা আগেই বলেছি। রাজাগোপালাচারির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এই সময়েই গভীরতর পর্যায়ে আসে। তিনি অনেকসময় রাজনৈতিক আলোচনা ও পরামর্শের জন্য আমার ভাই-এর কাছে আসতেন, বয়সের পার্থক্যটা তাঁদের হৃদয়ের আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তাঁর অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ বিবৃতি এই সময় ইউনাইটেড প্রেস মারফত দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। যাঁর সঙ্গে মতে মেলে না, তাঁর কথাও শুনতে হবে বৈকি। তাঁর চিন্তায় যদি নতুন স্ফুলিঙ্গ থাকে, তাহ'লে আমার ভাবনাকে তা' প্রজ্জ্বলিত করে দিতে পারে। বুদ্ধির রাজ্যে তো শত্রুতা রাখা চলবে না কারোর সঙ্গে, চিন্তার রাজ্যে যে কোনপ্রকার অন্ধতা ও গোঁড়ামি বিসর্জন দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ, চিন্তার স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার তো দিতেই হবে।

ইংল্যাণ্ডে ভারতের নির্ভরযোগ্য সংবাদ জানবার জন্য এই সময় খুব আগ্রহ জেগে ওঠে। রয়টারের সরকার-ঘেঁষা সংবাদে তাঁদের পরিতৃপ্তি হতো না। ফলে, বিলেতের পত্রিকাগুলি ইউনাইটেড প্রেসের খবরের

জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। ডি, ভি, তাহামানকার ছিলেন লণ্ডনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন দক্ষ সাংবাদিক, নিজের দায়িত্বটুকু সর্বাংশে সার্থকভাবে প্রতিপালিত করার নৈপুণ্য ছিল তাঁর। অন্য ছিল প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি, সাহস ও কর্তব্য বোধ। বিলেতের বহু খ্যাতনামা রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, সেখানকার সংবাদপত্রের সঙ্গে ছিল তাঁর সখ্যতা। ভারতের আভ্যন্তরীণ সংবাদ, স্বাধীনতার আন্দোলন, দেশের কৃচ্ছ্রসাধন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি আমরা তাঁর কাছে পাঠাতাম। 'রেনল্ডস উইকলী' কাগজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সে কাগজ ছাড়াও 'টাইমস,' 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' 'ডেলিএক্সপ্রেস', 'নিউজ ক্রনিকল' প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহে এই সমস্ত সংবাদ তিনি প্রকাশ করতেন ইউ, পি, আই-এর নামে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভ্রান্তিজনক সংবাদ পরিবেশন করায় রয়টারের আপন স্বার্থ ছিল, সে-সব সংবাদে ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে অন্ধভ্রান্তি পোষণ করতো। ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে এই ভ্রান্তির অপসারণ ঘটতে লাগলো, যা সত্য তা প্রকাশিত হতে লাগলো। আমাদের এই সংবাদ পরিবেশনের ফলে ইংরেজ জনসাধারণ ভারতের পক্ষে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। স্যার স্টাফোর্ডের আপস-প্রস্তাব নিয়ে আসার পথ আমাদের কাজের ফলে কিছুটা সুগম হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

কিন্তু তবু তাহামানকারের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমাদের অর্থসঙ্গতির সীমাটা খুব সংকীর্ণ ছিল, তাঁর প্রয়োজন আমরা পূরণ করতে অসমর্থ ছিলাম। কিন্তু তবু, যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে, তাঁর কর্মপটুতায় মুগ্ধ মন তাঁকে প্রশংসা না করে পারে না।

রামগড় থেকে ক্রিপস মিশনের ভারতে আগমন পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন ও ওয়ার্কিং কমিটির বহু সভা হয়েছে। নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনায় এই কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে এই সকল ঘটনা আবর্তিত,

তাঁর কথা ও মনোভাবের প্রতি সারা দেশের অখণ্ড মনোযোগ। তিনি যখন পুণা ও পাঁচমাড়িতে থাকতেন, তখন আমাদের বোম্বে অফিসের সম্পাদক শ্রী জে এম দেব তাঁর ও ওয়ার্কিং কমিটির সংবাদ পাঠাতেন। মহাত্মা যখন ওয়ার্দ্ধা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী থাকতেন তখন আমাদের সহকর্মী শ্রীবীরেন সেনের ছিল সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব। বীরেন সেন কিছুকাল ফ্রি প্রেসে আমার সহকর্মী ছিলেন, পরে ইউনাইটেড প্রেসে বহুবৎসর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি পূর্বে ছিলেন বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক। অধ্যাপনার ফলে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাজাগোপালাচারি প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এই নেতৃবৃন্দ যখন বাঙলায় আসতেন তখন বীরেনবাবু তাঁদের বক্তৃতার তর্জমা করে দিতেন সভায়। সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর প্রভৃতি বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল।

বীরেনবাবু ছিলেন দক্ষ সাংবাদিক। দিনের বেলায় 'ভারত চেম্বার অব কমার্সে'র সহকারী সম্পাদক, রাত্রিবেলা ইউনাইটেড প্রেসের নৈশ সম্পাদক। তাঁর দক্ষতায় আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু অবশেষে ভারত-চেম্বার তাঁকে প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেছে, দায়িত্ব বেড়েছে পারিশ্রমিক বেড়েছে। এখন তিনি ইউনাইটেড প্রেসের কাজ ছেড়ে দিয়ে ভারত চেম্বারেই সর্বক্ষণ নিযুক্ত।

ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি তাঁর প্রীতি এখনও অফুরন্ত। দীর্ঘকাল এখানে তিনি হৃদয়ের গভীরতর পরিমণ্ডলে বাস করেছেন, আজ তিনি জীবিকার জন্য অন্যত্র দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর এখনও তিনি সন্ধ্যার দিকে ইউনাইটেড প্রেসের অফিসে গল্পগুজব করতে আসেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ও বন্ধুদের সাহচর্য তাঁকে ডাকে। তিনি সে ডাকে সাড়া দিয়ে আনন্দিত, তাঁর মধুর সঙ্গ পেয়ে তাঁর বন্ধুরাও আনন্দমুখর। বীরেন সেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য।

॥ ২৭ ॥

ক্রমশ যুদ্ধটা ইংরেজের পক্ষে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। হিটলার অবলীলাক্রমে জয় করে নিতে লাগলেন ইউরোপের রাজ্যের পর রাজ্য, মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান শক্তি ফ্রান্সের পতন ঘটলো প্রথম আঘাতেই। খাস ইংল্যাণ্ডেও জার্মান বিমানের আকস্মিক আক্রমণের প্রচণ্ড ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, লণ্ডন শহর ধ্বংসলীলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান সহজেই জয় করে নিলো ইংরেজ ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ঘাঁটিগুলি। ব্রহ্মের মাটিতে উড়লো জাপানী পতাকা, সিঙ্গাপুরে লুপ্ত হলো ইংরেজ আধিপত্য।

ভারতের সীমান্তে এসে লাগল শত্রুপক্ষের সীমানা। কলকাতা ও ফেণী-চট্টগ্রামে জাপানী বিমানের বোমা পড়ল। সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের বুক থেকে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত করে দেবার জন্য সশস্ত্রে ও সসৈন্যে প্রস্তুত হলেন। স্থাপন করলেন, অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের গভর্নমেণ্ট, 'আজাদ হিন্দ সরকার'।

ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অনন্যসাধারণ পুরুষ। যুগযুগান্ত ধরে তাঁর নাম ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মনে বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার করে যাবে।

১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী রাত্রি আটটায় উত্তর প্রদেশীয় মৌলবীর বেশে তিনি তাঁর কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি পরিত্যাগ করে যান একটি অন্ধকার রাত্রির প্রথমভাগে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে পরম উপভোগ্য দুঃসাহসিক বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর সূত্রপাত হলো সেদিন, তা যে কোন 'কল্পনা-বীর' ঔপন্যাসিকের কল্পনার থেকেও অত্যাশ্চর্য।

ব্রিটিশ পুলিস ও সাবধানী সি আই ডি-দের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে সুভাষচন্দ্র সোজা পেশোয়ার চলে গেলেন।

সেখান থেকে এক বোবা ও কালা পাঠানের বেশে কাবুল। নাম দিলেন 'জিয়াউদ্দিন। 'নওজোয়ান ভারত সভার' সেক্রেটারী শ্রীভগৎরাম হলেন তাঁর সহচর, তিনি ছদ্মনাম নিলেন রহমৎ খাঁ।।

ভারত সীমান্ত পার হয়ে গেলেন তাঁরা। পদব্রজে। দুঃসাহসে ভর করে বিনানৌকায় পার হলেন কাবুলনদী।

কাবুলে পেলেন উত্তমচাঁদের সাহায্য। তাঁর সহায়তায় সোজা বার্লিন চলে গেলেন সুভাষচন্দ্র। ইংরেজের চরম শত্রু জার্মান। ভারতভূমির চরম শত্রু ইংরেজ, ইংরেজের শত্রু জার্মান।

১৯৪২ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের হাতে ইংরেজ পরাজিত হতে লাগলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর বন্দরের পতন হলো।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বহুতর ভারতীর প্রজা ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রেরণায় তাঁরা সংগঠিত হলেন। কিছুদিন পর সেই সংগঠনের নেতৃত্বে নিলেন সুভাষচন্দ্র। ভারতবর্ষে যুগে যুগে যত মহাপ্রাণ ও মহাবীর সন্তান জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

নেতাজী স্থাপন করলেন 'আজাদ হিন্দ সরকার' ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজ।' ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ শক্তিকে পরাজিত করে বিতাড়িত করার জন্যে সিঙ্গাপুরে এক উজ্জ্বল প্রেরণা জেগে ওঠলো। সেই প্রেরণার ধ্বনি দিলেন নেতাজী : 'দিল্লী চলো!'

কতো দূর দিল্লী? ভারতের রাজধানী। পাহাড় গিরি নদী নালা সমুদ্রের সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা যাবেন দিল্লী—সেখানে লালকেল্লায় তুলবেন স্বাধীনতার পতাকা। দেড় শতাব্দী ধরে যে ইংরেজ পশুশক্তি মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধেছে, অস্ত্রের আঘাতে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন।

আজাদ হিন্দের হেড কোয়ার্টার ছিল সিঙ্গাপুর। মালয়, জাভা, বোর্নিও, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, সুমাত্রা, সেলিবিস প্রভৃতি বহুতর দেশে তার অসংখ্য শাখা। জার্মান, ইতালী ও জাপান সরকার আজাদ হিন্দ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। ইংরেজ ভয়ে কম্পমান।

ব্রহ্মদেশে ইংরেজের পতন হলে ভারতের বুকে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে নেতাজী প্রস্তুত হলেন। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয়ে গেল মহাসংগ্রামে। যুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হলো।

কোহিমার বুকে স্বাধীন ভারতের পতাকা তুললেন বীর আজাদ হিন্দ ফৌজ। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যে সংগ্রাম চলে এসেছে ভারতের বুকে, তার পরম শীর্ষবিন্দু। পরাহত ইংরেজ শক্তিকে শক্তির জোরে বিতাড়িত করে ভারতের একখণ্ড মাটি হলো স্বাধীন, সত্যিকারের স্বাধীন।

কিন্তু তারপর নেমে এলো বিষণ্ণতার অধ্যায়। নেতাজীকে সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করতে হলো। তাঁর শেষ নির্দেশে নেতাজী বলেছিলেন :

"আদাজ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি :—

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আপনারা যেখানে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং এখনও চালাচ্ছেন, আজ গভীর বেদনার সঙ্গে আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু উহা প্রথম চেষ্টাই মাত্র। আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থায়ই আমি পরাজয় মেনে নেব না।"

তারপর আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী—কেউ বলেন আহত, কেউ বলেন মৃত।

কয়েক বছর ধরে নানাজনে নানা কথা বলেন। দেহধারী নেতাজী আজ আমাদের এখানে অনুপস্থিত—সারা দেশের আকুল প্রার্থনা—তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ কর।

নেতাজীর সশস্ত্র সংগ্রাম ইংরেজের মনে বিষম ভয় জাগিয়ে দিয়েছে। তাঁরা অনুভব করতে পেরেছেন, যে জাগ্রত প্রাণ ভারতের বুকে আত্মপ্রকাশ

করেছে, তাকে বিনষ্ট করা যাবে না। কোন রকম অত্যাচারের প্রহরণ দিয়েই একে ধ্বংস করা চলবে না।

১৯৪৫ থেকে ভারতের সঙ্গে ইংরেজের আপস প্রস্তাবের মূলে কাজ করেছে নেতাজীর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যে স্বাধীনতার পতাকা উড়েছে লালকেল্লায়, সেই উজ্জ্বল দিনকে এগিয়ে দিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র—সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সন্তান।

চারদিকের এই বিপদের ঘনঘটায় ইংরেজ চঞ্চল হয়ে উঠল। শঙ্কিত হলো ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কে। কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপস করে তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করবার সদিচ্ছা জাগ্রত হলো। নতুবা আশঙ্কা হলো, ভারতীয় জনসাধারণের আনুকূল্যে জাপান সহজেই জয় করে নেবে ভারতবর্ষ।

কিন্তু কে এই আপস-আলোচনা চালাবার মতো যোগ্যতা রাখে? ইংরেজের প্রতি ভারতীয়দের ঘৃণা সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিবিদদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁরা জানতেন, দীর্ঘকাল ধরে ভারতের প্রতি নানা প্রতিশ্রুতি তাঁরা যেভাবে নির্বিবাদে ভেঙেছেন এবং নির্বিচারে দুঃশাসনের রথ চালিয়েছেন, তাতে তাঁদের প্রতি কংগ্রেস বা ভারতীয় জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থাও থাকতে পারে না। এই দুঃসময়ে নজর পড়ল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রতি।

সদ্য তিনি রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। রাশিয়াতে কম্যুনিস্ট সরকারের সঙ্গে তিনি যেরকম সাফল্যের সঙ্গে ইংরেজের চুক্তি সম্পাদিত করেছেন, তাতে মিত্রপক্ষের মস্ত কূটনৈতিক জয় হয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে উৎফুল্ল হয়েছে ইংরেজ নরনারী, অজস্র অভিনন্দন ও জয়মাল্যে তিনি বরণীয় হয়েছেন স্বদেশে।

মনে হয়েছে, এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে সহজেই তুলে দেবে প্রধান মন্ত্রিত্বের আসনে। চার্চিলের পরে তিনিই হবেন ইংরেজ জাতির ভাগ্যবিধাতা।

ভারতের প্রতি তাঁর সহানুভূতি গোপন ছিল না, জওহরলাল নেহরুর তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগে দু'বার ভারত ঘুরে এসেছেন, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে। এবং অনেকটা সোশ্যালিস্ট মতবাদের জন্য ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট তাঁর কিছুটা জনপ্রিয়তাও বর্তমান।

তিনি তখন মন্ত্রিসভার সদস্য, কমন্স সভার নেতা।

ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে একটা আপস-প্রস্তাব আলোচনার জন্য তাঁকে নির্বাচিত করলেন বৃটিশ সরকার। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পূর্বসৌহার্দ্য স্মরণ করে তিনিও তাঁর সাফল্য সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই ভারতে যাত্রা করলেন।

ইতিহাসের পাতায় একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নিম্নাবতরণের সিঁড়ি তৈরি হলো।

ক্রীপস ইংল্যাণ্ডের উঁচুস্তরের ব্যারিস্টার। আইন জ্ঞান ও ঘটনা পর্যালোচনার নৈপুণ্য তাঁকে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর আইনজীবীরূপে খ্যাতি দিয়েছিল। তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাসও অত্যন্ত প্রবল। বুদ্ধি, জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর চরিত্রে মিশেছিল সপ্রতিভ আন্তরিকতার বর্ণমালা। তাঁর প্রকৃতি সদাহাস্যময়, শোভন এবং প্রীতিউজ্জ্বল। তাই তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকর্ষণ করত, এই আকর্ষণের মাধুর্য দিয়ে তিনি খুব সহজেই সকলের প্রিয়বন্ধু হয়ে উঠতে পারতেন।

আপস-আলোচনার পক্ষে তাই ক্রীপস বোধ হয় সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। অন্তত সেই সময়।

কিন্তু তবু ক্রীপস ব্যর্থ হলেন, কেননা, ভারতবর্ষের স্বরাজ-সাধনা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে, সুস্পষ্ট স্বাধীনতার শর্ত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা আর সম্ভব ছিল না।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে পৌঁছবার পূর্বে কমন্স সভায় ১১ই মার্চ (১৯৪০) ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এক দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। চার্চিল সাহেব সুলেখক, সুবক্তা—ভাষার বর্ণলিপিতে তিনি বক্তব্যকে তার

ইচ্ছামত রূপ দিতে জানেন। বিবৃতিতে তিনি ব্যক্ত করলেন যে, জাপানের অগ্রগতিতে যে সর্বনাশা বিপদ উপস্থিত, তার থেকে ভারতের জনসাধারণকে রক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ড উদ্‌গ্রীব। তদনুসারে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এক আপস-প্রস্তাব আলোচনার জন্য লর্ড প্রিভি সীল ও কমন্স সভার নেতা (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস) অবিলম্বে ভারত অভিমুখে যাত্রা করবেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের যেপ্রতিশ্রুতি দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দান করে এসেছেন, এই আপস-আলোচনায় তা-ই মূর্ত হয়ে উঠবে।

চার্চিল একদা মহাত্মা গান্ধীকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের নেতা ভারতবর্ষের স্বরাজ-আদন্দোলনের মুখ্যতম শত্রু। তাই তাঁর প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক বিরূপতা সর্বদাই ছিল, এখনও তার হ্রাস ঘটেনি। কিন্তু তবু সকলেই এবার আশা করতে লাগলেন যে, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে ইংরেজ রাজনীতিবিদেরা হয়তো একটা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব করবেন। ক্রীপসের মনোনয়নে এই মনোভাবটা আরো সক্রিয় হয়ে উঠলো।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আশার সঞ্চার হয়েছিল। দু' পুরুষ ধরে ভারত যে আত্মত্যাগের সুকঠিন পথে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, মনে হয়েছিল, হয়তো এতদিনে অধিকাংশ স্বপ্ন সফল হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কারাবরণ ও শত শত শহীদের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বরাজসাধনা, দুর্গম পথের দুঃসহ যাত্রা। মনে হয়েছিল, এই যাত্রার বুঝি শেষ হলো, বুঝি আমরা গন্তব্যের চূড়া দেখতে পেলাম।

স্যার স্ট্যাফোর্ডের আচার, আচরণ ও কথাবার্তায় এমন একটা বন্ধুত্বের আমেজ ও রঙ ছিল, যাতে জনসাধারণের এই আশাটা আরো বলবতী হয়ে উঠলো। তিনি বড়লাট প্রাসাদে না উঠে বাস করতে লাগলেন বে-সরকারীভাবে। কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের

সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ও নেতৃবৃন্দের সহাস্য চেহারা দিনের পর দিন প্রকাশিত হতে লাগল। ছবিতে যে মধুর হাসির মনোরম ভঙ্গী ছিল, প্রতিদিন জনসাধারণের মনে তা প্রবল প্রভাব ছড়িয়ে দিতে লাগল। সকলেই আশা করতে লাগলেন, ভারতের বন্ধু হয়ে এসেছেন ক্রীপস, ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবশ্য ঘটবে অচিরবিলম্বে।

অবিলম্বে ক্রীপস জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি প্রতিদিন সাঁতার কাটতে যেতেন পুকুরে, অসংখ্য মানুষ তাঁর পাশে ভিড় করে তাঁকে দেখতো। তাঁর হাসি, তাঁর বন্ধুর মতো ব্যবহার, তাঁর আন্তরিকতা একটা সবল রেখার মতো ঋজু আনন্দের প্রবাহ ছড়িয়ে দিলো মানুষের মনে। ভারত উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী খুব আশান্বিত হতে পারলেন না। স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল বছর দুই আগে, ওয়ার্ধায়, তাঁর আশ্রমে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সামান্য সে পরিচয় তিনি প্রায় বিস্মৃত হয়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল তাঁর কাছে নানা কথাবার্তায় ক্রীপসের খুব প্রপংসা করেন, ক্রীপস নাকি কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তথাপি ক্রীপসের আপস-প্রস্তাব শুনে তিনি নিরাশ হলেন।

এই নৈরাশ্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায়। ক্রীপস প্রথমে কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রস্তাব শুনে মৌলানার মনে যখন নৈরাশ্য ভরে উঠেছে, তখন ক্রীপস তাঁকে জানালেন যে, প্রস্তাবানুযায়ী বড়লাটের যে মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হবে, তা হুবহু ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার মতো।

ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা কমন্স সভার নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে দায়ী। মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতির প্রতিভূ ও শাসনাধি-

কারী। তাই মৌলানা আজাদ কিছুটা আশান্বিত হয়ে ১০ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ক্রীপস-প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা হলো। সকল শর্ত ও প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হলো।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ক্রীপসের খুব আগ্রহ জন্মে। তিনি নানাভাবে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই গান্ধী শুধু সৌজন্য রক্ষার জন্য দিল্লীতে এসে ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রস্তাবটি শুনে গান্ধী ক্রীপসকে বলেছিলেন, 'এই যদি আপনার প্রস্তাব হয়ে থাকে, তাহলে কেন আপনি কষ্ট করে এসেছেন? এই যদি ভারত-বর্ষকে দেবার মতো আপনার প্রস্তাবের পুরো চেহারা হয়, তাহলে পরবর্তী এরোপ্লেনে দেশে চলে যাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাব।'

গম্ভীর ক্রীপস বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখব।'

প্রস্তাবটিতে ভারতের গ্রহণযোগ্য বিধি-ব্যবস্থার একান্ত অভাব ছিল। কংগ্রেস প্রথম দৃষ্টিতেই প্রস্তাবটি প্রায় প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু তবুও ক্রীপসের আগ্রহাতিশয্যে আলোচনা অর্থহীনভাবে স্তিমিত মেজাজে অগ্রসর হয়। জিন্না, লিয়াকৎ আলী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু ক্রীপস জানতেন, দেশের আসল প্রতিনিধি কংগ্রেস, তাই কংগ্রেসের প্রতিই তাঁর সর্বাধিক আকর্ষণ ছিল।

ক্রীপস-প্রস্তাবের দিকে শুধু সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টিই নিবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সকল দেশই এদিকে সাগ্রহে তাকিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজ-ভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল জনসন এই উপলক্ষে ভারতে প্রত্যক্ষ-ভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসেন। দিল্লী বিমান বন্দরে অবতরণ করেই তিনি সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেন, 'ক্রীপস-আলোচনার খবর কি?'

ক্রীপস-আলোচনার খবর বাইরে থেকে দেখতে মনোরম। প্রতিদিনিই খবরের কাগজে সহাস্য ক্রীপস ও কোন বিশিষ্ট নেতার ছবি দেখতে পাওয়া

যাচ্ছিল। এ ছবি আলোচনা অন্তের। অর্থাৎ এমন একটা ভাব তীব্রতর ভঙ্গীতে প্রচার করা, খবর শুভ, ক্রীপস এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তাতে নেতৃবৃন্দ খুব খুশী।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে আলোচনা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, ক্রীপস তা নির্দ্বিধায় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মনের ভারসাম্যটা ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসকে বলেছিলেন, স্বাধীনতার কথা। বোঝাচ্ছিলেন, এই প্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ, তা তিনি জানেন, কিন্তু এই দৌত্য যদি সফল হয়, তাহলে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদাসীন হতে পারবেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না। আবার ক্রুদ্ধ হয়ে ভয় দেখাতেও কসুর করেন নি, আভাসে জানিয়ে দিচ্ছিলেন, এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে নির্মম নিষ্পেষণে কংগ্রেসকে চুরমার করতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দ্বিধা করবে না।

কংগ্রেসের কাছে যে সুর, মুসলিম লীগের কাছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইঙ্গিতে পাকিস্থানের দাবীর সমর্থন জানিয়ে তাঁদের প্রবোধ দিচ্ছিলেন যে, প্রস্তাবে পাকিস্থান স্থাপন করবার সুযোগ রাখা হয়েছে।

তবু সব বিফল হলো। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রস্তাবটি সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করল।

কৌশলে জয় করবার একটি কূটনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ক্রীপস ফিরে গেলেন।

মহাত্মা গান্ধী বললেন, 'অচল ব্যাঙ্কের একটি দূরবর্তী দিনের চেক নিয়ে এসেছিলেন ক্রীপস।'

ক্রীপসের আগমন ঘটেছিল আশার জ্যোতি জ্বলিয়ে। তাঁর প্রচার কৌশল, ব্যবহারের স্নিগ্ধতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁর প্রতি বিপুল জনসাধারণের আস্থা স্থাপিত হয়েছিল। জয়মাল্য ও জনপ্রিয়তার রাজপথ দিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার তৃষ্ণা যেখানে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণপিপাসা জাগিয়ে তুলেছে, সেখানে শুধু কথার বাষ্প

দিয়ে তো হৃদয় ভোলানো সম্ভব নয়। আসতে হবে আন্তরিকতায়, আসতে হবে অমৃত বারিধি নিয়ে। ক্রীপস এলেন ভুয়া বন্ধুর বেশ পরে, মেকি কথার হাওয়া উড়িয়ে, কূটনৈতিক কৌশলের পাল তুলে দিয়ে। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সাংবাদিকদের ডেকে 'প্রেস কনফারেন্স' বসাতেন ক্রীপস। নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। ক্রীপসের প্রত্যেকটি 'প্রেস কনফারেন্সে' উপস্থিত থেকেছি আমি। কৌশলী আইনজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবহারজীবী হয়েও অনেক সময় সাংবাদিকদের কূটপ্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি। তাঁর এই অধৈর্যের একটা অন্যতম মুখ্য কারণ, যদি এই আপস আলোচনা ব্যর্থ হয়, তাহলে ইংল্যাণ্ডে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যতও নষ্ট হয়ে যাবে।

ইতিহাস প্রত্যক্ষ করল একটি সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের করুণ ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে নেমে এল নৈরাশ্যের অন্ধকার। ক্রীপস ফিরে গেলেন সেই অন্ধকার যবনিকার মধ্য দিয়ে। ফিরে গেলেন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিতক্তে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কয়েক মাস পরেই ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ ভারত ছাড়!' ভারতবর্ষের আকাশে বজ্রে বজ্রে বিদ্যুৎ খেলে গেল, হৃদয়ে হৃদয়ে রোমাঞ্চ। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতবর্ষ আবার বহ্নিমান হয়ে গেল।

॥ ২৮ ॥

বিফলমনোরথ সার স্ট্যাফোর্ড ভারত ত্যাগ করলেন। তাঁর সুগভীর আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই নৈরাশ্যের আলোড়নটা তাঁর ব্যক্তিত্বকে নাড়া দিয়ে গেল। কংগ্রেসের সহযোগিতা তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল বন্ধুত্বের দাবীতে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড তো ব্যক্তিগতভাবে অতিথি হন নি তাঁর বন্ধু জওহরলাল নেহরুর দেশে, তিনি এসেছিলেন প্রভুজাতির প্রতিভূ হয়ে পরাধীন জাতির কোটি কোটি মানুষের জীবন-বাঁচনের প্রশ্ন নিয়ে। যেখানে জাতীয় প্রশ্ন সেখানে ব্যক্তিগত প্রীতিই যদি সর্বাধিক মূল্যবান হয়, তাহলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে বিবেচিত হতেন দেশদ্রোহীরূপে।

আপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো কংগ্রেস, ক্রীপসের দৃঢ়মূল আশা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আশাভঙ্গ থেকে জন্ম ক্রোধের। ক্রীপসের এই ক্রুদ্ধ মনের চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠলো তাঁর নানা অযৌক্তিক কটূক্তিতে। তিনি বল্লেন, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সজ্ঘর্ষের ফলেই তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কংগ্রেসের অনমনীয় নিবুদ্ধিতার জন্যই ব্রিটেনের এমন সদাশয় রাজনৈতিক উপহার অগ্রাহ্য হলো।

জওহরলালের উত্তর এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বল্লেন, 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ক্রীপসের মতো লোকও শয়তানের দূতরূপে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেন।' দেশের স্বাধীনতা চেয়েছে কংগ্রেস, ক্রীপস পরম বন্ধুর বেশে কংগ্রেসকে লোভ দেখিয়েছে বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের কতকগুলো ক্ষমতাহীন সভ্যপদের চকমকি অলঙ্কার। যুদ্ধের বিপদে সন্ত্রস্ত হয়ে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের একটি বিচিত্র কূটনৈতিক ফন্দি

ফেঁদেছিল ব্রিটিশ সরকার। কংগ্রেস সে মায়ামৃগ দেখে ভোলে নি। দিল্লী ও লণ্ডনের বেতারে এবং ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভায় পর্যায়ক্রমে তাই ক্রীপস, 'আমেরি ও চার্চিল রোষদৃপ্ত ভঙ্গীতে শাসিয়েছেন, কংগ্রেস বেয়াদব, ভারতীয়দের আমরা দেখে নেব।

ক্রীপস যখন এলেন দেশের চারদিকে তখন আশার নতুন সূর্যালোক। কিন্তু তখনই মহাত্মা গান্ধী বুঝেছিলেন, ব্রিটেনের প্রস্তাব ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়। ক্রীপস যখন চলে গেলেন, দেশের চারদিকে তখন নৈরাশ্যের অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জ্যোতির্ময়কে আহ্বান করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন, 'ইংরেজ ভারত ছাড়!'

ভারতবর্ষের অর্ধ শতাব্দীর সাধনা একটি অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ করলো। 'ইংরেজ ভারত ছাড়! কুইট ইণ্ডিয়া।' স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলেই ইংরেজের পুলিস গুলী করে হত্যা করেছে ভারতীয়দের। শত শত শহীদ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু পরিত্যাগ করেন নি দেশ-মাতৃকার জয়ধ্বনি। এই জয়ধ্বনি ক্রমশ নির্ভয় নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার দৃপ্ত তেজে জ্বলে উঠলো। মহাত্মা ঘোষণা করলেন, ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতীয়দেরই ব্যাপার, ইংরেজ ক্ষমতা ত্যাগ করে চলে গেলেই এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সুহৃদ মকিন সাংবাদিক লুই ফিশার মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই ভারত ছাড় পরিকল্পনাটি কখন আপনার মনে জেগে উঠেছিল?'

মহাত্মা জবাব দিয়েছিলেন, 'ক্রীপস চলে যাবার অল্প কিছুদিন পরে হোরেস আলেক্সাণ্ডারকে তাঁর একটি চিঠির উত্তর লিখেছিলাম। তখনই এই চিন্তাটা আমার মাথায় ঢোকে, তারপর এই সম্পর্কে প্রচার চলতে থাকে। পরে আমি একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রচনা করি। আমার প্রথম অনুভূতি ছিল—ক্রীপস ব্যর্থতার একটা প্রতিক্রিয়া একান্ত আবশ্যক। ধরুন, আমি তাঁদের ভারত ত্যাগ করতে বল্লাম। বহুদিন ধরে আমাদের মনে

যে অতুচ্চ কামনা ব্যাহত হয়ে গভীর দাগ কেটে বসেছিল, এই সঙ্কল্পটা তার থেকেই জন্ম নেওয়া। ইংরেজদের উপস্থিতি আমাদের অগ্রগতির অন্তরায়। সোমবারের মৌন-দিবসে এই পরিকল্পনাটা আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

মৌনদিবস সাধনা আত্মোপলব্ধির দিন। ভারতে সাধনা ও আত্মোপলব্ধি জাতির জনক গান্ধীর কণ্ঠে প্রখর সূর্যালোকের মতো জ্বলে উঠলো, 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। ইংরেজ ভারত ছাড়।'

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 'ভারত ছাড়' মন্ত্রটি ভারতের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। মহাত্মা ঘোষণা করলেন 'ভারতে যে কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটুক, ভারতবর্ষের এবং ইংল্যাণ্ডেরও যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করছে ইংরেজের সময়োচিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত ত্যাগের উপর।' ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে ভারত সচিব আমেরি কমন্স সভায় একটি দীর্ঘ কটূক্তিতে পূর্ণ বক্তৃতা করেন। মহাত্মা তার জবাব দিলেন অনতিবিলম্বে, 'ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা কেন স্বীকার করেন না, এই অন্তর্দ্বন্দ্বটা ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার? ইংরেজ ভারত পরিত্যাগ করে যাক। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলগুলি নিজেদের স্বার্থের জন্যই মিলিত হবে।' মহাত্মা আরও বল্লেন, 'শ্বেত জাতির অহমিকা যদি লুপ্ত না হয়, তাহলে গণতন্ত্র সভ্যতা রক্ষার বাক্যাড়ম্বর উচ্চারণ করার কোন অধিকারই তাঁদের থাকতে পারে না।'

এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির চারদিনব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায় মহাত্মা গান্ধী রচিত প্রস্তাবটি আলোচিত হলো। মহাত্মা স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তিনি তাঁর প্রস্তাবটি ওয়াকিং কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলোচনায় প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত

হলো, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যা হলো। অবশেষে কিছু পরিমার্জিতরূপে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

- এলাহাবাদ অধিবেশনের দু'মাস পরে ওয়ার্ধায় ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং 'কমিটির পুনরধিবেশন বসল। সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল 'দিনের পর দিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে এবং জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তা' থেকে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান না ঘটলে এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার অবসান হবে না। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এবং ভারতকে শত্রুহস্ত থেকে রক্ষা করবার জন্য অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর একান্ত আবশ্যক। ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার অর্থ এই নয় যে, সব ইংরেজই ভারত ছেড়ে চলে যাক। বস্তুত সদিচ্ছার সঙ্গে শাসনভার হস্তান্তরিত হলে ইংরেজদের ভারতে থাকার কোন বাধাই নেই। এই আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কংগ্রেস অহিংস সংগ্রামে অর্জিত সকল শক্তি নিয়ে এই রাজনৈতিক দাবী পূরণ ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হবে।'

দুর্গম যাত্রাপথের জন্য দেশপ্রাণ নরনারী প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আসন্ন, দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এই দুর্নিবার প্রতিজ্ঞায় প্রতিটি দেশসেবকের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!'

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশ জাপানের করতলগত হয়েছে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন সম্পূর্ণ লুপ্ত, জাপানের তীব্র আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় ইংরেজ বাহিনী পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছে। ব্রিটিশের পলায়ন ঘটেছে হতলজ্জার কলঙ্ক-কালিমায়।

কিন্তু কেবল পরাজয়ের মধ্যেই ইংরেজের জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়ে নি, ইংরেজের শাসন ও রক্ষার ক্ষমতা কতো ভিত্তিহীন, কতো অক্ষম ও

অপদার্থ—বার্মাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। জাপানী আক্রমণের আগেই সেখানে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়, ব্রহ্মদেশীয় নাগরিকরা উন্মত্তের মতো আচরণ আরম্ভ করে, প্রবাসী ভারতীয়রা প্রাণভয়ে মাতৃভূমির দিকে পলায়ন করতে থাকে। ইউরোপীয়দের পলায়নের ব্যবস্থা যথাযথ সুব্যবস্থায় পালিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয়দের লাঞ্ছনার সীমা থাকে নি। সারা জীবনের সঞ্চয় ফেলে তারা প্রাণের দায়ে ছুটে এসেছে, অত্যধিক ঐশ্বর্যবানরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষের না জুটেছে উড়োজাহাজে স্থান, না জুটেছে জল-জাহাজে টিকিট। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবার সহ তারা দুর্গম পথে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এসেছে, পথে কিছু মারা পড়েছে রোগ-যন্ত্রণায়, কিছু নিহত হয়েছে চোর-ডাকাতের আক্রমণে। অবশেষে হাজার হাজার মৃতপ্রায় নরনারীর মিছিল এসে ভারতে পৌছায় তাদের অধিকাংশ দুর্দশার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের চেহারা দেখে দেশের সর্বত্র গভীর সমবেদনা তো জাগেই, ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট রোষও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজের চেহারা দেখেছে ভারতবর্ষ লোভী নির্মম রাজ-পুরুষের। সেখানে দয়ামায়া নেই, বাণিজ্যের মানদণ্ডের বিচার করে তাঁরা শাসন চালিয়ে গেছেন। শাসন শুধু শোষণেরই যন্ত্র। শোষণে অর্জিত স্ফীতকায় ঐশ্বযভাণ্ডার নিয়ে তাঁরা ইংলণ্ডে পৃথিবীর বৃহত্তম জমিদার হয়েছেন, প্রজা ভারতবর্ষের দিকে মানবীয় দৃষ্টিপাত করার প্রবৃত্তি হয় নি। যেখানে স্বাধীনতার তৃষ্ণা জেগেছে, সেখানে নির্মম নিষ্পেষণে তার আমূল উচ্ছেদ করার ব্যাপকতম চেষ্টা হয়েছে। পুলিসের লাঠি চালনা, পাইকারী জরিমানা, দীর্ঘ দিনের কারাদণ্ড এবং সৈন্যবাহিনীর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ যত্রতত্র ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন মূল্যায়ন থাকে নি, পশুর পালের যতটুকু দাম তার থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনচেতা স্বেচ্ছা-সেবকদের বেশি মূল্য ছিল না শাসকদের বিচারে।

১৯০৫ থেকে প্রায় দু'পুরুষ এই চিত্র ভারতবর্ষের। দু' পুরুষ ধরে

শত শত শহীদকে যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, কিন্তু পরশাসনের নিষ্ঠুর যন্ত্রকে নির্বাসিত করতে পারে নি। পারে নি তার একটা কারণ অস্বীকার করে লাভ নেই যে, জনসাধারণের একটা বিপুল অংশে 'মহারাণীর' রাজত্বের প্রতি সম্ভ্রম প্রীতি ও সভয় ভক্তি ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও সচ্ছল জীবনের মোহে তারা ইংরেজের শুধু বশ্যতা স্বীকারই করে নি, আজানুনমিত হয়ে তাঁদের পদসেবা করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা যতই ভারতের কাছে এসে পড়তে লাগল, এই সভয় আনুগত্যটাও ভেঙে চুরমার হতে লাগল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ব্রহ্মদেশে ইংরেজের অভূতপূর্ব পরাজয় জনসাধারণের মনে ইংরেজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। মিশরে ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে হিটলারের অবিশ্বাস্য জয়লাভের দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটতে লাগল ভারতের পল্লী ও শহরবাসী মানুষের মনে।

এই পটভূমিকায় মহাত্মা গান্ধী আহ্বান করলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' দেহের শেষ শোণিত বিন্দু দিয়েও দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে হবে। ভারতবর্ষে আশ্চর্য আলোড়ন জাগল।

৮ই আগস্ট ১৯৪২ কংগ্রেস অধিবেশনের তারিখ। এই অধিবেশন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে, সংবাদসেবী হিসাবে আমরা তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে গোপনে ষড়যন্ত্র করে ৯ই আগস্টকে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে যাবার ব্যবস্থা করবেন, আমরা তা সামান্য মাত্রও আন্দাজ করতে পারি নি।

যথানিয়মে আমাদের বোম্বে যাত্রার আয়োজন করা হল। আগামী আন্দোলন দেশের সর্বশেষ মুক্তি-সংগ্রাম হবে, তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না। এই সংগ্রামে আমাদের যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদন করার নানা পরিকল্পনা আরম্ভ করে দিলাম। আশা ছিল, হাতে কয়েক মাস সময় আছে, ভারতের সর্বত্র সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের আরো সুষ্ঠু ও

ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। যেহেতু 'রয়টার' ইংরেজ প্রতিষ্ঠান, তাই তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে আন্দোলনের অনিষ্ট সাধন করার চেষ্টা করবে, এমন আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় এই রকম ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে। ইউনাইটেড প্রেস ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, তাই মুক্তিযুদ্ধের আপদকালে আমাদের কর্তব্য অনন্যসাধারণ দায়িত্বশীল। ইংরেজের চণ্ডনীতির বেড়া অতিক্রম করে ভারতের সকল সংবাদপত্রে মুক্তিকামী দেশের খবর পৌঁছে দিতেই হবে। পৌঁছে দিতে হবে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ, জনসাধারণের নির্ভয় আত্মত্যাগের কাহিনী। স্বাধীনতার প্রেরণা সংবাদ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তুলে ধরতে হবে।

মনের মধ্যে যৌবনের স্বাদ যেতে লাগলাম। ছেলেবেলার আশ্চর্য গণ সংগ্রামের সব স্মৃতি ভেসে বেড়াতে লাগল। বোম্বেতে যখন পৌছলাম, তখন ঐতিহাসিক অধিবেশনের আর বিলম্ব নেই। সব প্রদেশ থেকে এসে পৌছেছে কর্মীর দল, সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সকলেই অধীর আগ্রহে উৎসুক, সকলের রক্তেই মহাত্মার রণভেরী দুঃসহ শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে। সকলেই জানতে চায়, আন্দোলন কবে সুরু।

ভারতের সর্বত্র আন্দোলনের নিশানা পৌছে গেছে। কিন্তু প্রস্তুতি শেষ হয় নি। বোম্বে অধিবেশনে মহাত্মার প্রস্তাব পাশ হবে তারপর বড়লাটের দরবারে মহাত্মা স্বাধীনতার দাবী পেশ করবেন। ইংরেজ সে দাবী পদদলিত করবে নিঃসন্দেহে। তখন, একমাত্র সে সময়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করবে।

সকলেই সময়ের হিসাব কষছিলেন। এক মাস, না দু' মাস? কিন্তু কেউ জানতো না, বড়লাটের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা চাপিয়ে দেবার দিন নির্দিষ্ট হয়েছে ৯ই আগস্ট।

৮ই আগস্ট, ১৯৪২।

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল দিন। ধুবীতলায়

কংগ্রেস অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ সমবেত, তাঁদের মুখ আগামী সংগ্রামের প্রভূত সাহসে ভাস্বর। সারা দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত, মুক্তিযুদ্ধের তেজ তাঁদের চেহারায়।

মহাত্মা গান্ধী অধিবেশনে বক্তৃতা দিলেন। বুদ্ধের মতো সদাহাস্যময় প্রশান্ত মূর্তি। অহিংসা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক। ভারতের এক ঐতিহাসিক যুগের সর্বজনঅধিনায়ক বাপুজী। কী আশ্চর্য তাঁর কণ্ঠ, তাঁর বাগ্‌বিস্তার। প্রতিটি শব্দ মর্মমূলে খোদিত হয়ে যায়, প্রতিটি বাক্য দেহে শিহরণ আনে।

তিনি বল্লেন: 'যদি চিন্তায় সম্ভব নাও হয় তবুও কার্যে অহিংস থাকুন। আপনাদের কাছে আমার এই ন্যূনতম দাবী।'

বল্লেন, 'যদি আপনাদের মনে সামান্যতম সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে থাকে, তাহলে এই সংগ্রাম বাতিল করে দিন।'

'আমি যেমন কখনো ভাবি না, তেমনি আপনারাও ঘুণাক্ষরে ভাববেন না যে, ইংরেজ হেরে যাবে। ইংরেজ কাপুরুষের জাতি—একথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমি জানি, পরাজয় বরণ করার আগে ব্রিটেনের প্রতিটি মানুষ আত্মাহুতি দেবে।'

'আমি চাই আপনারা অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করুন। আমার কাছে অহিংসা ধর্মবিশেষ, কিন্তু আপনারা অন্তত নীতি হিসাবেও অহিংসাকে গ্রহণ করবেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতো সম্পূর্ণরূপে একে মেনে নিতে হবে এবং যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন, তখন মৃত্যুপণ করেও অহিংস থাকতে হবে।'

হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার সংগ্রাম। কালাপাহাড়ের, বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের। অন্যায় ও মনুষ্যত্বহীনতার মধ্যে সত্য ও মানবতার।

এই সংগ্রাম কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার? আমি সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট স্থানে বসে তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম। না-কি এই সংগ্রাম আরও ব্যাপক ক্ষেত্রের ও বিপুলকালের সীমানা পেরিয়ে সকল মানবজাতির স্বর্গ-আবিষ্কারের জয়যাত্রা?

অধিবেশন থেকে ফিরে এলাম বেশ রাত্রিতে। সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করে যে দেশবাসীর স্বেচ্ছাসেবকতা বরণ করেছি, মনে মনে অনুভব করছিলাম তার সুকঠোর দিনগুলি আসন্ন। সকল ভয় ও বেদনাকে উত্তীর্ণ করে দেশের কাজে যেন যথার্থই আসতে পারি, মোটরযোগে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পথে কেবল এই প্রার্থনাই মনে মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

কিন্তু রাত্রেই ফোন বেজে উঠলো বাড়িতে। সাংঘাতিক খবর। সহকর্মীর উত্তেজিত কম্পিত কণ্ঠে ভেসে এলো ফোনের মধ্য দিয়ে, 'বাপুজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যদের হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাত্রিতেই গোপন বন্দি-শিবিরে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার! আশ্চর্য। কিন্তু ভারতবর্ষ শতাব্দীর গ্লানি মুছে ফেলার জন্য রুদ্ধ উত্তেজনায় অধীর। ইংরেজের এই আকস্মিক প্ররোচনায় দেশে কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে? ইংরেজের কূটনীতি কি এবার কাপুরুষতার আশ্রয় নিলো?

৮ই আগস্টের শেষরাত্রে মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন। ৯ই আগস্ট ভোরে আগুন জ্বলে উঠলো বোম্বে শহরে। এ আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো দিগদিগন্তে ভারতের নানা প্রান্তে, শহরে, গ্রামে, বালিয়া চিমুর, মেদিনীপুরে।

বেয়নেট আর বোমা কী ধ্বংস করতে পারে স্বাধীনতা-তৃষ্ণার রক্ত-বীজ? শহীদের রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল আর আগুনের তাপে আকাশ অরুণাভ। বহ্নিমান ৪২' জন্ম নিলো ৯ই আগস্ট।

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহরের নতুন চেহারা। কাজকর্ম বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, হরতাল। লোকে লোকারণ্য পথ, মানুষের ঢেউ আর ঢেউ। ইঁট ছুঁড়ে আর গাছপালা ভেঙে রাস্তা বন্ধ। ট্রাম থেকে লোক নামিয়ে দিচ্ছে। উন্মত্ত আবেগে জনতা অস্থির চঞ্চল উদ্বেল।.

ভ্যানে করে পাহারারত পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে, জনতা তাদের প্রতি

ইঁট ও জুতো ছুঁড়ে মারছে। লাঠি চলছে পুলিসের তরফ থেকে, জনতার পক্ষ থেকে, প্রত্যুত্তর হচ্ছে ইষ্টকবর্ষণ। সরকার ও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে সকাল থেকেই।

অনেক কষ্টে দাদার স্টেশনে পৌছতে পারলাম। যে কোনভাবেই হোক অফিসে আমাকে পৌছতেই হবে। অবিশ্বাস্য ঘটনার মিছিল ঘটছে সর্বত্র, তার প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা করতেই হবে।

তখনো পুলিস পাহারায় যে ইলেকট্রিক ট্রেন চলছিল, তাতে চেপে অফিসে পৌছলাম। বিভিন্ন অফিসের খবর আসতে লাগলো, রিপোর্টাররা ছুটে বেড়াতে লাগলেন, ফোনে ফোনে নানা সংবাদ এলো। প্রথম দিনেই বিচিত্র ঘটনা আরম্ভ হয়ে গেল।

নানাস্থানে পুলিসে জনতায় প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে। থানা ও আদালত ঘেরাও করেছে জনসাধারণ। লাঠিবৃষ্টি ও গুলিবর্ষণ করছে পুলিস। ট্রেন আটক। কংগ্রেস ভবন ভস্মীভূত। থানা অধিকার করে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন। টেলিগ্রামের তার ছিন্ন।

বিদ্রোহী ভারতবর্ষের প্রথম দিনের চেহারাই ভয়ঙ্কর।

মহাত্মা যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেন, তা হতো নৈতিক বলে দুর্নিবার। যেখানে হিংসা ও উন্মত্ততার স্থান থাকতো না। শত শত নরনারী তাতে প্রাণ দিতেন, কিন্তু প্রতিশোধের অন্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা তাতে কখনোই এমন ঝড়ের মতো আসতে পারতো না।

লর্ড লিনলিথগো ধৈর্য রাখতে পারলেন না। মহাত্মা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, বড়লাটের নিকট তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করার আগে পত্রালাপ করবেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু বড়লাট অবিবেচক অসহিষ্ণুতায় অধীর হয়ে তার আগেই মহাত্মা ও নেতৃবৃন্দকে অজ্ঞাত বন্দিশালায় প্রেরণ করলেন।

মহাত্মার সংগ্রাম আরম্ভ হতে পারলো না।

জনসাধারণ নেতৃবিহীন আবেগের স্রোতে হিংস্র ও উন্মত্ত হয়ে গেল।

এক বিচিত্র স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন আরম্ভ হলো। পূর্বে কখনো এমন আন্দোলন ঘটে নি ভারতের ইতিহাসে।

অফিসে খবরের ফাইলের মধ্যে সারাদিন চলে গেল। খাওয়া-দাওয়া হতে পারলো না। বিকেলে বেরোলাম কোথায়ও চা খাওয়া যায় কি না।

গুজরাটি রেস্তোরাঁ 'পুরোহিত রেস্টুরেণ্ট' বোম্বে শহরের একটি খ্যাতনামা খাবারের দোকান। সেখানে গিয়ে একটা নিরবিলি টেবিলে বসতে যাব, হঠাৎ চোখো-চোখি হয়ে গেল দেশবন্ধু গুপ্তের সঙ্গে।

লালা দেশবন্ধু গুপ্ত দিল্লীর প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক, তেজ পত্রিকার সম্পাদক। দিল্লী কংগ্রেসের তিনি পুরোধা নেতা। তাঁর সঙ্গে বসে আছেন অরুণা আসফ আলি।

চোখে চোখে ইঙ্গিত হলো। আমি উঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এক কেবিনে ঢুকলাম।

ব্যারিস্টার আসফ আলি কবি ও কংগ্রেস নেতা। তাঁর স্ত্রী বাঙালী মহিলা। শ্রীমতী অরুণার জীবন বিচিত্র ঘটনামালায় হীরার মতো দ্যুতিময়।

'বহ্নিগান ৪২' অরুণাকে অসমসাহসী নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। আগুনের স্রোতের মতো তিনি আন্দোলনের ধারায় ধারায় দেশের সর্বত্র প্রেরণার উৎস হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তার আগে তিনি ছিলেন দিল্লী কংগ্রেসের প্রভাবশালী কর্মী। তাঁর সঙ্গে আমার আগেই বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁর হৃদয়ের গভীরে এমন আশ্চর্য উত্তাপ আমি লক্ষ্য করতাম, মনে হতো তিনি অসাধারণ কিছু অনুভব করবেন।

দেশবন্ধু খাবারের অর্ডার দিলেন। অরুণা বল্লেন, 'বোম্বে পুলিস এখনও তাঁদের চিনে উঠতে পারে নি, নতুবা এতক্ষণে তাঁদের জেলে পোরা হত।'

দেশবন্ধু দীর্ঘকায় সুন্দর সুপুরুষ। অরুণা তাঁর ভাবময় চোখ, কুঞ্চিত কালো চুল ও আশ্চর্য নয়নাভিরাম চেহারা নিয়ে অনন্যসাধারণ। তাঁদের

দুজনের চেহারাই এমন যে বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখা মুশকিল। তাঁদের দিকে চোখ পড়লে চোখ ফেরে না মন চিনে নেয় তাদের পরিচয়।

দেশবন্ধুর ইচ্ছা দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাই এখনও মনস্থির করে উঠতে পারছিলেন না।

দেশবন্ধু ও অরুণা দু'জনেই জানালেন মহাত্মার নির্দেশানুযায়ী তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সে-সম্পর্কে কাজকর্ম আরম্ভও করে দিয়েছেন।

অরুণা প্রায় সর্বক্ষণ কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'আপনার কলকাতা যাওয়ার সময় কিছু কাগজপত্র আপনার সঙ্গে পাঠাব।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যত ট্রেনের গোলযোগে বোম্বেতে আমাকে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। তার আগেই অরুণা কাগজপত্র কীভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৯ই আগস্ট থেকে অরুণা আত্মগোপন করেছিলেন। সারা দেশে ঘুরেছেন তিনি। তাঁর অমন বৈশিষ্ট্যময় সুন্দর চেহারা নিয়ে সর্বত্র সমাজের সর্বস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

দীর্ঘকাল পরে যখন দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রতি পরোয়ানা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তখন কলকাতার জনসভায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মাঝে মাঝে অরুণাকে আমি দেখতে পেতাম। বিচিত্র সব সাজে সজ্জিতা। কখনো মুসলমান, কখনো পার্শী, কখনো গুজরাটি।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের একটি জরুরী স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠক বসেছিল বোম্বের তাজ হোটেলে ৯ই আগস্টের বেশ কিছুকাল পরে।

হঠাৎ দেখি অরুণা। সালোয়ার পরা, পার্শীর মতো হ্যাট মাথায়, স্কার্ফ বাঁধা। কিন্তু আমার চিনতে কষ্ট হয় নি। অরুণার দিকে তাকিয়ে হাসতে

যাবো, অরুণা চোখের ইঙ্গিতে জানালেন আমার এই চিনতে পারাটা গোপন রাখতে।

চারদিকে হয়তো ছড়িয়ে আছে সি আই ডি-এর অনুচরেরা। কিন্তু ছায়ানুসরণকারীরা বৃথাই খুঁজে বেড়ালো তাঁকে, তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন।

কলকাতায়ও কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মীদের দিয়ে তিনি আমাদের কাছে খবর ও অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাতেন।

'৪২-বিপ্লবের' বহ্নিময় দিনগুলিতে আমার বাড়িতে আর একজন সাংবাদিকবিপ্লবী আসতেন। তিনি শ্রীমাখনলাল সেন।

মাখনলাল আমার কাছে অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয়। বাংলা দেশের সংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকুশলতা, সাহস ও নিষ্ঠা অতুলনীয়। সেই আন্দোলনের দিনে তিনি একাগ্র হৃদয় বিপ্লব সংগঠনে অগ্নোৎসর্গীত। একমাত্র ধ্যান এবং একমাত্র চিন্তা-- 'ইংরেজ, ভারত ছাড়'।

তিনি প্রায়ই গুজরাটি ভদ্রলোকের পোশাক পরে আসতেন। মাথায় একটা টুপি চড়ান থাকত। তাঁর আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের বালাই ছিল না, শুধু কাজ আর কাজ। কলকাতার নানা স্থানের খবর দিতেন এবং অন্যান্য খবর নিতেন। মাঝে মাঝে গোপনীয় প্রচারপত্রের খসড়া তৈরি করতেন।

আমি তখন সতীশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে থাকতাম। দোতলা থেকে রাস্তা দেখা যেত। প্রায়ই দেখতাম, বিশেষ লোকরা পাহারা দিচ্ছে আমার বাড়ি। ছায়ার মতো তাদের অস্তিত্ব সর্বদা, সর্বক্ষণ।

বুঝলাম, টিকটিকি লেগেছে বাড়ির পেছনে।

তাই সম্মানিত অতিথিদের নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা করে দেওয়াটাই ছিল আমার পক্ষে সব থেকে উদ্বেগজনক। তাঁদের গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার অর্থ দেশের সমূহ ক্ষতি।

॥ ২৯ ॥

পাঁচ বছর। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে উনিশ শ' সাতচল্লিশ। পাঁচ বছর যেন পাঁচ যুগ। ইতিহাসের গতি বন্যার স্রোতের মতো গতিশীল। ক্রীপস মিশন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহাত্মার অনশন, মন্বন্তর, লর্ড প্যাথিক লরেন্সের কেবিনেট মিশন, দাঙ্গা, লোকবিনিময়, মাউণ্টব্যাটেন, জিন্নার পাকিস্থান, স্বাধীনতা। পাঁচ বছর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনা-মালায় উপলমুখর।

লর্ড লিনলিথগোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড ওয়াভেল। তিনি ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি, সৈনিক ধুরন্ধর। প্রথম জীবনে সাহিত্যিক হিসাবে শিল্পচর্চা করেছিলেন, একটি বিখ্যাত জীবনী লিখে খ্যাতিলাভও করেছিলেন। এই সাহিত্যিক-সৈনিক পুরুষকে ভারত শাসনের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটেনের সরকার কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ছিলেন। ভারতবর্ষে ক্রমশ যে জটিল পরিস্থিতির মেঘ স্তূপীকৃত হয়েছিল, তার ফলে লিনলিথগো ব্যর্থশাসক হিসাবে পরিগণিত হয়ে এলেন।

লর্ড ওয়াভেলের প্রতি ভারতের জনসাধারণ কিছুটা আশার মনোভাব নিয়ে তাকিয়েছিল। লিনলিথগো শাসনব্যবস্থা শুধু দিনের পর দিন চালিয়ে গেছেন। কোন সমস্যার সমাধান হয় নি। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানী বিজয়ের নিশান, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের তেজ, মুসলীম লীগের ক্রমবর্ধমান চীৎকার। আশা করা গিয়েছিল, সৈনিক ওয়াভেল। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে ঘটনাবলীকে নতুন পথে পরিচালনা করতে পারবেন।

কিন্তু আশা ব্যর্থ হলো। পূর্ববর্তীর অনুবর্তন চালিয়ে যেত লাগলেন ওয়াভেল। যৌবনকালে একদা সাহিত্যিক মন নিয়ে মিশরের স্বাধীনতা

সংগ্রামে যে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ছাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে, পরিণত বয়সে আর একটি মহান দেশের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে সেই পরিবেশের সম্মুখীন হয়েও কোন হৃদয়বৃত্তি বা মানবীয় রাজনীতিবোধের পরিচয় দিতে পারলেন না। এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কি হৃদয়-কুসুম শুকিয়ে দেয় ?

১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটলো। রক্ষণশীল দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিরোধীদলের আসনে গিয়ে বসলো, শ্রমিকদল সরকার গঠন করলো। উইনস্টন চার্চিল মহাসমর জয় করেও নির্বাচনে পরাজিত হলেন। এটলী হলেন প্রাধানমন্ত্রী, ভারত সচিবের পদ অধিকার করলেন লর্ড প্যাথিক লরেন্স।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ইংলণ্ডের শ্রমিকদল চিরকালই সহানুভূতি সম্পন্ন। নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রমিকদলের সম্মেলনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়েছিল, তাঁরা সরকার গঠন করতে পারলে ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রবর্তিত করা হবে।

সরকার গঠন করে মিঃ এটলী ও লর্ড প্যাথিক লরেন্স তাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি রূপায়িত করবেন বলে ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষে নতুন আশা জেগে উঠলো।

লর্ড ওয়াভেল অনতিবিলম্বে লণ্ডন পাড়ি দিলেন। চার্চিলের শাসন থেকে এটলীর সরকার সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। এই পার্থক্যটা ওয়াভেলের লণ্ডন গমনের আগে ও পরে স্পষ্ট ফুটে উঠলো। লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন করে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন, নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারতের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

ইংলণ্ড সরকারের প্রতিনিধি এক মিশন এলো ভারতবর্ষে। এই মিশন ইতিহাসে ক্যাবিনেট মিশন নামে খ্যাত। লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস ও মিঃ আলেকজাণ্ডার মিশনের সভ্য ছিলেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ছিলেন সহযোগী সদস্য।

দিল্লী বিমানঘাটিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিশন-নেতা লর্ড প্যাথিক লরেন্স সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, ভারতের ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে পুনর্গঠন করে কোন মীমাংসা আরোপ করা হবে না। তাঁর কথায় স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, জিন্নার পাকিস্থান দাবীকে তিনি কোনপ্রকার গুরুত্ব দিতে স্বীকার করেন না।

কিন্তু দীর্ঘদিনের ইংরেজ প্রশ্রয়ে রক্ষিত ও বর্ধিত মহম্মদ আলী জিন্নার দল ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত না করে কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল; লর্ড প্যাথিক লরেন্স যাবার আগে ঘোষণা করে গেলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করাই তাঁর জীবনের ব্রত, তিনি এই চেষ্টা থেকে বিরত হবেন না।

লর্ড ওয়াভেল গভর্নর জেনারেল হিসাবে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক পরিমাণে ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তিনি সুদৃঢ় কোন প্রত্যয় নিয়ে এগোতে পারতেন না, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাকে সবল মন নিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি তাঁর ছিল না। কংগ্রেসের বহ্নিমান দেশপ্রেম তাঁকে রুষ্ট করতো, মুসলিম লীগের তোষণ করতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। গম্ভীর মুখ নিয়ে তিনি রাজকার্য করতেন, পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকায় মেঘস্তূপের মতো বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখের ভাব করে থাকতেন। অনেক সময় মনে হতো, তিনি কি হাসতে জানেন না?

এমন সময় ইংলণ্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলরূপে মনোনীত করলেন। মাউণ্টব্যাটেন যুদ্ধের সময় কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করতেন তাঁর দক্ষিণপূর্ব আঞ্চলিক দপ্তরের হেডকোয়ার্টার্সে। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তিনি মালয়-সিঙ্গাপুরে সাদর অভ্যর্থনা করে বন্ধুত্ব রচনা করেছিলেন।

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ইংরেজ রাজপরিবারের প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। নৌবিভাগীয় সামরিক বৃত্তিতে জীবন আরম্ভ করে ইংলণ্ডের অগ্রণী নৌসেনাপতিরূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবনে যত কঠিন,

যত দুঃসাধ্য কর্তব্যই তাঁর সামনে আসুক, তিনি নির্ভয় নিঃশঙ্কচিত্তে তা পালন করেছেন। ব্যর্থতা বা পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, বিজয়মাল্যে তাঁর জীবন সর্বদা দ্যুতিময় হয়ে আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসাধারণ জয়মাল্য নিয়ে তখন তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। দেশে তাঁর বিপুল খ্যাতি বিশাল জনপ্রিয়তা। তাঁকে নির্বাচিত করা হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা জটিল গুরুদায়িত্বে। ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানে। তিনি ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল পদ গ্রহণ করে দিল্লীতে এলেন।

দীর্ঘ সুন্দর দেহের অধিকারী তিনি, সদাহাস্যময় মনোরম তাঁর চেহারা। মনের মধ্যে অজস্র সাহস ও অসাধারণ ব্যুৎপন্নমতি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা ভারতবর্ষের সাংবাদিকবৃন্দ। রাজনীতির নায়করাও আশ্বস্ত হলেন।

কলকাতার দাঙ্গা ঘটেছিল ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ সালে। সপ্তাহব্যাপী নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানগরীতে, বিবেকহীন মনুষ্যত্বহীন মনুষ্য-হত্যা সংঘটিত হয়েছে চল্লিশ লক্ষ নরনারীর বাস বৃহত্তর কলকাতায়। এক অন্ধকার বর্বর যুগ।

নোয়াখালী ও বিহারে এই অমানুষিক বর্বরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে হত্যালীলা অব্যাহত হয়ে ছুটেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দুর্বহ ঘৃণা, মানুষে মানুষে বিষাক্ত জীঘাংসা। মহাত্মার মিলন, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী লুটিয়ে পড়েছে ধূলিতে, নাগিনীরা বিষম স্ফূর্তিতে ফুঁসছে।

মহাত্মা একাকী গেলেন নোয়াখালী। পাদুকাহীন শীর্ণ দেহ পল্লীপথে রক্তাক্ত হয়ে যেতে লাগলো, তিনি শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার সাধনা করতে লাগলেন। যে পথে সাম্প্রদায়িক হত্যার নিষ্ঠুর ঝড় বয়ে গেছে, সে পথ দিয়ে তিনি মিলন ও প্রেমের বাণী ছড়িয়ে ছড়িয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করলেন।

অবশেষে সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পাঞ্জাব থেকে লোকবিনিময় করার আদেশ দিলেন।

লোকবিনিময়ের মধ্যে মানুষের জীবন রক্ষা হলো পাঞ্জাবে। তিনি আলো দেখতে পেলেন। দীর্ঘদিনের বিষাক্ত প্রচারণায় মুসলিম লীগ যে বর্বর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টি করেছে, তার ফলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রায় সুদূরবর্তী স্বপ্ন হয়েই আছে। দ্বিধাবিভক্ত ভারতবর্ষ কংগ্রেসের নিকট মহাপাপস্বরূপ অগ্রহণীয়, অখিল ভারত মিলিত কংগ্রেস-লীগ সরকার মুসলিগ লীগের নিকট বাতুলতামাত্র।

কিন্তু এই অবস্থাই কি চলতে থাকবে?

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবাবলী রচনা করলেন। বড়লাটের জাতীয় কার্যকরী পরিষদে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল এবং লিয়াকৎ আলীর পুরোধায় মুসলিম লীগ দল শাসনভার গ্রহণ করেছিল। মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রস্তাব সর্বপ্রথম এই শাসন পরিষদে আলোচিত হয়।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মাউণ্টব্যাটেনের। প্রখর কূটনৈতিক বুদ্ধিতে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য উজ্জ্বল। পণ্ডিত নেহরু উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে মাউণ্টব্যাটেন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে স্বাধীনতা সুদূরবর্তী হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা বিরোধী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি সান্ধ্য প্রার্থনাসভার বক্তৃতাবলীতে প্রায় প্রত্যহ দেশের বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন।

জাতির জনক গান্ধীজীর বিরোধিতা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিবেচিত হলো। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহাত্মা মত পরিবর্তন করলেন অবশেষে।

সম্পূর্ণ বাংলা ও পাঞ্জাব গ্রাস করতে চেয়েছিলেন মহম্মদ আলী জিন্না। মাউণ্টব্যাটেন ভ্রূকুঞ্চিত করে জানালেন, সমস্ত দেশ বিভক্ত হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, প্রদেশগুলি এই ফরমূলা থেকে বাদ যাবে কেন?

তিনি আরও জানালেন, এই মুহূর্তে যদি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহলে পাকিস্থানের দাবী কোনদিনই পূরণ হবে না।

জিন্না অনতিবিলম্বে রাজী হলেন।

মাতৃভূমি দ্বিধাখণ্ডিত হলো। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদ নতুনভাবে লেখার স্থির সিদ্ধান্ত হলো দিল্লীতে।

কিন্তু নেতাদের সম্মতি লাভ করলেও মাউণ্টব্যাটেনের আর একটি দুরূহ কর্তব্য বাকি ছিল। জনসাধারণের সম্মতি অর্জন করতে হবে। জনসাধারণের প্রতিনিধি ও চারণ সাংবাদিকদের হৃদয় জয় করতে হবে তাঁর।

নেতাদের সম্মতি দানের একদিন পর ৪ঠা জুন দিল্লীতে এসেম্বলী হলে সাংবাদিকদের সভা ডাকা হলো। শাসন পরিষদের বেতার ও প্রচার সচিব হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাতে সভাপতিত্ব করলেন।

দেশ বিদেশের প্রায় তিনশতাধিক সাংবাদিক তাতে যোগদান করে-ছিলেন। শুধু রিপোর্টারদের তথাকথিত 'প্রেস কনফরেন্স' নয়, বিশিষ্ট সম্পাদক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছিল। আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

জীবনে বহু প্রেস কনফারেন্সে আমাকে যোগ দিতে হয়েছে। বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা ও মনীষীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখেছি তাঁদের, অনুভব করেছি তাঁদের ব্যক্তিত্ব, শুনেছি তাঁদের কথা।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের এই ঐতিহাসিক সাংবাদিক বৈঠক আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

দীর্ঘ সুপুরুষ ব্যক্তি মঞ্চের মধ্যভাগে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত আবেগ-বর্জিত যুক্তিমালায় ভূষিত বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, হাতে একখণ্ড কাগজ। কিন্তু কাগজে কী লেখা আছে একবারও সেদিকে তাঁর নজর নেই, সহজ সপ্রতিভ দৃষ্টি তুলে তিনি সাংবাদিকদের নিকট তাঁর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে চলেছেন। বক্তৃতা দীর্ঘ হচ্ছে, কিন্তু তিনি কোথাও থামছেন না বক্তব্যের

সন্ধানে অথবা শব্দনির্বাচনে। অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীর দরদ তার কণ্ঠ ও বাক্যে।

স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বিখ্যাত বক্তা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের মূলগত পার্থক্য। ক্রীপস আবেগপ্রবণ, হৃদয়বৃত্তির তপ্ত লাভাস্রোতের মতো উষ্ণ তাঁর কথা। মাউণ্টব্যাটেন যুক্তিধর্মী, বাস্তবপন্থী। তাঁর কথায় স্রোত নেই, আছে বুদ্ধির বৃষ্টি। ক্রীপস সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, সামান্য বিদ্রূপ বা বিরোধিতায় ক্রুদ্ধ হন। মাউণ্টব্যাটেন সর্বদা হাস্যময় প্রশান্ত, কোন আঘাতেই তিনি আহত বা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন না। কঠিন প্রশ্ন করা হয়েছে, জটিল যুক্তির তর্ক তোলা হয়েছে, মাউণ্টব্যাটেন সহজ ভাষায় সানন্দে তার জবাব দিয়েছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য শেষ হলো, সাংবাদিকদের নানামুখী প্রশ্নেরও তিনি জবাব দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর এই পরিস্থিতিতে কোন গত্যন্তর নেই। মাউণ্টব্যাটেনের কুশলী বুদ্ধি বিজয়লাভ করলো।

তারপর ক্রমশ এগিয়ে এল ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭।

দু'শ' বছরের পরাধীনতা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম দিল্লীর ঐতিহাসিক দুর্গ লালকেল্লার সামনে। সহস্র সহস্র উত্তাল জনতা, নতুন সূর্যের রক্তিম আলো এসে পড়েছে তাঁদের প্রত্যেকের মুখে, প্রতিটি মুখ স্বপ্নে ও সুখে উজ্জ্বল।

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলেন। বিশ্বসভায় স্বাধীন পতাকার সারিতে আর একটি নতুন পতাকা উড়লো, ত্রিরঙ্গা পতাকা, মুক্ত ভারতবর্ষ!

আমাদের রিপোর্টার সভার অভ্যন্তরে গিয়ে বসেছিলেন। আমি নিঃশব্দে একাকী এসে দাঁড়িয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক সকালবেলার জনতারণ্য উত্তাল-মুখর মানুষের সমুদ্রে।

মানুষ আর মাটি। মাতৃভূমি।

আমি রোমাঞ্চলাগা উত্তেজনায় আনন্দে কাঁপছিলাম। আমার মাতৃভূমি আজ স্বাধীন হলো। জীবনের কোন প্রভাতে স্বাধীনতার দুর্বার সঙ্কল্প নিয়ে নির্ভয় নিঃশঙ্ক স্বেচ্ছা-সেবকদের অগ্রসর হতে দেখেছি মুক্তি-সংগ্রামে। বছরের পর বছর কেটেছে। লাঞ্ছনা, পীড়ন ও আত্মদানে স্বদেশ রক্তরক্তিম আর্দ্র হয়ে উঠেছে। শহীদের দুঃসাহসিক জাবনাহুতি দেখেছি এই দুচোখ দিয়ে।

কত দীর্ঘদিনের ইতিহাস আমার অভিজ্ঞতার আয়নায় ঘুমিয়ে আছে। আমার প্রাচীন স্বদেশ, আমার আধুনিক স্বদেশবাসী। মুক্তিপাগল পঞ্চাশ বছর।

জওহরলাল নেহরু পতাকা উত্তোলন করছেন। সূর্যের আলো এসে উচ্ছল ধারায় পড়েছে ত্রিরঙা কাপড়ে, আমাদের স্বাধীনভার প্রতীক আমি প্রণাম করি আমার পাতাকা।

এই স্বাধীনতা, এরই জন্য আমরা পঞ্চাশ বছর প্রাণ দিয়ে লড়েছি। এর জন্যে বাঁধন মানি নি, শঙ্কায় ডরাই নি, মৃত্যুভয়ে কাঁপি নি—কাতারে কাতারে জনতার মিছিল, এগিয়ে গেছি দুর্বার আবেগে।

এই স্বাধীনতা কি শুধু পতাকা উত্তোলন, কেবল শাসক বদল? মাউণ্টব্যাটেনের স্থানে জওহরলাল, রাজা জর্জের জায়গায় কোন স্বদেশী রাষ্ট্রপতি?

স্বাধীনতার পবিত্র সকালে মহাত্মা গান্ধীকে ভুলবো কেমন করে? যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের আহ্বান জানিয়ে জাতির ঘুম ভেঙ্গে দিলেন। যাঁর পবিত্র হৃদয় এই দুর্গত দেশের লাঞ্ছিত জনসাধারণের কল্যাণ স্বপ্নে অপরাজিত। যিনি আহ্বান জানিয়েছেন কোটি কোটি স্বদেশবাসীকে সত্য, মৈত্রী ও কল্যাণব্রতে।

মহাত্মাকে প্রণাম এই পুণ্যপবিত্র সকালে।

আমরা আজ স্বপ্নসম্ভবের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীনতার

প্রথম দিন। কোটি কোটি জনসাধারণ অশিক্ষা, অনশন ও অভাবের কশাঘাতে পশুর মতো জীবনযাপন করছে, আমাদের স্বাধীনতা তাঁদের জীবনে আসুক সুখী, সমৃদ্ধ ও সার্থক প্রাণশক্তির প্রবাহ। দু'শ' বছরের গ্লানি, ধুয়ে মুছে যাক পরাধীনতার অভিশাপ প্রাচীন ভারতের মাটি থেকে।

স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর লালকেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে রোমাঞ্চিত আবেগে প্রণাম করলাম ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যতকে।

॥ ৩০ ॥

সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচী অখণ্ডিত ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের মহানগরী। করাচীতে আমাদের সংবাদাতা ছিলেন শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম। তিনি এখন আসামের রাজ্যপাল। তখন তিনি সিন্ধু প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা, করাচীর অধিবাসী। তিনি ছিলেন ব্যস্ত মানুষ, ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। পরিপূর্ণ সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে পাওয়াও দুর্ঘট ছিল, কংগ্রেসের খবর ভিন্ন অন্যান্য সংবাদ প্রায় পাঠাতেই পারতেন না।

এমন সময় ডি এম তাহিলরমানি নামক এক যুবক আমাদের সংবাদদাতারূপে কাজ করবার অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। কয়েক মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভবে তাঁকে নিয়োগ করলাম। তাহিলরমানি তখন বি এ ক্লাশের ছাত্র।

ডাকে খবর পাঠাতেন তাহিলরমানি। তাঁর চিঠিগুলি বিচিত্র সংবাদে ভরা থাকতো, অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতো রচনাশৈলী। তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলাম। অনতিবিলম্বে তিনি পুরো সাংবাদিকের নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন।

সামান্য মাসিক মাহিনা তাঁকে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। সংবাদদাতারূপে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি এ পাশ করলেন, আয়ত্ত করলেন শর্টহ্যাণ্ড বিদ্যা। সাগ্রহে শিক্ষা করলেন সাংবাদিকতার নানা বিভাগের কাজ, অর্জন করলেন সাংবাদিকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিক্ষা।

১৯৩৬ সালে আমি প্রথম করাচীতে যাই। মরুভূমির উপর দিয়ে সোজা রেললাইন চলে গেছে, পথের দুদিকে ধূ ধূ বালি, দিগন্তখোলা

মরুমাঠ। দস্যুদের অবাধ লুণ্ঠনে সে পথ দুর্গম, ধূলির ভয়ের সঙ্গে দস্যুর ভয়ও সে পথে সর্বদা ত্রাসের আতঙ্ক বিস্তার করে আছে।

সে ত্রাসের রাজ্য পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম করাচী স্টেশনে। তাহিলরমানি উপস্থিত ছিলেন প্ল্যাটফর্মে, তিনি স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। আগে কখনও দেখা হয়নি আমাদের; ভাবনা ছিল ভিড়ের মধ্যে পরস্পরকে চিনতে পারবো কি না। কিন্তু গাড়ি থামার সঙ্গেই উপস্থিত হলেন তাহিলরমানি, নমস্কার করে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

করাচী ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর ছিল। শহর তখন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আধুনিক প্ল্যান অনুযায়ী অগ্রসরমান শহর, সৌন্দর্যে মনোরম। সমুদ্রের তীর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

'বড়বন্দরের' রাস্তায় একটি দোতলা বাড়িতে আমাদের অফিস ছিল। নিচে অফিস, উপরে তাহিলরমানির সপরিবার বাসস্থান। অতিথি হলাম তাঁদের পরিবারে, পরিচয় হলো তাঁর বাবার সঙ্গে। শিক্ষায়, রুচিতে ও আন্তরিকতায় পরিবারটি সুন্দর। তাহিলরমানির ছোটভাই তখন বি এ পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা ও শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি সাংবাদিকতার কাজে শিক্ষানবিশী করছে।

তাহিলরমানি করিতকর্মা ব্যক্তি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল করাচীতে আমাদের পুরোদস্তুর অফিস খোলা। হেড অফিস থেকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা ছাড়াই অফিসের সমস্ত ব্যয়নির্বাহের তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়, বুদ্ধি কৌশল, সাংগঠনিক নিষ্ঠা অপরাজেয়।

করাচীতে নতুন অফিস উদ্বোধন করা হলো। তাহিলরমানিকে নিয়োগ করা হলো সম্পাদকরূপে, তাঁর ছোটভাই নিযুক্ত হলেন সহ-সম্পাদক। পুরো অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাহিলরমানি, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

'সিন্ধ অবজার্ভার' তৎকালীন করাচীর প্রসিদ্ধ পত্রিকা। পরলোকগত কে পুনিয়া তখন তার সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এক দুপুরে, শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা তাঁর, সর্বদা একটা প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে আছে

মুখে। সহৃদয় আন্তরিকতায় তাঁর ব্যক্তিত্ব মনের মধ্যে ছাপ রাখে। তাঁর ছোটভাই কে রামারাও আমার সহকর্মী ছিলেন 'ফ্রি প্রেসে,' বন্ধুত্ব রচিত হয়েছিল অনেকদিন আগে। কে পুনিয়া মশায় আমাকে ছোটভাই-এর মতো গ্রহণ করলেন।

কে রামারাও 'ফ্রি প্রেসে'র পত্রিকা 'ফ্রি ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক হয়েছিলেন, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমসে'র বার্তা-সম্পাদক হিসাবে বহুদিন কাজ করেন। পরে জওহরলাল নেহরুর সংবাদপত্র 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে'র সম্পাদক হয়েছিলেন। এখন তিনি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন, পার্লামেণ্টের একজন খ্যাতনামা সদস্য। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত সংবাদিক, নানারূপে তাঁকে দেখেছি, নিজের স্বাধীনতা কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

করাচীর বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে সাক্ষাৎ করলাম, যাঁরা আগে আমাদের সংবাদ নিতে কার্পণ্য করতেন, তাঁদের সহায়তা অর্জন করলাম। করাচী অফিসের আয় কিছুটা বেড়ে গেল। তাহিলরমানি সুখী হয়েছিলেন আমার তিনদিন করাচী ভ্রমণে, আসবার সময় স্টেশনে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন। তখন আমরা পরস্পরের নিকট আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

দু'-তিন বছর পর আর একবার করাচী গিয়েছিলাম তাহিলরমানির ডাকে। সিন্ধু সরকারের কাছে আমাদের সংবাদ নেবার অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে আমার করাচী যাওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন।

এবার রায়বাহাদুর কিমত্রাই আসুমল নামক এক ঐশ্বর্যবান হিন্দু-মহাসভাপন্থী ব্যবসায়ীর গৃহে আমার আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাহিলরমানি নিজে এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

রায়বাহাদুর কিমত্রাই করাচীর প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী। সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তিনি তাঁর গাড়িতে বিভিন্ন

জায়গায় আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে।

আমাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য তিনি 'করাচী ক্লাবে' এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে সিন্ধু সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, উচ্চ-কর্মচারী, খ্যতনামা সংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কিছুদিন পরেই সিন্ধু সরকার আমাদের পরিবেশিত সংবাদ নিতে স্বীকৃত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে পড়ে। সিন্ধুতে হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশানুপাতে অল্প ছিল, হিন্দুদের হত্যা ও সম্পত্তি লুণ্ঠন সেখানে অবলীলায় অব্যাহত ধারায় চলতে থাকে। সেই দুর্দিনে আমাদের অফিস আক্রান্ত হয়। তখনও তাহিলরমানি অবিচলিত সঙ্কল্প নিয়ে করাচীতে সাংবাদিকতা করে চলেছেন। কিন্তু তারপর একদিন সাম্প্রদায়িক বর্বরতার আক্রমণে অফিসের দ্বিতলে তাঁর গৃহ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়। সে-সময় প্রাণের দায়ে একজন মুসলমান সহকর্মীর হাতে অফিস চালাবার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সপরিবারে বিমানযোগে বোম্বে চলে আসেন।

তার কিছুদিন পরে হায়দরাবাদে ভারত সরকারের 'পুলিসী আক্রমণে' সেখানকার রাজাকর-স্বাধীনতা যখন ধসে পড়ে তখন আমাদের হায়দরাবাদ অফিসের সম্পাদক আবদুল হাফিজকে করাচী অফিস পুনর্গঠিত করে পুনর্বার সুষ্ঠুভাবে চলাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়। আবদুল হাফিজ দীর্ঘদিন আমাদের সহ-কর্মী, তাঁর কর্মতৎপরতায় আমার আস্থা ছিল। বিশ্বাস করেছিলাম পাকিস্থান সংবাদের জন্য একজন সুযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবদুল হাফিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। আমার দীর্ঘ কর্মপ্রচেষ্টার একটি নিদারুণ নৈরাশ্য তাঁর সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট স্বার্থপরতায় অক্ষয় হয়ে রইলো।

আবদুল হাফিজ কিছুকাল আমাদের প্রতি আনুগত্য নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে আমাদের জানালেন যে, হিন্দুদের

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং ভারতে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত বলে করাচীতে তাঁর কাজ করা দুর্ঘট হয়ে পড়েছে। 'ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্থান' নাম দিয়ে নতুন কোম্পানী রেজিস্টার্ড করা হলে কাজের বাধাগুলি অপসারিত হবে। আমাদের সম্পত্তি, সুনাম ও সহযোগিতার জন্য নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে আমাদের শতকারা ১৫ ভাগ শেয়ার থাকবে এবং আমাদের নির্বাচিত একজন ডিরেক্টর গ্রহণ করা হবে।

আমরা বাস্তব বাধাগুলি অনুধাবন করছিলাম। তাঁর শুভবুদ্ধির প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। আমি সম্মতি জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিলাম।

করাচীতে নতুন প্রতিষ্ঠান রেজিস্টার্ড করা হলো—'ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্থান'। আবদুল হাফিজ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চীফ এডিটার হলেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকলেও হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে আবদুল হাফিজকে আমরা উৎসাহিত করেছি। সাংবাদিকতার বন্ধুর পথে একদা আমিই তাঁকে উন্নতির সোপানে বসিয়েছিলাম, শিক্ষা ও সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে প্রথম শ্রেণীর সংবাদিক হিসাবে গড়ে উঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছি।

কিন্তু করাচীতে সুগভীর ভারতীয় বিদ্বেষের বিষাক্ত আবহাওয়ায় আবদুল হাফিজ তাঁর অতীত বিস্মৃত হয়েছেন। বিস্মৃত হয়েছেন সাংবাদিকতার ভিত্তিমূলক সৌভ্রাত্র ও নিরপেক্ষতা। আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। করাচী থেকে কোন সংবাদই পাঠান না, চিঠি লিখলেও ভদ্রতাসূচক একটা জবাব দেবার প্রয়োজনীতাও আর বোধ করেন না।

করাচী আফিসের স্থাপয়িতা ও সংগঠক তাহিলরমানি এখন হায়দরাবাদ শাখার সম্পাদক। সেখানকার প্রখ্যাত পত্রিকা 'হায়দরাবাদ বুলেটিনে'র স্বত্বাধিকারী শেঠ মতিলালের সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ্য স্থাপন করে অত্যল্প সময়ে তিনি শাখা অফিসটি বৃহৎ পরিকল্পনায় পুনর্গঠিত করেন। তাঁর সাফল্য আমাদের অগ্রগতির মালায় একটি চিত্তাভিরাম ফুল।

॥ ৩১ ॥

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন যশস্বী ব্যক্তি। বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, জীবন আরম্ভ করেন অধ্যাপকরূপে। বাংলাদেশের বাইরে তাঁর কর্মস্থান ছিল। সেখান থেকে তিনি মাসিক পত্রিকা বার করেন 'প্রবাসী'। প্রবাস থেকে পত্রিকা বেরোচ্ছে বলেই হয়তো 'প্রবাসী' নামকরণ।

জ্ঞানে ও মনীষায় তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল মহীরুহের মতো। অধ্যাপক রামানন্দ যথার্থ সাংবাদিক বৃত্তি নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই অধ্যাপনার নিশ্চিন্ত নিরালা জীবন তাঁর আর ভালো লাগলো না। তিনি বরণ করে নিলেন সংগ্রাম মুখর আথিক অনিশ্চয়তার সাংবাদিক জীবন।

কলকাতা চলে এলেন। তারপর এখান থেকেই বেরোতে লাগলো 'প্রবাসী'। নতুন ইংরেজী পত্রিকা বার করলেন 'মডার্ণ রিভ্যু'। দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় যতোখানি রাজনৈতিক মতামতদানের সুযোগ, মাসিক পত্রিকার চেহারা ও চরিত্রে তেমনটা সম্ভব নয় এবং হয়তো ততটা মর্যাদা ও প্রভাবও অর্জন করতে পারে না।

কিন্তু রামানন্দবাবুর পাণ্ডিত্য, মনীষা দেশপ্রেমে অসাধারণ কীর্তির সৃষ্টি হলো। মাসিক পত্রিকায় তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি প্রভাব ও জনপ্রিয়তায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ, যে তাঁর মতামত 'সংবাদ' হয়ে দেশবিদেশের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

ফ্রি প্রেসে যুক্ত থাকা কালেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়। তাঁর সম্পাদকীয় আমরা 'সংবাদ' রূপে পরিবেশন করতাম।

তিনিও আমাদের প্রতি সহৃদয় আত্মীয়ের মতো শুভকামনা পোষণ করতেন। আমাদের আর্থিক প্রতিকূলতা উপলব্ধি করে 'মডার্ণ রিভ্যু'তে তাঁর সম্পাকীয়ের সর্বশেষ প্রুফের কতকগুলি মুদ্রিত কাগজ পাঠিয়ে দিতেন।

অবশ্য আরো বহুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও বর্তমান সম্পাদক কেদারনাথ আমার সহপাঠী। কেদারনাথের সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রামানন্দ বাবু আদর করে বসিয়েছিলেন। স্নেহময় পিতা পুত্র-বন্ধুকে এক নিমেষে পুত্রস্থানীয় করে নিলেন। ছাত্রদের জীবন ও আদর্শ নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বেও তাঁর বন্ধুর মতোই ঋষিসুলভ গরিমা ছিল। এই গরিমা শুধু তাঁর নিজেরই গৌরব নয়, সমস্ত সাংবাদিকগণের।

অমৃতবাজারের বার্তা সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র চৌধুরীর যুগ্ম-সম্পাদনায় আমি একটি পুস্তক রচনা করেছিলাম। বইটি মহাত্মা গান্ধী ও তৎকালীন মুক্তিসংগ্রামের রোজনামচা, নাম 'মহাত্মা গান্ধী এণ্ড ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল ফর স্বরাজ'। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রামানন্দবাবু।

রবি চৌধুরী আমার কাছে অনুজতুল্য স্নেহভাজন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, আশ্চর্য-মেধা ও সাংবাদিকতার নানাবিধ দক্ষতার জোরে তিনি সামান্য জীবন থেকে প্রভূত উন্নতি করেছেন। নগণ্য প্রুফরীডার হিসেবে তিনি কর্মে যোগদান করেন। সাব-এডিটরের কাজ করেন বহুকাল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। দক্ষতায় তিনি অনন্যসাধারণ।

রামানন্দবাবুর সঙ্গে সাংবাদিকদের ঘরোয়া সমিতিতে একসঙ্গে কাজ করার গৌরবলাভ করেছি। সংঘটি গঠিত হয়েছে সাংবাদিকদের পারস্পরিক

সম্প্রীতি, জীবনমানের উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় সাংবাদিকতার প্রসারবৃদ্ধির জন্য। নিখিল ভারত বার্তাজীবী সঙ্ঘ আজ সকলের কাছেই পরিচিত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসু, কিশোরীলাল ঘোষ, মাখন সেন, সুরেশ মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

মৃণালকান্তি ও কিশোরীলাল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। শ্রমিক সম্পর্কিত সংবাদ সর্বভারতে প্রচার করার জন্য তাঁরা ফ্রি প্রেসে আসতেন। তখন থেকেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্প্রীতি বন্ধুত্ব ঘটে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কিশোরীলাল একটি বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়, তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা ঘটে নি।

কিশোরীলাল আমাকে সংঘের সভ্য করেন। তখন তিনি সংঘের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী সম্পাদক নির্বাচিত হন কিশোরী ব্যানার্জী। তিনি ছিলেন শিল্প-সম্পর্কিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইনডাস্ট্রি'র সম্পাদক। বহুকাল তিনি সংঘের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনা-কালে সংঘের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের পারস্পরিক মানোন্নয়ন এবং অন্যান্য নানাবিধ উন্নতি হয়।

সে সময় একবার স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস আসেন কলকাতায়। তখনও জানা ছিল না যে তিনি একদিন ঐতিহাসিক প্রস্তাব নিয়ে আসবেন। তখন তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত আইনজীবী, যশস্বী সমাজতন্ত্রী। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁকে একটি জটিল মামলা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য ভারতে আহ্বান জানান। হায়দ্রাবাদে যাবার পথে কলকাতা এসে অল্প কয়দিন তিনি অবস্থান করেন।

তিনি ছিলেন কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্তের সহানুধ্যায়ী বন্ধু। জে সি গুপ্ত আমার আত্মীয় ও সহকর্মী। ক্রীপস সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য গুপ্ত আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন।

এক সকালের নিরালা সান্নিধ্য ঘটেছিল ক্রীপসের সঙ্গে। নিরভিমান, সরল ও স্নিগ্ধ হৃদয় তাঁর। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেদিন বিকেলে বার্তাজীবী সংঘ এক 'চা-আসরে' সম্বর্ধিত করেন ক্রীপসকে। আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। সাগ্রহে ক্রীপস কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করেন। বিলেতের সাংবাদিকদের সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন, পরিশেষে বলেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদে সারা পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা নিশ্চিতরূপে পরিবর্তিত হবেই। ক্রীপসকে সম্বর্ধনা জানানোর মতো আরও অনেক সভা, চা-আসর ও প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছে বার্তাজীবী সংঘ। তাতে দেশবিদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং মনীষীদের সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার নানারকম উৎপীড়নমূলক প্রেস-আইন জারী করেন। বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট, ১৯৩২ ও বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট, ১৯৩৪, প্রভৃতি ভারতের সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে বিশেষ বিপদের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত আইন ভারতের অন্যান্য স্থানের চেয়ে কলকাতায়ই বহুলভাবে প্রয়োগ করা হয়। কলকাতার সংবাদপত্রগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত। সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদকীয় ও ব্যঙ্গরচনায় এমন একটা বহ্নিময় জ্বালা পরিবেশন করা হতো এখানকার পত্রিকাগুলিতে যে ব্রিটিশ সরকার ক্রোধে জলে মরতো। এই জ্বালার চেহারা ফুটে উঠলো এই সমস্ত অর্ডিন্যান্স ও আইনগুলিতে।

বার্তাজীবী সংঘ এই সময় (১৯৩৫) নিখিল ভারতীয় বার্তাজীবীদের একটি কনফারেন্স আহ্বান করেন কলকাতায়। সি চিন্তামণি তার সভাপতিত্ব ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মৃণালকান্তি বসু।

সর্বভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই কনফারেন্সের বিশেষ প্রভাব। নানা প্রদেশ থেকে সাংবাদিকরা তাতে যোগদান করেন, প্রায় সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিই তাতে উপস্থিত থাকেন। এই কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদকরূপে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল।

বার্তাজীবী সংঘের সভাপতিরূপেও আমাকে দীর্ঘকাল কাজ করতে হয়েছে। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহযোগী সম্পাদক ভবেশ নাগ ও যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক বিজয় দাসগুপ্তকে তখন সংঘের সম্পাদক হিসাবে পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলাম।

বিজয় আমাকে অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধা করেন। তিনি বরিশালে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। খ্যাতনামা জননেতা সতীন সেন মহাশয় আমার সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁকে ফ্রি প্রেসের বরিশাল সংবাদদাতা হিসাবে নিযুক্ত করি। তাঁর নিষ্ঠা, সাংবাদিক অনুসন্ধিৎসা ও কর্তব্যবোধে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছিলাম। সেদিন থেকে আমাদের যে প্রীতির বন্ধন রচিত হয়েছিল, তা সর্বদাই অটুট।

বিজয় বার্তাজীবী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় আমি বিশেষ খুশী হয়েছিলাম। তাঁর সাহায্যে তখন সংঘের নানাবিধ উন্নতি ঘটেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার পাঠ প্রবর্তন করার জন্য বার্তাজীবী পক্ষের থেকে আমরা সকলেই উৎসুক ছিলাম। ১৯৩৫ সালের কনফারেন্সে মৃণালকান্তি বসু তাঁর অভিভাষণে এই পাঠ প্রবর্তনের জন্য আবেদন করেন। ইউনাইটেড প্রেসের ডাঃ আক্কেলসারিয়া এই মর্মে একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। কিন্তু তখন কতিপয় সাংবাদিকের বিরোধিতার জন্য প্রস্তাবটি অল্পসংখ্যক ভোটে পরাজিত হয়েছিল।

আমি যখন সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হই, তখন এই বিষয়ে পুনর্বার চেষ্টা করতে থাকি। মৃণালবাবু খুব সহায়তা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা চলে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

তখন এই আলাপ আলোচনা খুব অগ্রসর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সম্পাদক ডি কে সান্যাল ডাঃ রায়ের অনুরোধে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করেন। কিন্তু তখন আকস্মিকভাবে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে সঙ্কটাপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই তখন আলোচনাটা স্থগিত থাকে।

তারপর চারুচন্দ্র বিশ্বাস যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং স্বাধীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাষ্ট্রপাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু, সে সময় এই পাঠ প্রবর্তনের প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে। পাঠ প্রবর্তন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলে প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বার্তাজীবী সংঘের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচায প্রভৃতি এবং আমি।

আমরা হিসাব কষে বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝাতে চেয়েছি। আমরা দেখিয়েছি, ছাত্রদের থেকে সংগৃহীত মাহিনা হিসাবে যে অর্থ আসবে, তাতেই পাঠটি প্রবর্তিত হতে পারে। পরিশেষে সেই ব্যবস্থায়ই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে।

ভারত আজ স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে বিশ্বসভায় আপন স্থান অধিকার করেছে। দেশের সাংবাদিকতা গুরুত্বে ও মর্যাদায় যথার্থ উন্নতিলাভ করবে, সকলেই এই আশা পোষণ করেন। তাই ভবিষ্যতের যে সকল নবাগত সাংবাদিকের উপর আমাদের দেশের ঐতিহ্যময় সাংবাদিকতা নির্ভর করছে, তাঁদের যথার্থরূপে শিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন পাঠপ্রবর্তনের ফলে দেশের এই আকাঙ্ক্ষা সার্থক হবে, তার জন্যে আমরা কাজ করে চলেছি।

॥ ৩২ ॥

আধুনিক সংবাদপত্রের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কথাই হচ্ছে, 'দ্রুত করো' পৃথিবীর আর প্রান্তে যে ঘটনা এইমাত্র ঘটলো, সামান্যমাত্র সময়ের ব্যবধানে তার বিবরণ এসে পৌছানো চাই সংবাদপত্র অফিসে। পূর্ণ বিবরণ, সচিত্র যদি হয় তাহলে উত্তম

তাই আধুনিক সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টেলিপ্রিণ্টার একান্ত আবশ্যক। নতুবা যুগধর্ম বজায় থাকে না, সাংবাদিকতায়ও পেছনের বেঞ্চিতে লজ্জিত মুখ নিয়ে বসে থাকতে হয়।

টেলিপ্রিণ্টারের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি দীর্ঘকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটার পর যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্মিত টেলিপ্রিণ্টার লাইনগুলি লীজ দেওয়া হবে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। দরবার করেছি সরকারী ভবনে ভবনে, শরণ নিয়েছি মন্ত্রীদের অফিসে অফিসে, চিঠির পর চিঠি লিখে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছি তাঁদের। কিন্তু তবু দীর্ঘকাল আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে।

লর্ড ওয়াভেলের অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সর্দার প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও প্রচার দপ্তরের অধিনায়ক।

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমাদের বহুকালের পরিচয়। আমাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভকামনা ছিল, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতে তিনি আমাদের সহায়তাও দাবী করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভাপতি। তিনি, ভুলাবাই দেশাই ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থ নির্বাচনে কংগ্রেসের সুষ্ঠু প্রচারকার্য চালাবার জন্য তাদের 'বেয়ারিং অথরিটি' দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া সংবাদ সরবরাহের অন্যান্য খরচের জন্য আর্থিক সাহায্যও দান করেছিলেন।

কিন্তু মন্দভাগ্য আমাদের। চিঠির পর চিঠি লিখেও সরকারের আমলাতন্ত্রী চক্রকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারলাম না। অবশেষে নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল আমার মন। কিন্তু তবু চেষ্টার তো বিরাম দেওয়া যাবে না, টেলিপ্রিন্টারের লাইন্ আমাদের পেতেই হবে।

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে এই সম্পর্কে কয়েকবার দেখা করেছি। একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম দিল্লীতে বিড়লার বাড়িতে।

তখন বিড়লার বাড়িতে সর্দার প্যাটেল থাকেন। একদিন বিকেলে সেখানে হাজির হয়েছি। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ও দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে তিনি বাড়ির পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমাকে দেখে সঙ্গীরা একটু পেছিয়ে গিয়ে সর্দারের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন।

সর্দারকে বল্লাম আমার আবেদনের কথা। আমাদের অতীত কাজ-গুলিও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, বল্লাম জাতীয় সরকারের দায়িত্ব আমাদের সাহায্য করা।

আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন বাংলার কথা। জানতে চাইলেন সেখানকার কংগ্রেসে এত ঝগড়া কেন। বল্লেন যুদ্ধের চাপে বাংলা বিধ্বস্ত, সবাইকে এক হয়ে সেখানে দাড়াতে হবে।

তারপর আমার আবেদন সম্পর্কে বল্লেন, 'আমার মনে আছে সব। আমি তোমাদের দাবী সম্বন্ধে অবহিত আছি। কিন্তু এখন নানা গোল-যোগ চলছে, যথাসময়ে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে।'

আরও কিছুকাল অপেক্ষা করলাম। চিঠিতে প্রচার ও তারবিভাগকে সচেষ্ট করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায়ও আশা দেখতে পেলাম না।

তারপর স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনা।

তখন মাউন্টব্যাটেন ভারত ত্যাগ করে গেছেন, রাজাগোপালাচারী গভর্নর জেনারেল।

একদিন আবার দেখা করতে গেলাম নর্দার্ন সেক্রেটারিয়েটে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে। একটা বিরাট ঘরে তাঁর অফিস, মাঝখানে তিনি বসে আছেন অজস্র ফাইলপত্রের মধ্যে।

সেক্রেটারীরা যাতায়াত করছে, দর্শনপ্রার্থী কেউ নেই।

আমি আবার টেলিপ্রিণ্টারের আবদন জানালাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের নানা খবর, কত লোক আছে, কেমন সার্ভিস দেওয়া হয়, ভারতের কোন কোন পত্রিকা সংবাদ নেয়। পরিশেষে জানালেন, নতুন করে আবেদনপত্র পাঠাতে; আশ্বাস দিলেন আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন দেওয়া হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা প্রায় চার লক্ষ টাকার মেশিনপত্রের অর্ডার দিয়েছি বিলেতে, জাহাজযোগে বোম্বে বন্দরে মেশিনগুলো এসে আটক পড়ে আছে।

সে কথা সবিস্তারে জানালাম তাঁকে। খুলে ধরলাম সব সমস্যা, সব পরিকল্পনার কথা।

তিনি পুনর্বার আশ্বাস দিলেন। মনে আশা হলো হয়তো শীঘ্রই টেলিপ্রিণ্টার পাবার সরকারী আদেশ পেয়ে যাবো।

কিন্তু আবার সেই গতানুগতিক লাল ফিতের ঢিলেতান গতি। আমাদের নতুন আবেদনপত্রও সরকারী দপ্তরে পুরনো হয়ে উঠতে লাগলো।

এদিকে মেসিনপত্র সব বোম্বেতে আটক পড়ে আছে। ছাড়াতে পারা যাচ্ছে না। টেলিপ্রিণ্টারের আশায় প্রত্যেকটি বড় বড় শাখায় নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, বৃহৎ ব্যবস্থার অনুরূপ সব প্রয়োজন মিটাতে হয়েছে। তার ফলে প্রতি মাসে বহুল ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে প্রতিষ্ঠানের।

ডাঃ নগেন গাঙ্গুলি আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। সাহিত্যসেবা ও সাংবাদিকতা করে লণ্ডনে সুনাম অর্জন করেছেন। আমাদের লণ্ডন অফিসে যখন বিদেশী সার্ভিস চালু হয়, তখন তাঁকে 'সুপারভাইসিং এডিটর'

নিয়োগ করা হয়েছিল। ইংলণ্ডের বহু পার্লামেণ্ট সদস্য ও মন্ত্রীবর্গের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। প্রাকস্বাধীনতার যুগে সর্দার প্যাটেল যখন অস্থায়ী সরকারের প্রচার সচিব, তখন শ্রীগাঙ্গুলী আমাদের টেলিপ্রিণ্টারের আবেদন সুপারিস করে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির উত্তরে সর্দারজী লেখেন ঃ

"প্রচার ও বেতার দপ্তর ক্যাম্প ঃ বোম্বে,

২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৬

প্রিয় বন্ধু,

২১শে তারিখের আপনার চিঠি আমি পড়েছি। ইউ পি আই এর প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে। দীর্ঘদিন নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই একমাত্র ভারতীয় সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি বেঁচে আছে। কিন্তু এখন সরকার যে রকমভাবে গঠিত, তাতে আপনার পত্রানুযায়ী ব্যবস্থা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। তাহ'লে অনতিবিলম্বে মুসলিম প্রতিষ্ঠানও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা দাবী করে বসবে। এবং তার ফলে আমরা অশেষ সমস্যায় পড়বো। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারের স্বীকৃতি ও সহায়তা দাবী করবে। তাই আমি অন্তত এই অস্থায়ী সরকারের কালে, এমন *কোন প্রকার কাজ করতে চাই* না, যাতে এই সকল অনিষ্টকর শক্তি সমূহকে উৎসাহদান করতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(স্বাঃ ; বল্লভভাই জে প্যাটেল"

এই চিঠিতে তখনকার সরকারী সমস্যা ও সর্দারজীর নীতি উপলব্ধি করা যায়। তাই যে সময়ে আমরা বিশেষ অগ্রসর হতে চাই নি। কিন্তু তারপর স্বাধীনতা লাভের নতুন যুগে আমাদের প্রতি জাতীয় সরকারের সহৃদয় সহযোগিতা বর্ষিত হবে, আমরা তাই আশা করছিলাম। কিন্তু তা

সরকারী দপ্তরের আমলাতন্ত্রের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগলো।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নানা প্রসঙ্গান্তরে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন পাওয়া সম্পর্কে কথা তোলেন। শ্রীফিরোজ গান্ধী সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের ডিরেক্টর। তিনিও জওহরলালকে তাড়াতাড়ি টেলিপ্রিণ্টার লাইন দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

ঠিক সে সময়েই সর্দার প্যাটেল সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে নেহরু বল্লেন, এইতো লাইন দেবার মালিক এসে গেছেন। সর্দার প্যাটেলকে তখন ডাঃ রায় ও শ্রীগান্ধী সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে বলেন।

সর্দার প্যাটেল জবাব দিলেন, শীঘ্রই মন্ত্রিসভার অধিবেশনে এবিষয়ে আলোচনা হবে। আমি আশা করি অবিলম্বে আপনাদের প্রতিষ্ঠান টেলিপ্রিণ্টার লাইন পেয়ে যাবে।

আমরা আশায় আশায় দিন গুনছি। এমন সময় আমাদের দিল্লী অফিসের সম্পাদক চারু সরকার এক টেলিগ্রাম করে জানালেন, সরকার আমাদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন লীজ দেবার আদেশ দিয়েছেন। এই দিনটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্মরণীয়, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮।

আমাদের প্রথম টেলিপ্রিণ্টার চালু হয় দিল্লী থেকে বোম্বে ও দিল্লী থেকে কলকাতা। তারপর আস্তে আস্তে সব প্রধান শহরের সঙ্গে আমাদের টেলিপ্রিণ্টার সংযোগ হবে এমন পরিকল্পনা আছে।

সর্দার প্যাটেলকে টেলিপ্রিণ্টার উদ্বোধন করতে বলা হয়। তিনি তখন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দিল্লী থেকে বাইরে থাকায় উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানালেন। জওহরলাল নেহরুর নিকটও উদ্বোধনের আবেদন নিয়ে হাজির হই।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তাঁর বৈদেশিক দপ্তরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

সেদিন তিনি বড় ব্যস্ত, নানা দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও সেক্রেটারী পরিবৃত ছিলেন। তৎকালীন চীন মহাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে এম পাণিকর নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। বসবার ঘরে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো, চীন থেকে সংবাদ আনার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হলো। অবশেষে তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভেতর চলে যান।

আমি অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ। এমন সময় পাণিকর এসে বল্লেন, নেহরু বাড়ি যাবার জন্য গাড়িতে গিয়ে উঠছেন। দৌড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। নেহরু তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠতে যাবেন, আমি দ্রুতপদে গিয়ে তাঁকে ধরলাম।

স্মিতহাস্য জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? সাংবাদিকরা সব নাছোড়বান্দা।

আমি হাসলাম। জানালাম আমার আবেদন। কিন্তু তিনি অসম্মত হলেন। বল্লেন, সরকার ও প্রেস এখন আলাদা। প্রেসকে সরকারী আওতায় আনতে চাইবেন না। এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোন প্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে এবং প্রেসের পক্ষেও দৃষ্টিকটু।

তাঁকে জানালাম, ব্রিটিশ সরকার কিভাকে রয়টার ও সংবাদপত্রগুলিকে সহায়তা করে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না বল্লেন, আমার শুভেচ্ছা আছেই। কংগ্রেস-সভাপতিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুরোধ করুন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি তখন পাটনায়। আমাদের পাটনা অফিসের সম্পাদক ফণীবাবুর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল, ফণীবাবু গিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্মতিদান করলেন।

৫ই মে দিল্লীতে টেলিপ্রিণ্টার লাইন উদ্বোধন করা হলো। আমাদের অফিসের সংলগ্ন জয়পুর রাজার প্রসিদ্ধ 'যন্ত্রমন্ত্র' বাগান।

সেখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে আলোর মালা বসিয়ে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা হলো।

৫ই মে, ১৯৪৮।

উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত সুসজ্জিত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট অতিথিরা ক্রমশ উপস্থিত হতে লাগলেন। কেউ এসেছেন একা, কেউ সস্ত্রীক। সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক, মনীষী ও চিন্তানায়কদের চেহারা দেখতে লাগলাম প্যাণ্ডেলের নিচে।

একটি প্রতিষ্ঠান যখন সফল হয়ে উঠে তখন তা ব্যক্তির পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে বৃহৎ জনমণ্ডলীতে গিয়ে পৌছায়। আমাদের স্বপ্ন ও পরিশ্রম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নিয়ে আমাদের সামান্য ব্যক্তিত্বের বহুদূরে প্রাসারিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। নতুন নতুন মানুষ তাতে যোগদান করেছেন, নতুন নতুন সাধনার পাত্র ভরে তাতে বিরাট গরিমা গৌরবান্বিত করছে। আরো নতুন নতুন সাংবাদিক ও কর্মীরা এর কর্মচক্র বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিনগুলিতে।

॥ ৩৩ ॥

বহু রাজনৈতিক নেতাকে খুব কাছের থেকে দেখেছি আমি। জেনেছি তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয়ধর্মের ব্যাপকতা। সকলের কথা বলা এখানে সম্ভব নয়, তিনজনের কথা বলছি।

একবার দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরছি। রাত্রির ট্রেন। একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিচের বার্থ রিজার্ভ ছিল। আমি গিয়ে বিছানাপত্র গুছিয়ে বসেছি, একটু পরে এলেন ভোলাভাই দেশাই। আমার কামরার আর একটা নিচের বার্থ তাঁর জন্যও রিজার্ভ ছিল। কানপুর অবধি যাবেন তিনি, একটা জটিল মামলার ডাক এসেছে সেখান থেকে।

আমাকে দেখে খুশী হলেন তিনি। বিছানাপত্র পেতে আয়েশ করে বসলেন। গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে দেখে, আমিও আনন্দিত।

গাড়ি ছাড়বার একটু আগে তাঁর বেয়ারা একটা আতরের শিশি এনে তাঁর হাতে দিল। তিনি আতর ঢেলে আঙুলে মাখলেন তারপর বালিশে বিছানায় ও নিজের কপালে হাতে ছড়িয়ে দিলেন। আমার হাতেও মেখে দিলেন খানিকটা। গাড়ির গুমোট ভ্যাপসা গন্ধটা একমুহূর্তে দূরে পালিয়ে গেল। একটা সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে গেল সর্বত্র।

এই আতরের মতই মুগ্ধ আর সুমিষ্ট ভোলাভাইয়ের স্বভাব। ১৯৩৫ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, ক্রমশ নিবিড় প্রীতি ও বন্ধুত্বে তা পরিণত হয়েছিল। মাহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আনুকূল্য লাভ করে তিনি কংগ্রেসের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্যারিস্টার হিসেবেও ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। বক্তারূপেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা আমি অনেকবার শুনেছি। স্পষ্ট

উচ্চারণ সহজ ও স্থললিত ভাষা এবং বাক্যবিন্যাসে তাঁর বক্তৃতাকে মনে হতো সঙ্গীতের মতো হৃদয়স্পর্শী। প্রাকস্বাধীনতা যুগে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন-সভায় কংগ্রেসপার্টির নেতৃত্ব করেছেন তিনি দীর্ঘকাল। সব্যসাচীর মতো শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন সেখানে।

সেই কালে ইউনাইটেড প্রেস দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে। দৃঢ় বনিয়াদের ওপর সংগঠনটিকে দাঁড় করাবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করছি। প্রত্যেকটি আইনসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সংবাদ সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্য দিয়ে আরও একটা চেষ্টা আমাদের করে যেতে হয়েছিল। প্রত্যেক সদস্যের নিকট একশ' টাকার একখানা শেয়ার বিক্রি করার প্রয়াস। সর্বক্ষেত্রেই এই প্রয়াস সফল হয় নি, অনেকে কিনেছেন, অনেকে কেবল মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই দায় সেরেছেন। তবু নিরাশ হইনি, কেননা এই সহানুভূতির মধ্য দিয়ে ইউনাইটেড প্রেসের কিছু না-কিছু কল্যাণ ঘটেছে সর্বকালেই। আমাদের এই প্রয়াসেও ভোলাভাইয়ের সহমর্মিতা ছিল। তা ছাড়া সংবাদ সংগ্রহের কাজে ছিল তাঁর সদা সক্রিয় সহযোগিতা।

ইউনাইটেড প্রেসের আর্থিক দুর্গতি তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন তিনি। একদা এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে একটি পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি যাতে এই প্রতিষ্ঠানটির দুর্গতি ঘুচে যায়। নানা কারণে ডিরেক্টর বোর্ড এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন নি, কিন্তু আমার এখনও মনে হয় সেদিনকার পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হলে এই দীর্ঘকালের অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য নিরন্তর আমাদের এমন ভাবে ভুগতে হতো না।

তাঁর শেষজীবনে পরম কীর্তি তিনি রেখে গেছেন আই এন এ বিচারকালে নেতাজীর সহকর্মীদের যখন বিচার করছিলেন তদানীন্তন ভারতসরকার 'রাষ্ট্রদ্রোহের' (রাজাদ্রোহ !) অপরাধে, তখন তিনি জাতীয় বীরবৃন্দের পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে।

তাঁর অসাধারণ আইন-জ্ঞান, অপূর্ব বাগ্মিতা ও অপরাজেয় দেশপ্রেমের স্বারক রেখে গেছেন সেই বিচার অধ্যায়ে। এই আইনযুদ্ধে শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর যোগ্য সহকারী ছিলেন।

তখন যে অপরিসীম পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল তার ফলেই তাঁর দেহভঙ্গ হয়। কিছুকাল পর তিনি পরলোকগমন করেন। জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার এই অকৃত্রিম বন্ধুকে আমার নমস্কার।

কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের মন্ত্রী স্বর্গীয় রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই ও শ্রীজগজীবন রাম এই দু'জন সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কর্তব্যের সূত্রে। তাঁরা দু'জনেই কিছুকাল ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ডাক ও তার বিভাগের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। টেলিপ্রিন্টার 'তার' বিভাগের অন্তর্গত। আমাদের পাঁচটি অফিসে টেলিপ্রিন্টার যোগে সংবাদ সরবরাহ হয়, সংবাদপত্র অফিসেও টেলিপ্রিন্টার যোগে সংবাদ বিতরণ হয়ে থাকে। প্রায় দশহাজার মাইল ব্যাপী টেলিপ্রিন্টার তারের জন্য ভারতসরকারকে আমাদের কর দিতে হয় বার্ষিক প্রায় দু'লক্ষ টাকা।

১৯৪৮ সালে আমরা টেলিপ্রিন্টার উদ্বোধন করি। তখন আশা ছিল, বর্ধিত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে আমাদের আয়ও প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ধিত হবে। এই আশা নিয়ে আমরা অফিস গুলিতে কর্মিসংখ্যা বাড়াই। টেলিপ্রিন্টারের আবশ্যকীয় ছোটছোট পার্টস নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত করার জন্য একটি ছোট কারখানা স্থাপন করি এবং কয়েকজন দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করে টেলিপ্রিন্টার চলাচল ও কারখানা চালু রাখার ব্যবস্থা করি। তার ফলে আমাদের বার্ষিক ব্যয় বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সংবাদপত্র, সরকার ও বাণিজ্যপতিদের নিকট সংবাদ সরবরাহ করে প্রয়োজন মত আয়ের সংস্থান সম্ভব হয় নি।

এই দুর্যোগে ভারতসরকারের নিকট আমাদের দেয় কর বাকি পড়তে থাকে। রফি আহমদ কিদোয়াই তখন ডাক ও তারের মন্ত্রী। তিনি

একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে এই দেয় টাকা পরিশোধ করতে আমাদের অসুবিধা না ঘটে।

রফি সাহেবের সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। আমাদের লক্ষ্মৌ-অফিসের শ্যামাপদ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘকালের সহকর্মী ও বন্ধু। শ্যামাপদ আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। রফি সাহেব যখন উত্তর প্রদেশে গোবিন্দবল্লভ পন্থ-সরকারের মন্ত্রী, তখন তাঁর চেষ্টার ফলেই উত্তর প্রদেশ সরকারের নিকট আমাদের সংবাদ বিক্রয় ত্বরান্বিত হয়।

তিনি অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় হেলান দিয়ে বসতেন, সেখানে তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও সাহায্য প্রার্থীরা এসে উপস্থিত হন। তাঁর আয়ের সবটাই জনহিতকল্পে ব্যয়িত হতো, তিনি যেখানে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করতে পারতেন না সেখানেও সৎপরামর্শ দিয়ে লোকের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করতেন।

লক্ষ্মৌ গেলে আমিও গেছি তাঁর প্রভাতিক দরবারে। খুশী হতেন তিনি আমি উপস্থিত হলে। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সাংবাদিক হিসাবে যে সাহায্য করেছি, তা অতুলনীয়।

লক্ষ্মৌ অফিসে টেলিপ্রিণ্টার তিনি উদ্বোধন করেছিলেন। একটি নামী হোটেলে এই উদ্বোধন সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। পণ্ডিত পন্থ, মন্ত্রীবর্গ সাংবাদিক্ ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে সভাটি লক্ষ্মৌ শহরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। রফি আমেদ কিদোয়াই তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইউনাইটে প্রেসের গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

কিছুকাল আগে তিনি পরলোক গমন করেছেন। পণ্ডিত নেহরুর যোগ্য সহকর্মী রূপে দেশকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁর জীবিতকালে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল খাদ্য-

সমস্যায়, দুর্ভিক্ষের নিয়ত ভ্রূকুটি ছিল দেশের সামনে। আশ্চর্য বুদ্ধি, সংগঠন ও সাহস নিয়ে এই সমস্যাকে তিনি আমূল সমাধান করে গেছেন. সকলের কাছেই যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বে তাই সংঘটন হয়েছে ত্বরান্বিত সময়ে।

তাঁর অকালমৃত্যু সারা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি। ভারতের ইতিহাসে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল।

জগজীবন রাম যখন ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তখনও আমাদের ভারত সরকারের নিকট বহু টাকা ঋণ। কিদোয়াই সাহেবের ব্যবস্থামত মাসিক চাঁদাও বাকী পড়ে আছে।

জগজীবন রাম আমাদের প্রতি বহুকাল ধরেই আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হবার পর শুনেছিলাম যে তিনি নিজেও ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা হিসাবে আমাদের কাজে সাহায্য করেছিলেন।

জগজীবন রাম অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নানাবিধ কল্যাণ কর্মে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিহারের অধিবাসী তিনি, কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় হস্টেলে থাকতে পারেননি যেহেতু তাঁর অন্ত্যজবর্ণে জন্ম। একটি বাড়ি ভাড়া করে মায়ের সঙ্গে বাস করতে থাকেন, কিন্তু তবুও ঝি চাকর বা নাপিতের সাহায্য পেতে তাঁকে নানান বিপত্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

তিনি নিজের জীবনে নানা সামাজিক ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বাধা পেয়ে এসেছেন। ভারতীয় সমাজের এক অন্ধ বর্বর কুসংস্কার মানুষকে কতখানি ঘৃণা দিয়ে নিচে নামিয়ে রাখতে পারে তিনি পদে পদে তা অনুভব করেছেন। এই ঘৃণার বিপুল পরিধিকে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের মঙ্গল আলোক জ্বালাবার সংগ্রাম তিনি আরম্ভ করেছেন সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাঁর হরিজন আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যৌবনকালেই তিনি আত্মদান করেছেন। জগজীবন রাম যখন শ্রমমন্ত্রী তখন একদা দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।

সেদিন তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও আন্তরিক সহৃদয়তায় আমাদের পরস্পরের যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, আজ পর্যন্ত তা অটুট হয়ে আছে। তিনি কলকাতা এলে আগে থেকে আমাকে চিঠি লিখে জানান। কলকাতায় নানা কাজকর্মের অবসরে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর একটা আগ্রহ থাকে।

তিনি যখন 'তার' বিভাগের মন্ত্রী তখন আমাদের দেয় টাকা এত বাকী পড়ে গিয়েছিল যে টেলিগ্রাম বিভাগ থেকে নানারকম হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানকে। তিনি সব শুনলেন। বিভাগীয় অফিসারদের ডেকে এক সম্মেলনে তিনি ইউনাইটেড প্রেসের সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করেন এবং অবশেষে বলেন যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে যতদূর সাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য। তিনি স্বয়ং একটি পরিকল্পনা রচনা করে আমাদের কাছে পাঠান। যাতে আমাদের বার্ষিক দেয় টাকা নিয়মিত শোধ করতে পারি এবং আস্তে আস্তে বাকী টাকাও পরিশোধ হয়ে যায়, এমন বন্দোবস্ত ছিল পরিকল্পনায়।

তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভারতসরকার থেকে আমরা যে সহযোগিতা ও শুভকামনা আশা করি, তাঁর ব্যবহারে তা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতি অজস্র ধন্যবাদ না জানালে এই স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

॥ ৩৪ ॥

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার কয়েকবার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক। সেই স্মৃতিকথা নিবেদন করে আমার কাহিনীর যবনিকা টানব।

যখন 'ডেলি নিউজ' পত্রিকায় কাজ করি, তখন আমার যৌবনকালের এক দীপ্ত দিনে ১৯২০ সালের কংগ্রেসের কলকাতা বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে প্রথম দেখি। অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

তাঁর গম্ভীর তেজোপূর্ণ চেহারা, দেশাত্মপ্রাণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা আমাকে সেদিন বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। সে সভায় আমাদের রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন, তবু আমি কিছু নোট নিয়েছিলাম। সে নোট ও আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি মুখবন্ধ লিখেছিলাম মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে। পরদিনের কাগজে সে মুখবন্ধটি ছাপা হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। ভারতের মুক্তিসাধনাকে মহাত্মা নতুন প্রবাহে পরিচালিত করেছেন, তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন জনগণ অধিনায়ক হৃদয়পতিরূপে। তাঁর কাহিনী প্রতিদিনের সাংবাদিকতা কার্যে অক্ষরের প্রার্থনা দিয়ে লিখেছি।

ইউনাইটেড প্রেস গঠিত হবার প্রায় সাত বছর পর তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করি সেবাগ্রামে। তখন ১৯৪০ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ধ্বংসোম্মুখ জগতের সর্বত্র কালো অধ্যায় পরিয়ে দিয়েছে। তিনি তখন বিশেষভাবে ব্যস্ত।

৭ই মে, বিকেল ৪-৪৫ মিঃ সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেবা-গ্রামে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বাহ্নে। গান্ধীর

সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই মাথায় ভিজে গামছা জড়িয়ে স্থতো কাটছিলেন। আমাকে বললেন, 'বস্থন, জিরিয়ে নিন।'

ঠিক ৪-৩৫ মিঃএর সময় মহাদেব দেশাই আমাকে নিয়ে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

মহাত্মা গান্ধী চরকায় স্থতো কাটছিলেন। স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, 'একটু চেঁচিয়ে কথা বলো, আমি কানে কম শুনি।'

একটু চেঁচিয়ে আমার বক্তব্য জানালাম তাঁকে। জানালাম ইউনাইটেড প্রেসের সংগ্রামের কাহিনী, তার আদর্শ, তার সমস্যা।

তিনি বললেন, সদানন্দও তাঁর কাছে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কি করতে পারেন? সদানন্দের মত আমাকেও একই কথা বলা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

আর্থিক সহায়তা না পাওয়া যায়তো না যাক। কিন্তু আমি যে তাঁর আশীর্বাদ চাই। বললাম তাঁকে, 'আমি যাবার আগে জেনে নিতে চাই, আমাদের পেছনে আপনার শুভকামনা আছে।'

মহাত্মা হাসলেন, বললেন, 'আমার শুভকামনা কি এতোই মূল্যবান?' বললাম জবাবে, 'নিশ্চয়ই। তা ছাড়াও প্রতিটি সংগঠনে শুভকামনা তো বড় সম্পদ।'

তিনি বললেন, 'তুমি যদি তা মনে করো, তাহলে তোমার পেছনে আমার শুভেচ্ছা রইলো।'

আমি ফিরে এলাম। কিছুটা নিরাশ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু তবু তাঁর আশীর্বাদ ও শুভকামনা সঞ্চয় করে এনেছি তাই যে মস্ত সম্পদ।

মহাত্মা গান্ধী সারা দেশের প্রাণ, তাঁর প্রত্যেকটি সংবাদ জাতির কাছে বিশেষ মূল্যবান। তাই তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম একটি নিষ্ঠাবান সাংবাদিককে। তাঁর নাম শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

শৈলেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। আমাদের এলাহাবাদ অফিসে মাঝে মাঝে সংবাদ সরবরাহ করতেন।

তারপর একটা চিঠি লেখেন আমাকে। সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য। এসে সাক্ষাৎ করেন কলকাতায়।

সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মৃত্যুশয্যায় সায়েন্স কলেজে। শৈলেনকে নিযুক্ত করি প্রফুল্লচন্দ্রের আবাসে সর্বক্ষণ থাকার জন্য। আচার্যদেবের রোগ থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত সমস্ত কালটায় তিনি চমৎকার রিপোর্ট করেন। তাঁর বুদ্ধি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি আনন্দিত হই তাঁর কাজে।

তাঁকে পাঠাই বোম্বেতে। সেখান থেকে তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ সংবাদদাতারূপে নিযুক্ত করি। গান্ধীজীর সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর সব সংবাদের সরবরাহ করেছেন। ভালো হিন্দী জানতেন তিনি, সংবাদের পটভূমিকাও তাঁর জানা। তাই তাঁর প্রতিটি রিপোর্ট প্রাণের প্রাচুর্যে ও সহৃদয়তায় ভরা থাকত।

প্রশান্ত, একনিষ্ঠ ও দরদী এই সাংবাদিকটিকে গান্ধীজীর পছন্দ হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়পাত্র হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন শৈলেন।

একদা বৈকালিক ভ্রমণের সময় গান্ধীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শৈলেন, সময় কতো হলো বলো তো।'

শৈলেন বলেছিল, 'আমার তো ঘড়ি নেই বাপুজী!'

হাসতে হাসতে বলেছিলেন গান্ধীজী, 'সেকি এতো বড়ো সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠানের কর্মী তুমি, তোমার ঘড়ি নেই! ঘড়ি ছাড়া সাংবাদিকের কাজ চলে কি? তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বলো, যেন একটা ঘড়ি তোমাকে উপহার দেন।'

কথাটা জানতে পেরে শৈলেনকে আমি একটা ঘড়ি উপহার দিয়েছিলাম। গান্ধীজী খুশি হয়েছিলেন।

শৈলেনের সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ। গান্ধীজীর সঙ্গে থেকেও সমস্ত খবর

তিনি সরবরাহ করতেন না। গান্ধীজীর অনুমোদিত সংবাদই কেবলমাত্র পাঠাতেন।

অনেক সময় এ. পি. অনেক বেশি খবর পাঠাতে পারতো। আমি একবার এজন্য শৈলেনকে আরো কুশলী হওয়ার জন্য বলেছিলাম।

শৈলেন কথাটা তুলেছিলেন গান্ধীজীর কাছে। উত্তরে গান্ধজী যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজো আমার কানে বাজে।

তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের সংবাদের মুলগত ধর্ম হোক সত্য। একটা খবর বেশি কি কম দিতে পারলে তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁরা সত্যের উপর নিভর করে পরিশেষে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী।'

১৯৪৬ সালে ৬ই সেপ্টম্বর তাঁর সঙ্গে পুনর্বার আমি ইউনাইটেড প্রেসের দায় নিয়ে সাক্ষাৎ করি। তখন মুসলিম লীগের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেস জাতীয় সরকার গঠন করেছে। গান্ধীজী তখন দিল্লীতে ভাঙ্গী কলোনীতে বাস করেন।

সকাল ৬টায় আমাদের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় সারা রাত আমার ভালো ঘুম হলো না, সাড়ে তিনটায় জেগে গেলাম। পাঁচটায় প্রস্তুত হয়ে মহাত্মা গান্ধীর সংবাদের জন্য নিযুক্ত আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শৈলেন চ্যাটার্জির সঙ্গে গান্ধী সমীপে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা করলাম।

ভাঙ্গী কলোনীতে উপস্থিত হয়ে দেখি শ্রীমতী মুরিয়েল লেস্টার ও তাঁব সদ্য ইংলণ্ড থেকে আগত এক বন্ধু গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী অমৃত কাউর ও আভা গান্ধীর সঙ্গে মহাত্মা বাগানে পরিভ্রমণ করতে এলেন। তখন মুরিয়েল গান্ধীর সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করেছেন।

একটু পরেই গান্ধীর সেক্রেটারী প্যারীলাল এগিয়ে এসে আমাদের গান্ধীর নিকট নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী লেস্টার তখন তাঁর বক্তব্য বলছিলেন। প্যারীলাল আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

গান্ধীজী ধীরপদে অগ্রসর হয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী মুরিয়েল থামলেন। তখন গান্ধীজী তাঁর প্রথম দৃষ্টিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'তুমিই কী সর্বভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক?'

আমি সম্মতি জানিয়ে উত্তর করলাম। তারপর সেবাগ্রামে প্রথম সাক্ষাতের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমার স্মরণ হয়েছে।'

আমার প্রতিষ্ঠানের কাহিনী খুব সংক্ষেপে আবার তাঁকে জানালাম। তিনি হেসে বললেন, স্নেহ জড়িয়ে ছিল তাঁর কণ্ঠে, 'আমি অনুভব করি তোমার সংগ্রামের কথা।'

আমি তখন টেলিপ্রিণ্টার প্রার্থনা করে সরকারী দরবার চালিয়ে যাচ্ছি গভর্নমেণ্ট দপ্তরে। গান্ধীর সহায়তা চাইতে তিনি বললেন, 'নেহরু, সর্দার ও শরতের কাছে গিয়ে জোর দরবার কর। বিশেষ করে শরতের কাছে।' শরৎ অর্থাৎ শরৎ বসু। তখন তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তার কিছুদিন আগেই কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধী তার কাহিনী জানতে চাইলেন। তিনি বিশেষ করে জানতে চাইলেন হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান পরিবার ও মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু পরিবার রক্ষার কাহিনী। তিনি অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট কথা বলার পর তিনি একসময় একটুক্ষণ চুপ করে আরেক জনকে প্রশ্ন করলেন।

বুঝলাম আমার বিদায়ের ইঙ্গিত। আমি পদধূলি গ্রহণ করে ভাঙ্গী কলোনী থেকে ফিরে এলাম।

আজ নতুন ভারত গঠনের জন্য দেশের মঙ্গলকামী মানুষেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মহাত্মার আদর্শ সকলের অন্তরে অন্তরে জলছে। একটি হৃদয়, একটি জীবন সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গলব্রতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছে।

মহাত্মার স্বপ্ন সম্ভব হোক আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। এই

দুঃখ, দৈন্য, মিথ্যাচার, হিংসা ও লোভ দূর হয়ে যাক। মহাত্মার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা আমাদের এই প্রাচীন দেশকে নতুন সার্থকতায় উদ্দীপ্ত করুক। সেই গৌরবান্বিত দিন, সকলের সুখী, সমৃদ্ধ ও মৈত্রীবদ্ধ জীবন, কবে আসবে আমাদের দেশে, কবে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ পূর্ণ রূপায়িত হবে, কবে আসবে সে দিন?

॥ ৩৫ ॥

দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে এসেছি আজ। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা। সাংবাদিক জীবনের।

বাল্যকাল কেটেছে শ্যামল পল্লীর নিভৃত আঙ্গিনায়। পুব বাংলার। এখন পশ্চিম-বাংলার পল্লীতে আবাস তৈরি করে জীবনের প্রদোষ সন্ধ্যায় এসেছি। স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে আজ কত কথা স্মরণ হয়, কত কথা গভীর অনুরণন নিয়ে বাজে।

আশ্চর্য অনুভূতির রঙ ছড়িয়ে পড়ে মনে, যখন ভাবি একদা একটি শীর্ণ স্রোত আরম্ভ হয়েছিল অতীতের বিস্মৃত দিনে। আজ সে স্রোত-ধারা কত জনপদ, কত বিস্তৃত দেশদেশান্তর পেরিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। বেদনা, নৈরাশ্য ও দারিদ্র্য বরণ করে যে ব্রত গ্রহণ করেছিলাম যৌবনের মধ্যদিনে, দীর্ঘ দিনের নিবিড় নিবিষ্ট সাধনার নৈবেদ্য দিয়ে হয়তো তা কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করতে পেরেছে।

কৈশোরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে পড়তে একটা কথা মনের মধ্যে গাঢ় দাগ কেটে বসে গিয়েছিল।—'তুমি অধম আছ, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন।' সুমহৎ মন্ত্রের মতো এই বাণী মনের মধ্যে আশ্চর্য শান্তি ও পবিত্রতার হাওয়া মেলে দিত। আমার জীবনের আকাশ আর মাটি এই মন্ত্রের প্রসন্নদাক্ষিণ্যে চিরকাল পাথেয় কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলেছে।

কলকাতা শহরতলীতে বাসস্থান গড়েছি। কর্মযাপনের শেষে নিরালা আবাসে যখন বিশ্রাম করি তখন চারদিকে নানা দুর্গতি চোখে পড়ে। যে মানুষের বাণীকে দুর্মদ তেজে ভাষা দিতে ব্রত গ্রহণ করেছিলাম,

সাংবাদিকতার, সেই মানুষের নিরন্তর দুর্গতি। অন্ন বস্ত্র-শিক্ষা স্বাস্থ্যহীন পল্লীবাসী।

আমার সাংবাদিকতার নানা কাজের মধ্যেও অবসরকালটা এই দুর্গত পল্লীবাসীর সেবা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ডাকঘর, লাইব্রেরী, যুবসংগঠন—সর্বত্র গেছি আমার সামান্ত-মাত্র শক্তির নৈবেদ্য নিয়ে। পল্লীউন্নয়নে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি।

ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় ও দানবীর রাজ্যপাল। সিটি কলেজে তিনি আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর কাছে গেছি আমার পল্লীর নানা প্রয়োজনে। বারংবার অর্থ সাহায্য প্রত্যাশায়।

তিনি হেসে বলেছেন, 'আপনি শুধু আপনার গ্রামের জন্ম টাকা নিতে আসেন। কিছু টাকা তুলে দিন না আমার ফণ্ডে।'

জবাব দিয়েছি, 'আমার গ্রামের কাজ তো আপনারই কাজ।'

তিনি হেসেছেন।

যতটুকু আমার সাধ্য, অঞ্জলি দান করেছি আমার পল্লীর মানুষের সেবায়। তার জন্যে এই প্রবীণ বয়সে কোন গৌরব করি না, করি না অনর্থক গর্বের দাবী। কবিগুরুর একটি কলি শুধু বারংবার মনের মধ্যে গুমরে ওঠে :

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।'

দীনাতিদীন সেবকের মন নিয়ে আমার সাধনা করে গেছি। সাফল্য যদি কিছু লাভ করে থাকি, তা কীর্তি নয়, কর্মের দক্ষিণা।

আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত জাতীয়তাবাদী সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই ব্রত উদ্‌যাপনে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় কেটেছে। দারিদ্র্যের তমসা অন্ধকারের মধ্যে সেই ব্রত নিয়ে

দেশদেশান্তর ঘুরেছি, ঘুরেছি নানা জনের দরবারে, নানান সংবাদপত্র অফিসে। আজ ভারতের সর্বত্র এই প্রতিষ্ঠানের অফিস গড়ে উঠেছে, বিদেশী সংবাদ পরিবেশনেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছি।

দীর্ঘ দুর্গম এই পথযাত্রা। মাত্র তিন হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, একনিষ্ঠ ও একাগ্র সাধনায় ভারতের মধ্যে তার স্থান আজ অগ্রণী। অবজ্ঞা, অবহেলা ও অবিশ্বাসের হাওয়া এসেছে বারবার, ঝড় তুলেছে, বাত্যা উঠেছে, তরণী বারংবার কেঁপে কেঁপে গেছে। তবু হতশ্বাস হয়ে পড়িনি। ধৈর্য আর সাধনার পতাকা তুলে তাকে নিয়ে গেছি সাফল্যের পথে, সার্থকতার পথে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ চলতে চলতে অনুভব করেছি, সংসারের ঝঞ্ঝা-বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মানুষকে বাইরে থেকে তার অন্তরের ঐশ্বর্য বোঝা যায় না। প্রত্যেক মানুষই পরমপিতা ঈশ্বরের অংশ, প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাট সত্বা লুকিয়ে আছে। শান্তনং শিবম্ ও সুন্দরম্-এর পরম ঐশ্বর্য আছে সকলের অন্তরে। অন্তরকে যদি আবিষ্কার করা যায় এবং তার পথে যদি আন্তরিক মমতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে মাভৈঃ। তোমার পথ আলোয় ঝলমল করে উঠবে; তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

একুশ বছর আগে ব্রিটিশ শাসনের অক্টোপাস জড়িয়েছিল ভারতের বুকে। পরাধীনতার দুঃসহ শৃঙ্খল। সেই জাতীয় দুর্দিনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শ নিয়ে আমরা দুর্গম গিরি উত্তীর্ণ হবার সাধনা করেছি। নিজেদের কর্ম-পুষ্পাঞ্জলি দান করেছি দেশমাতৃকার চরণতলে। স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রকাশ করেছি নির্ভয় নিঃশঙ্ক মন নিয়ে। আমাদের সেই সাধনা আজ সাফল্যমণ্ডিত। পরাধীনতার শৃঙ্খল আজ অপনোদন হয়ে গেছে। মাতৃভূমি স্বাধীনতার আলোকে গৌরবমণ্ডিত।

দেশসেবকদের প্রশংসা আর প্রশস্তি আমরা বারেবারে লাভ করেছি। তাঁরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন, সেই তমসারাত্রিতে, আমাদের এই

সাংবাদিকতার প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। সাফল্যলাভের প্রেরণা ও সঞ্চয় জুগিয়েছে।

তাঁদের প্রশংসাবাণীতে আমরা আনন্দিত। যুক্ত করপুটে তাঁদের নমস্কার জানাই।

কিন্তু 'স্বাধীনতা' তো কেবলমাত্র 'শাসকবদল' নয়, আরো অনেক বেশি কিছু। দেশের দুঃখী জনসাধারণের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার প্রসন্ন ও সমৃদ্ধ জীবনকে প্রসারিত করে দেওয়া। জনজীবনের এই বৃহত্তর মুক্তির সাধনাই তো সাংবাদিকতার মহৎ ব্রত—সংবাদপ্রকাশের মাধ্যমে এই সাধনাই তো করে যেতে হয় সাংবাদিকদের।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাদের 'টেলিপ্রিণ্টার সার্ভিস' উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধি নির্ভর করে পল্লীর প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে। পল্লীতে পল্লীতে 'টেলিপ্রিণ্টার' বসিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ করে দিতে হবে প্রতি মানুষকে।

সে স্বপ্ন আজো সার্থক হয়নি। এ সম্পর্কে আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা করেছি, পরিকল্পনা পেশ করেছি। কিন্তু এখনও সরকারী দপ্তরে আমলা-তান্ত্রিক বাঁধন এমন দৃঢ়মূল যে দেশের গণমুক্তির তরিৎপ্রয়াস প্রায় সম্ভব হয় না। অথচ কতো ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সরকারের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়, কতো লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। 'টেলিপ্রিণ্টার' যন্ত্রের কারখানা স্থাপন করা, সরকারী সহযোগিতা অথবা পরিচালনাধীনে, একান্ত প্রয়োজনীয়। তাতে দেশ একটি বৃহৎ শিল্পে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে এবং সারা দেশে জনশিক্ষার একটি মহৎ মাধ্যম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে ও সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যেক পল্লীর সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইন সভার সদস্য ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আমার আবেদন, দেশের এই জরুরী প্রয়োজনে যেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। এই অভাব যেন মোচন হয় তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছায়।

আমার স্মৃতিকথার রেশ এবার টেনে আনবো। একটা কথা এই প্রসঙ্গে আর একবার নিবেদন করি। এই জীবন অঞ্জলি দান করেছি দেশ-সেবায়। অর্ধশতাব্দী ধরে দেশের নানা মনীষির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁদের দাক্ষিণ্য ও প্রেরণা লাভ করে ধন্য হয়েছি। সকলের কথা এই সংক্ষিপ্ত রচনায় বলা গেল না। অনেকেই থেকে গেলেন অগোচরে। কিন্তু তবুও তাঁরা বিস্মৃত হয়ে নেই আমার স্মৃতি-মন্দিরে। তাঁদের প্রতি আমার নমস্কার।

একদা একটি শীর্ণ নদীধারা পুর্ব-বাংলার এক নগণ্য পল্লীতে উৎস-মুখ খুলেছিল, প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে। সে নদীপথ নানা দেশ, নানা প্রান্তর, নানা বৃক্ষলতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গেছে। কবিগুরুর একটি কলি এই অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছে।—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

জীবনের প্রদোষ-সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ প্রীতিবশে আমি সকলকে শুভকামনা জ্ঞাপন করি। দেশ-দেশান্তরে নানা মানুষকে, যাঁদের সহৃদয় প্রীতি আমাকে দুঃখক্লান্ত দিনেও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় জীবনের মহৎ ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করে দিতে পেরেছি।

ইউনাইটেড প্রেস এখন আপন গতিবেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু এখনও তার আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ঘোচেনি। একদা দেশ-প্রেমের পতাকা মাথায় তুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে দৃপ্ত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিল, আজও তার সকল কর্মচেষ্টার মধ্যে সেই, উজ্জ্বল দেশপ্রেমের বহ্নি ছড়িয়ে আছে। দীর্ঘতর সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছি আমরা। স্বাধীন রাষ্ট্র সরকার ও জনসাধারণের দায়িত্ব এই প্রাচীন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় রক্ষা করা, প্রাসারিত করা, সুসাফল্যমণ্ডিত করা।

এই আবেদন দেশবাসীর সামনে রেখে এবার আমি থামবো। যৌবনের প্রত্যয় যখন মনের মধ্যে জুড়ে বসেছিল, তখন সাংবাদিকতার পতাকা তুলে নিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। এই ব্রত বা বৃত্তিতে তো অবসর বলে কিছু নেই, যতক্ষণ জীবনের আলো থাকবে দেহে, ততক্ষণ পর্যন্ত অখণ্ড কর্মধাধনা। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ, আমার বিরাম নেই কর্মযজ্ঞের। নিরন্তর তার নানা তরঙ্গ বিক্ষোভে আমাকে প্রবাহিত হয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাতে আমার নিরানন্দ নেই, তাতেই আমার প্রাণের দীপালোকে, প্রাণোৎসব।

পরিশেষে জীবনদেবতার চরণপদ্মে একটি প্রার্থনা স্থাপন করে আমি বিদায় নেবো। কল্যাণ হোক আমার জন্মভূমির, আমার দেশবাসীর জীবন সমৃদ্ধ হোক পুষ্পে পুষ্পে।